মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
করকমলেষু

বাণী রায়
১৩৬২ [illegible]

মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা

বাণী রায়

কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—২৯শে জুন ১৯৬১

প্রকাশক

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা

গ্রন্থম্

২২।১, কর্নওআলিস স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

শিল্পনির্দেশক

পৃথ্বীশ গংগোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রক

রিপ্রোডাক্‌সন সিণ্ডিকেট

গ্রন্থাবরক

দি সিটি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মুদ্রক

শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস

৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

মূল্য : সাত টাকা

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥"

এই লেখিকার গ্রন্থাবলী

কাব্য—

জুপিটার

উপন্যাস—

প্রেম

আরও কথা বলো

শ্রীলতা ও সম্পা

সুন্দরী মঞ্জুলেখা

কনে দেখা আলো

মিস্ বোসের কাহিনী (যন্ত্রস্থ)

গল্প-সংগ্রহ--

পুনরাবৃত্তি

শূণ্যের অংক

রঞ্জন রশ্মি

প্রতিদিন

বর্ষা বিজয়

প্রেমের দেবতা

বিবিধ রচনা-সংগ্রহ—

সপ্তসাগর

প্রবন্ধ—

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

নাটক—

ঊষা অনিরুদ্ধ ও হৃদয়ের মৃত্যু

কিশোর পাঠ্য—

হাসি-কান্নার দিন

সেই চেনা ছেলেটি

অনুবাদ—

মোনা লিসা

পূর্ব খণ্ড

১। মুখবন্ধ — ১
২। জন্ম মৃত্যু — ৭
৩। পটভূমিকা — ১৩
৪। জাগৃতি — ১৯
৫। বিদ্রোহ — ৩১
৬। বিপ্লব — ৪১
৭। স্বাদেশিকতা — ৫৬
৮। চরিত্র — ৭৯
৯। দাম্পত্য জীবন ও প্রেম — ৯০
১০। ধর্ম — ১২৭

উত্তর খণ্ড

~~(উৎস ও অনুপ্রেরণা)~~

১১। সাহিত্য সৃষ্টির মুখবন্ধ — ১৬৩
১২। সাহিত্য সৃষ্টির নামায়ন — ১৬৫
১৩। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আপেক্ষিক সমালোচনা — ১৮২
১৪। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রভাব — ২৩৫
১৫। উত্তর কাল — ২৪৬
১৬। বিবিধ — ২৫৪
১৭। পরিশিষ্ট — ২৬৩

পূর্ব খণ্ড

মুখবন্ধ

যে প্রতিভা স্বয়ং আত্মচরিত রচনা করিয়া যান নাই, তাঁহাকে সীমায়িত করা দুঃসাধ্য। আপন সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও উপলব্ধি দ্বারা অসামান্যের বিচারে সত্য নিঃসন্দেহে মালিন্য ধারণ করে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে আধুনিক বাংলার ঔৎসুক্য বহুমুখী। মৃত ও বিখ্যাত প্রাচীন লেখকের মত বৎসরে একবার তাঁহাকে স্মরণ করা অথবা চিত্রাগারে তাঁহার বৃহৎ তৈলচিত্র লম্বিত করার মধ্যে বাংলাদেশের কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। আধুনিক সাহিত্যে যে সকল যুগলক্ষণকে আমরা যুগনির্ণয়ের মানদণ্ড মনে করিতেছি, তাহারা অনেকদিন পূর্বে কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী গ্রামে একটি বালকের মনে অঙ্কুরিত হয়।

সেই অসাধারণের প্রকৃত পরিচয় কখনই জীবনচরিতে নিহিত নাই। যিনি বন্দী বাঙ্গালী আত্মার যৌবনকে মুক্তির প্রথম স্বাদ আনিয়া দেন, তাঁহাকে বহু জীবনীকার ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বহু প্রামাণিক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, বহু তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান মিলিয়াছে। কিন্তু কোথায় সেই আত্মচরিত, কবির নিজের কাহিনী? যাঁহারা মধুসূদন দত্তকে দেখিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুত্বের দুর্লভ সম্পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের অন্তস্তল পর্যন্ত দৃষ্টি প্রেরণে সক্ষম হইয়াছিলেন? সেখানে স্রষ্টা সম্পূর্ণ অনাবরিত এবং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

তাই মনে হয়, এতদিন্ ধরিয়া রচিত জীবনচরিতাবলীতে মধুসূদনের আদি ও অন্তসন্ধান লেখা নাই। স্বাধীনতার পরে যে ঈষৎ নূতন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কবির নূতন রূপ আমরা দেখিতে অগ্রসর হইতেছি, সে রূপ আমরা রচনার মধ্য দিয়াই পাইতে পারি,

কবির নিজের ভাষার মধ্য দিয়া। আর কবির পত্রাবলী হইতে পাইতে পারি। অন্য কোন পথ নাই। হয়তো এই প্রয়াস পূর্বতন বহু মতবাদকে খণ্ডন করিতে পারে ও অজানার নির্দেশ দেখাইতে পারে। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের বিচার মধুসূদন বহু পূর্বেই রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্বস্থরীদের পদচিহ্ন যে পথে অঙ্কিত হয় নাই, সেই পথে আজ বাঙ্গালী মধুসূদনকে সন্ধান করিবে। মধুসূদন যে ছিলেন বাংলার প্রথম বিপ্লবী সাহিত্যিক।

মধুসূদনের যুগ হইতে বাংলার, তথা ভারতবর্ষের, সাহিত্যে এক নবযুগ সূচিত হয়। বাঙ্গালীর নিগড়-বদ্ধ (insular) মনের প্রথম দুঃসাহসিক অভিযান অজানা উপনিবেশ স্থাপনায়। স্বাধীন সত্তার বাহিরের প্রথম জ্ঞানের স্বাঙ্গীকরণ স্পৃহা। তাই আধুনিক সাহিত্যে মধুসূদনের দান এত গুরুত্বপূর্ণ।

যদি লিখি, মধুসূদনের জীবন এবং কিয়দংশে মধুসূদনের উপর বৈদেশিক প্রভাব এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য, তাহা হইলে নিজের অপরিণত বুদ্ধি প্রদর্শন করা হইবে। মধুসূদনের মত যুগান্তকারী প্রতিভার উপর প্রভাব পড়ে, একথা না বলিয়া, প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করে, বলাই সমীচীন। আমরা যথাক্রমে কাব্যে মধুসূদনের অনুপ্রেরণার উৎস সন্ধান করিব ও তুলনামূলক সমালোচনা করিব। কোন পটভূমিকায় মধুসূদনের প্রতিভার এই বিশিষ্ট রূপ সম্ভবপর তাহাও আমাদের প্রতিপাদ্য। এই পটভূমিকায় কবির প্রতিভার সহিত গ্রন্থিবদ্ধ কবির রহস্যময় সত্তা ও ব্যক্তিত্ব। বাংলা আজ যত সহজে প্রসারিত দিগন্তে কবিকে চিনিতে পারিতেছে, তত সহজে সেদিন সঙ্কুচিত আকাশের নীচে তাঁহাকে চেনে নাই। মধুসূদন নিজের সম্পর্কে দিব্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন স্মারকলিপির পাতায় ১৮৬২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে: "Born an age too soon."—অর্থাৎ আমি, যে যুগ আমার যোগ্য, তার একযুগ পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

মধুসূদনের প্রধান পরিচয়, তিনি কবি, মনে প্রাণে কবি। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্র হইতে মধুসূদনের নিজের ভাষা উদ্ধৃত করা যাক—"These men little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song!" গর্বিত, নীরব ও নিঃসঙ্গ কবির হৃদয় এইসকল লোক অল্পই বোঝে। (২১।৬।৫৪)

মধুসূদন বাংলাদেশের এক বিচিত্র সংস্কৃতি-সঙ্কটের সময়ে আবির্ভূত হন। বাংলাদেশের সেই পটভূমিকা আমাদের বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনার বস্তু অবশ্যই। কারণ, কোন প্রতিভা ভূঁইফোঁড় রূপে জন্মগ্রহণ করে না। শতাব্দীর সঞ্চয় আত্মসাৎ করিয়া দেশের জলবায়ুর চিহ্নধারণপূর্বক প্রতিভার বিকাশ হয়। সঙ্গে থাকে শৈশব পরিবেশ ও বংশধারার প্রভাব, শিক্ষার ও অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি।

নবরূপে বিবর্তিত মনঃসমীক্ষণ-বিদ্যার সাহায্যে সাহিত্যিকের জীবনীবিচার সমীচীন। 'যে আলো ছিল না কভু আকাশ সাগরে', ('The light that was never on land and sea')—এক অভিনব আলোকসম্পাতে চেনা মানুষের নবীন মূর্তি দেখা যায়। আলোচ্য পুস্তকে মধুসূদনের চরিত্র ও সাহিত্যবিচারের চাবিকাঠি আমাদের সেই সন্ধানী আলোক-রশ্মির প্রয়োগ।

এই প্রবন্ধে পূর্বসূরীদের যে-টুকু সাহায্য লইয়াছি কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্বীকার করিয়াছি। তুচ্ছতম উদ্ধৃতিটিও অচিহ্নিত নাই। গবেষণার ক্ষেত্র সমগ্র বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিতে মধুসূদনের উপর বিস্তৃত। তাই সামান্য পত্রপত্রিকা হইতে অকিঞ্চিৎকর উদ্ধৃতি এখানে পাওয়া যাইবে, চিত্রশিল্প ও মঞ্চশিল্পের উল্লেখ থাকিবে। স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীর রচনার স্থান মিলিবে। স্বাধীনতার পরে মধুসূদনের জীবনের নূতন ব্যাখ্যা আমার আলোচ্য বিষয়।

মধুসূদনের বিচার-গবেষণার একমাত্র উপমা, মধুসূদনের নিজের ভাষায় "দ্রৌপদীর শাড়ী"। একটি স্তর উন্মোচনের পরে আবার নূতনতর স্তর দেখা দেয়। বিভিন্ন ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও পরম বিদগ্ধ

জনের মানসিকগঠনে যে সমস্ত উপাদান মিলিত হইয়াছিল, তাহাদের সম্যক আলোচনায় প্রকাণ্ড স্থানের প্রয়োজন। তাই প্রতিটি পরিচ্ছেদ সংক্ষিপ্ত করিয়া একটি বাস্তব সামগ্রিক বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই প্রবন্ধ দুইভাগে বিভক্ত। পূর্ব খণ্ডে মধুসূদনের জীবন বিচার। আধুনিক দৃষ্টিপাতে তথ্য বিচারের পট-ভূমিকায় সাহিত্যিকের জীবনের নূতন বিশ্লেষণ। জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি 'জন্ম মৃত্যু' শিরোনামার নীচে তালিকাকৃত। সেই জন্ম-মৃত্যুর সূত্রে আবদ্ধ জীবনের অন্তর্নিহিত সত্তাকে সন্ধান করিয়াছি।

উত্তর খণ্ডে মধুসূদনের সাহিত্য সমালোচনা। মধুসূদন মনোযোগের যোগ্যপাত্র সাহিত্যিক হিসাবেই। সাহিত্য তাঁহার দ্বিতীয় জীবন। 'সাহিত্যসৃষ্টি' শিরোনামার নীচে তাঁহার এই জীবনী অতি সংক্ষেপে লিখিত। পূর্বকৃত ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, অসমাপ্ত সমালোচনার একত্রীভূত বিচারের পরে আমাদের সন্ধান চিহ্নিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি ও নাম-তালিকা প্রস্তুত কর্ম করিয়াছি। পূর্বসূরী যেখানে আভাস দেখিয়া নিরস্ত ছিলেন, সেখানে বিশদ আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিয়া স্থিরীকৃত মত গঠনে উত্তম আছে। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ তুলনামূলক বিচারে এবং সর্বভারতীয় ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণে মধু-সাহিত্যের জ্ঞাতব্য কিছু তথ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হইয়াছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে যতটুকু সাহিত্যকীর্তির আলোচনা আবশ্যক, ততটাই মাত্র সন্নিবদ্ধ করিয়াছি। মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্য সমালোচনার বহুসংখ্যক দীর্ঘ পুস্তক আছে। তাঁহার কবিকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার দ্বারা সহৃদয় পাঠকের পুনরায় ধৈর্যচ্যুতির সাহস নাই।

জন্ম-মৃত্যু

যশোর জেলায় কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে দত্ত বংশে মধুসূদনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবীদেবী। মধুসূদন একমাত্র জীবিত সন্তান। মধুসূদনের জন্ম ১২ই মাঘ, ১২৩০, শনিবার (২৫শে জানুয়ারী ১৮২৪)।

সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র রাজনারায়ণ পারসীক ভাষায় ব্যুৎপত্তির হেতু মুন্সী রাজনারায়ণ নামে খ্যাত ছিলেন। মধুসূদনের সাত বৎসর বয়সকালে তাঁহার পিতা ওকালতী উপলক্ষে কলিকাতাবাসী হন। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী রাজনারায়ণ দত্ত খিদিরপুরে একখানি দ্বিতল বাটী ক্রয় করিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন। মধুসূদনকে তিনি এখানে আনিয়া কলিকাতার 'মহাবিদ্যালয়' নামে খ্যাত প্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন।

১৮৩৩ খৃস্টাব্দে মধুসূদন হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুলে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। রচনায় ও মেধায় তিনি তখনই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে পড়িয়া মধুসূদন একদিন নিরুদ্দেশ হইলেন। ক্রমে জানা গেল মধুসূদন খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হইবার উদ্দেশে লর্ড বিশপের সাহায্যে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। পূর্ব ও কৈশোর জীবন তাঁহার এখানেই সমাপ্ত। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় মিশন-রো-স্থিত ওল্ড মিশন চার্চ নামক ধর্ম মন্দিরে আর্চডিকন ডেয়াল্‌ট্রি মাইকেল এই নাম দিয়া মধুসূদনকে দীক্ষিত করিলেন।

হিন্দু কলেজে খ্রীস্টান ছাত্রের স্থান নাই, সুতরাং মধুসূদন শিবপুরে বিশপ্‌স্‌ কলেজে প্রবিষ্ট হন। পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেও

ধর্মত্যাগী পুত্রের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতেন। তিন বৎসর মধুসূদন বিশপ্‌স্‌ কলেজে অধ্যয়ন করেন ও নানা ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পিতা কোন কারণে বিরক্ত হইয়া অর্থসাহায্য বন্ধ করিলেন। সহপাঠী মান্দ্রাজী ছাত্রদের সহিত মধুসূদন হঠাৎ ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য মান্দ্রাজ চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয়বার তিনি নিরুদ্দেশ।

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে মধুসূদন মান্দ্রাজ বিভাগে ব্ল্যাক্‌ টাউনের মান্দ্রাজ মেল অরফান অ্যাসাইলামে ইংরেজি শিক্ষকের কাজ করেন। এই বিদ্যালয়ে যুক্ত বালিকা বিভাগের ছাত্রী রেবেকা ম্যাক্‌ট্যাভিস্‌ নামক ইংরাজ বালিকাকে রূপমুগ্ধ হইয়া তিনি বিবাহ করেন (১৮৪৯)।

প্রবাসে মধুসূদন তিনখানি স্থানীয় ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন, **Madras Circulator and General Chronicle, Athenaeum, Spectator. Athenaeum**-এ তিনি কিছুকাল প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া তিনি **Hindu Chronicle** নামে একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন (১৮৫১)। এই সকল পত্রিকায় মধুসূদনের বহু ইংরাজি প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজের অ্যাডভোকেট জেনারেল জর্জ নর্টন-এর সহায়তায় ১৮৫২ খৃস্টাব্দে মান্দ্রাজ ইউনিভার্সিটির (পরে ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে খ্যাত) হাই স্কুল ডিপার্টমেণ্টে মধুসূদন দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ লাভ করেন। এই সরকারী পদে তিনি জানুয়ারী ১৮৫৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। ওই মাসে তিনি মান্দ্রাজ ত্যাগ করেন।

মান্দ্রাজ গমনের তিন বৎসরের মধ্যে মধুসূদনের মাতৃবিয়োগ হয়। ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইল। অবশেষে ডিসেম্বর মাসে বন্ধু গৌরদাস বসাক মধুসূদনকে সংবাদ জানাইতে পারেন। পিতৃসম্পত্তি হস্তান্তরের আশঙ্কায় মধুসূদন ফিরিয়া আসেন। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের শেষভাগে মান্দ্রাজে তাঁহার চার সন্তানের

(দুই পুত্র ও দুই কন্যা) জননী রেবেকার সহিত মধুসূদনের বিচ্ছেদ হয়। অল্পদিন পরে মধুসূদন এমিলিয়া আঁরিয়েৎ সোফিয়া নাম্নী কোন ফরাসী নারীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করেন। তরুণীর পিতা মান্দ্রাজ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে রেবেকা পরলোক গমন করেন। মান্দ্রাজে মধুসূদনের পুত্র ম্যাক্‌টাভিস্ দত্ত ওকালতী করিতেন। পারিবারিক কারণে তিনি দত্ত নাম ত্যাগ করিয়া 'ডাটন' ('Dutton') নাম গ্রহণ করেন।

১৮৫৬ খৃস্টাব্দে মধুসূদন কলিকাতা আসেন রিক্ত হস্তে। পুলিস-কোর্টের জুডিসিয়াল ক্লার্ক হইতে কোর্টের ইণ্টারপ্রিটর হন। এই সময়ে আইন অধ্যয়ন করিবার স্পৃহা জাগরূক হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যানবাটিকায় নানাবিধ সাহিত্য-চর্চা সাহিত্য-রচনার ইচ্ছা মধুসূদনের মনে জাগায়। তাহার পর মধুসূদনের রচনার সুবর্ণযুগ পাই। উল্লেখযোগ্য সকল রচনাই ও 'মেঘনাদ বধ' এই সময়ে লিখিত হইয়াছিল।

মধুসূদন অমিতব্যয়ী ও অপরিণামদর্শী ছিলেন। উপার্জনের জন্য তিনি কিছুদিন Hindu Patriot সম্পাদনা করেন কলিকাতায়।

এধারে পিতৃসম্পত্তি লইয়া মামলা বাধিল। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে তিনি খিদিরপুরের বাড়ী ও কিছু সম্পত্তি পান। আশৈশবের ইচ্ছা পূরণ করিতে ও ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ৯ই জুন, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি য়ুরোপ যাত্রা করেন। বিষয়-সংক্রান্ত মামলা না মিটিলেও পরিবারের মোটামুটি ব্যবস্থা করিয়া মধুসূদন যাত্রা করিলেন। এধারে পত্তনিদার ও প্রতিভূরা তাঁহার পত্নী ও মধুসূদনকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন। ফলে মধুসূদন প্রবাসে অর্থকষ্টে পতিত হইলেন গ্রেজ্ ইন্‌এ অধ্যয়নকালীন। পত্নীও পুত্রকন্যা সহ ২রা মে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে লণ্ডন, প্যারিস, ভের্সাই প্রভৃতি স্থানে অর্থাভাবে মধুসূদন বিব্রত অবস্থায় অতি কষ্টে বাস করেন। বিদ্যাসাগর সেই সময় নানারূপে

অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। ওই সময়ে মধুসূদন 'চতুর্দশপদাবলী' রচনা করেন। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার জন্য মধুসূদন আবার লণ্ডনে আসেন। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে নভেম্বর মাসে মধুসূদন গ্রেজ্ ইন্ হইতে ব্যারিষ্টার হন। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারীতে মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে ফিরিলেন ও অনেক চেষ্টার পর কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করিলেন। স্পেন্সেস্ হোটেলে তিনি মহা আড়ম্বরে থাকিতে লাগিলেন। প্রবাস ফ্রান্সে স্ত্রী-পুত্রকে তিনি নিয়মিত টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করায় ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে মে মাসে তাঁহারাও প্রবাস ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঋণভারে বিব্রত মধুসূদন ইতিপূর্বে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন। নানা কারণে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে সুবিধা না হওয়ায় মধুসূদন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া হাইকোর্টের প্রিভি-কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তখন তিনি ৬নং লাউডন স্ট্রীটে বাস করেন। দুই বৎসর পরে মধুসূদন এই পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কারণ, অর্থাভাব। তবু তিনি সাহিত্য একেবারে ত্যাগ করেন নাই।

১৮৭২ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে মধুসূদন পঞ্চকোট রাজ্যের আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায়। কিন্তু রাজার আচরণে বিরক্ত হইয়া কয়েক মাস পরেই কর্ম ত্যাগ করেন।

১৮৭২ খৃস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে মধুসূদন আবার ব্যারিষ্টারি সুরু করেন। কিন্তু তখন তাঁর স্বাস্থ্য ও মন দুইই অবসন্ন ও ভগ্ন। অর্থাভাবে বিপন্ন ও ঋণগ্রস্ত মধুসূদন পাওনাদারের তাগিদে অশান্ত। কোনদিন গৃহে আহার্য নাই, কোনদিন রোগে চিকিৎসা নাই। এই সময় হইতে তিনি জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। রোগশয্যায় তিনি নাটক রচনার চেষ্টা করেন অর্থের জন্য। যৎসামান্য অসমাপ্ত রচনার নিদর্শন এই অংশের শেষ সাহিত্য প্রয়াস। ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে তাঁহার রোগ (উদরী, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, রক্তবমন, হৃৎপিণ্ডের

দুর্বলতা ইত্যাদি) ভীষণ বৃদ্ধি পায়। আঁরিয়েতও অসুস্থ হইয়া পড়েন। ঋণদাতাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় মধুসূদন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ লাইব্রেরী গৃহে দুই তিন মাস বাস করিয়াছিলেন। অল্প ব্যয়ে উত্তর-পাড়ায় সংসারযাত্রা নির্বাহ হইলেও তাঁহার ও পত্নীর রোগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া বন্ধুবর্গ অসুস্থা আঁরিয়েতকে বিবাহিতা দুহিতা শর্মিষ্ঠার নিকট রাখিয়া তাঁহাকে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে (জেনারাল হসপিট্যাল) পাঠান। এখানে সহৃদয় কয়েকটি বন্ধুর (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষের) কৃপায় চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ত্রুটি না হইলেও মধুসূদনের মানসিক যন্ত্রণার সীমা ছিল না। জীবনের অবিমৃষ্যকারিতা, রুগ্না পত্নী ও অসহায় নাবালক পুত্র দুইটির চিন্তায় জর্জরিত মধুসূদনের কাছে মৃত্যুশয্যা কণ্টকশয্যায় পরিণত হইয়াছিল। মধুসূদনের মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার পত্নী আঁরিয়েৎ পরলোক গমন করেন। শোকমগ্ন মধুসূদন ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার বেলা দুইটার সময়ে পত্নীর অনুগমন করেন জেনারেল হাসপাতালে। মৃত্যুকালে মধুসূদনের ও আঁরিয়েতের জীবিত সন্তান, বিবাহিতা শর্মিষ্ঠা, পুত্র মিল্টন ও আলবার্ট নেপোলিয়ান দত্ত (আলবার্টের পুত্র মধুসূদনের বংশধর) বিদ্যমান ছিলেন। পরদিন ৩০শে জুন সোমবার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের দেহ লোয়ার সারকুলার রোডের সমাধিপ্রাঙ্গণে সমাধিস্থ হইল। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর মধুসূদনের মর্মরবিরচিত সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাধিস্তম্ভে মধুসূদনের স্বরচিত কবিতা সমাধিলিপি রূপে উৎকীর্ণ আছে ঃ—

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে

(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী !"

পটভূমিকা

মধুসূদন যে বাংলায় জন্মগ্রহণ করিলেন, শিক্ষিত হইলেন, মহাকাব্য লিখিলেন অবশেষে নিষ্ফলতার মধ্যে মৃত্যুবরণ করিলেন, সেই বাংলার যে বিশেষ রূপ ছিল তাহা সমসাময়িক বিভিন্ন গ্রন্থ ও মধুসূদনের রচনা হইতে বিশদভাবে জানা যায়।

বাংলাদেশ এই সময়ে প্রায় দুইটি শিবিরে ভাগ হইয়া গিয়াছিল। পুরাতন সমাজের আত্মরক্ষার চেষ্টা ও নূতনের যুদ্ধ ঘোষণা। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর, নাটুকে রামনারায়ণ* প্রভৃতি বাংলার এক আদর্শ, অন্যদিকে মধুসূদন ও তাঁহার অনুসরণকারিগণ। এ সময়ে বাংলা-ভাষা যথেষ্ট পুষ্ট নয়।

সংস্কৃতের দাসত্ব বাংলা সহ্য করিবে না—সংস্কৃত নাটকের তাড়া হাতে পণ্ডিতবৃন্দ শাসন করিতেছেন। হিন্দু ও বিশপ্‌স্‌ কলেজের আবহাওয়ায় এধারে শূল্যপক্ক নিষিদ্ধ মাংস ও মদ্যপান চলিতেছে। একস্থুটের দল† ধুতি চাদর ত্যাগ করিয়া সাহেবী কোর্তা পরিয়া আগমনী, বিজয়া সঙ্গীত শুনিতেছে। নিধু গুপ্তের টপ্‌পার‡ সঙ্গে

* নাটুকে-রামনারায়ণ—রামনারায়ণ তর্করত্ন, নাটক রচনার জন্য 'নাটুকে নারাণ' আখ্যাত। কুলীনকুলসর্বস্ব, রত্নাবলী, নব নাটক, ধর্মবিজয়, শকুন্তলা, বেনীসংহার প্রভৃতির নাট্যকার।

† একস্থুট—আধুনিক যুবকগণ উড়নী ত্যাগ করিয়া কোর্তা ধারণ করিলেন। উড়নী হইলে দুই স্থুট হইত। মধুসূদন এই বেশের প্রবর্তক।

‡ নিধুগুপ্ত—রামনিধি গুপ্ত ওরফে বঙ্গের সরিমিঞা। প্রণয়গানকে গীতিভাষায় টপ্‌পা বলে, আদিরস ঘটিত প্রেমগীতি নিধুর টপ্‌পা, ১৮শ শতাব্দী।

বায়রনের ডন ইউয়ান* ভারতচন্দ্রের† ধর্মের সঙ্গে নাস্তিক্যবাদ। মুন্সী রাজনারায়ণ পুত্র মধুসূদনের হাতে স্বপীত শটকার নল দিতেছেন, আবার জোর করিয়া তাহাকে বিবাহে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মাংসের পোলাউ, এক মোহরের চুল কাটা, প্রকাশ্যে ছাত্রের মদ্যপান চলিতেছে, অথচ সমুদ্রপারে জাতিপাত। মধুসূদনের জীবনের এই উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দাম বিলাসের চিত্র জীবন-চরিতগুলির সাহায্যে লেখক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) স্বরচিত শ্রীমধুসূদন নাটকে চমৎকার অঙ্কন করিয়াছেন।

অসহায় বাংলা সংস্কৃতি-সঙ্কটের মধ্যে একবার এদিকে একবার ওদিকে চায়। কোন্ পথে বাংলার আত্মবিকাশ, কোন্ পথ শ্রেয় কে বলিয়া দেয়? ধর্মভীরু বাংলার ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত বিপন্ন। রামমোহন রায় প্রবর্তিত নূতন ধর্ম বাংলার বড় বড় পরিবারে প্রবেশ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতি মনীষীর পরিশ্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম বাংলার বুকে জুড়িয়া বসিতেছিল।

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের জন্য এই সময়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, যিনি নিজ চক্ষে তাহা দেখিয়াছেন, তিনিই কেবল বুঝিতে পারেন।" 'আত্মচরিত'—রাজনারায়ণ বসু।

সংস্কৃতির কেন্দ্র, ঐশ্বর্যের বাসভূমি ঠাকুরপরিবারের অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুরপরিবারের কলাবিলাসে, শিক্ষার উৎকর্ষে ব্রাহ্ম ধর্ম লোভনীয়। এধারে শাসকদের ধর্মমত কেল্লার দ্বারে প্রহরা দিতেছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে পিয়ানো ঝঙ্কারের সঙ্গে সাগরপারের ধর্ম হাতছানি দিতেছে। পাদ্রীর

* বায়রনের প্রসিদ্ধ কাব্য।

† বর্ধমানের কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি, ১৭১২-১৭৬০।

বাইবেল উপহারে সমুদ্রপারের প্রলোভন স্বর্ণমৃগ রূপে বাংলার বিভ্রান্ত আত্মাকে ডাকিতেছে দুর জটিল পথের রহস্যে। অন্যদিকে জাহ্নবী দাসী ও বসাক বাড়ীর রুটী ঘণ্ট।* বাঙ্গালীর লোভ সকল দিকে।

ধর্ম সঙ্কটে বিপন্ন বাংলার প্রাণমন তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে হাহাকার করিতেছে—

> "কেমনে কে পায় মুক্তি বুঝিতে না পারি যুক্তি
> নানা জনে নানা উক্তি শুনে হাসি পায়।
> এই বলে, হলো হলো, এই বলে মলো মলো,
> কেবা হলো, কেবা মলো, শুধাইব কায়?" ('তত্ত্ব')

এমন বিপন্ন বাংলার কবি অবশ্যই নিজেও বিপন্ন হইবেন। বাংলা একবার ল্যাভেণ্ডার-পমেটম মাখিয়া বায়রন আওড়াইতেছে, আবার আলবোলার নল হাতে পারসীক গজল গাহিতেছে, তখনই আবার যাত্রা দেখিতে ছুটিতেছে। শান্ত পল্লীর বুকে সারা বাংলার প্রাণ ঘুমাইয়া পড়িল কাশীরাম-কৃত্তিবাসের অতীতমহিমাকীর্তনে। সখীসংবাদ শুনিয়া একবার বাংলা বেলফুলের গোড়ে পরিল, ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাসে মোহিত হইল। আবার নূতন ফিরিঙ্গিয়ানার লোভে নিজের ভাষা ভুলিয়া ইংরেজি ভাষাকে কণ্ঠহার করিল। আবার সেই বাংলা নবীন চেতনার উন্মেষে অস্থির হইয়া সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে ধীশক্তির ও মনুষ্যত্বের আহ্বান-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল।

নূতন ডেপুটী বাঙ্গালী, নূতন ব্যারিষ্টার বাঙ্গালী নির্বিচারে অশিক্ষিতা, অন্তঃপুরিকা হিন্দুললনার স্বামী সাজিয়া সুখী হইল।

* রুটীঘণ্ট: বন্ধু গৌরদাস বসাক বড়বাজারের বিশিষ্ট বসাকবংশীয়। রুটী ও ঘণ্ট প্রস্তুত প্রণালী এই বংশের পরিবারের মধ্যেই নিবদ্ধ, বিশেষ মুখরোচক খাদ্য। মধু এই রুটী ও ঘণ্টের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

'মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্র সোম। ('পরিশিষ্ট'—পৃঃ ৪৬৬)

চোগা চাপকান ধরিয়া ও পাল্‌কী চড়িয়া তাহারা একটি পৃথক গণ্ডি সৃষ্টি করিল। আবার উত্তরীয় সম্বল, নিরাড়ম্বর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিধবাবিবাহের সপক্ষে পাঁতি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তৎপূর্বে বৈদান্তিক রামমোহন প্রাচীনপ্রথা সহমরণ বন্ধ করিতে ব্যাকুল হইলেন। এমন বিপর্যস্ত সংস্কৃতি-সঙ্কট বাংলা কমই দেখিয়াছে। বাংলার জগাখিচুড়ি আবহাওয়া সম্পর্কে বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গে' সঙ্কলিত আছে—রামতনু লাহিড়ী পৈতা ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া বড় মেয়েটিকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে দেন।—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বলিতেন 'I am a Brahmin Christian.'

বাংলার তৎকালীন অবস্থা আবার গুপ্ত কবির ভাষায় দেখা যাক্ ঃ—

> "একদিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া,
> অন্যদিকে মোল্লা বসে মুর্গিমাস নিয়া।
> একদিকে কোশাকুশি আয়োজন নানা,
> আর দিকে টেবিলে ডেবিল খায় খানা।
> বুড়ো বলে রাধাকৃষ্ণ, ছোঁড়া বলে যীশু।" ('অনাচার')

এই সময়ে বাঙ্গালীসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মতবাদ ছিল আপোষ। হিন্দুসমাজের অমোঘ বিধান সমস্ত নব্য সভ্যতার পশ্চাতে নির্দেশের নিশান তুলিয়াছিল—যা করিতেছ কর, তবে মানাইয়া চল। ক্রমবর্ধমান বিদেশী ভাব তোমাকে যেন গৃহছাড়া না করে।

কিন্তু আপোষ বা কম্প্রোমাইস করিবে কে ? সাধারণ স্ত্রীপুরুষ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারে। তাহারা সে ভাবে চলিয়াছে। রাতারাতি তো বাংলা ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান হইয়া যায় নাই। কিন্তু প্রতিভা কি করিয়া এমন সামঞ্জস্য রাখে ? আপোষ করা প্রতিভার ধর্ম নয়।

মধুসূদন সেই বিদ্রোহী প্রতিভা। বিপ্লবী বাংলার মনের মানুষ তিনি। তিনি আপোষ করিতে পারেন নাই। সমাজের সীমানার মধ্যে তাঁহার মত ব্যক্তির মাপে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া ছিল না। এক শতাব্দী পূর্বে তিনি ভুল করিয়া জন্ম লইয়াছিলেন। বিপ্লবের পরে আজ আমরা তাঁহাকে চিনিয়াছি।

তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম বিদ্রোহী, প্রথম বিপ্লবী সাহিত্যিক। তিনি যাহা মানিতেন না, সগর্বে ঘোষণা করিতেন। যাহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, বাধাবিপদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সেই পথে চলিতেন। যদি হিতৈষিবৃন্দের অনুরোধে তিনি বাঁচাইয়া পথ চলিতেন তাহা হইলে হয়তো তাঁহার স্মৃতির মূল্য কোন একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে মাত্র রক্ষিত হইত—তাঁহারই ভাষায় "Michael M. S. Dutt, Esquire of the Inner Temple, Barrister-at-Law-" এর স্মৃতিটুকু মাত্র। মৃত্যুদিনে ফুলের মালায় ছবি ঘেরিয়া ও জন্ম-দিনে মোমবাতির আলোতে ছবি উজ্জ্বল করিয়া, সরকারী চাকুরিয়া বংশধরেরা নতজানু হইয়া তাঁহার আত্মার উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে করিতে ভাবিতেন—পিতৃপুরুষ ব্যবহারজীবীর ব্যবসায়ে কলিকাতায় কয়েকখানা বাড়ী রাখিয়াছেন, ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চিত আছে। দীর্ঘ, নির্দোষ জীবন তাঁহার, রাজানুগ্রহের স্নিগ্ধচ্ছায়ায়। তাঁহার মতই আমরা জগতে উন্নতি করিতে চেষ্টা করিব।

অথবা, কোন চকমিলানো হিন্দুবাড়ীর চিত্রিত প্রাচীরে ওই ছবি থাকিত। নীচে মার্বেলের মেজের উপর ধূপদীপ ইত্যাদি। শাড়ীর আঁচল গলায় সধবা, খস্‌খসে থানপরা বিধবা, খালিগা দোদুলদেহ কর্তারা স্বর্গগত মধুসূদন দত্তকে স্মরণ করিতেন—রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র, জাহ্নবী দেবীর নয়নের মণি! বিদেশী শিক্ষা সত্ত্বেও কেমন পিতৃবাক্য মানিয়া স্বঘরে বিবাহ করিলেন! আহা, কেমন উন্নতি করিলেন জগতে পাণ্ডিত্যকে পণ্য করিয়া! ধন্য, ধন্য মধুসূদন!

সেখানেই ওই ছবি বিলম্বিত হইয়া ছবির আয়ু শেষ হইত।

বাংলার ঘরে ঘরে স্থান পাইত না। সেইখানেই স্মরণের শেষ হইত—স্মৃতিপূজা আর দাবী চাহিত না। তাহা হইলে বছরের পর বছর লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরখানায় কেহ তৃণশয্যায় কবির সমাধির পাশে ছুটিয়া যাইত না। কেহ সন্তর্পণে ভীরু পায়ে শাদা পাথরে রজনীগন্ধার কাণ্ড সাজাইয়া বন্দনা করিয়া আসিত না। যে পথিককে তিনি মাত্র এক মুহূর্তের জন্য তাঁহার সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন—"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল তবে এ সমাধি স্থলে"—সেই পথিক বহুক্ষণ দাঁড়াইল, এক মুহূর্ত নয়। পথিকের চোখের জল ঝরিয়া পড়িল অতর্কিতে, আপনাআপনি। কবির জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা সেই মুহূর্তে ধন্য হইয়া গেল। কবির চরম পুরস্কার ওই চোখের জল।

মধুসূদন যা ছিলেন, যদি না হইতেন, তাঁহার স্মৃতি জাতীয় সম্পদ হইয়া থাকিত না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন; রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে বাবার কথা শোনেন নাই; জাহ্নবী দেবীর সন্তান মায়ের চোখের জল উপেক্ষা করিয়াছিলেন। খৃষ্টান মাইকেল সমাজবন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। যদি তিনি তাহা না করিতেন আজ আমরা পাইতাম একটি বড় চাকুরে, দত্তপরিবারের উপযুক্ত বংশধর, শৈশবে যিনি বায়রনের, মুরের স্বপ্ন দেখিতেন। অবশ্য অবকাশ সময়ে বিদগ্ধ মধুসূদন দুইচারিখানি ইংরেজি ভাষার পুস্তক রচনা করিতেন, সমাদৃত হইত। বাঙ্গালীর ইংরেজি সাহিত্যরচনার ইতিহাসে অবশ্যই 'দ' বা 'ম' এর ক্রমে তাঁহার নাম থাকিত।

বাংলাদেশ যুগে যুগে প্রতিভাকে বন্দনা করিয়াছে বিমুগ্ধ ঔদার্যে। বাংলার নিজের মধ্যে প্রতিভা ছিল, তাই প্রতিভার পূজাই স্বাভাবিক। একথা যেমন সত্য, আবার ঠিক তেমনি সত্য বাংলাদেশই আকাশস্পর্শী প্রতিভাকে নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করিবার চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়াছে, সহস্র নীতিশাসন পথে প্রহরা রাখিয়াছে,

অমান্য করিলে হাহাকার করিয়াছে। বাংলার নিজের আত্মার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড আপোষের চেষ্টা আছে। তাই অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা ধর্মের নাম দিয়া বাংলা গায়ের জোরে চালাইত।* বাংলার পতনের একটি মূল কারণ এই অসার্থক আপোষের প্রয়াস।

জাগৃতি

"পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমরা বাংলা কাব্যে যে নবযুগের লীলা দেখিলাম সেই রেনেসাঁস (Renaissance)-এর সঞ্জীবনী মন্ত্রের আদিস্রষ্টা রূপে মধুসূদনকেই বুঝিয়া লইতে হইবে।···তিনি বাংলা-কাব্যে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করিয়াছিলেন—গ্রাম্যতার গণ্ডি কাটাইয়া তিনি তাহাকে বিশ্বসাহিত্যের অভিমুখে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন।··· বঙ্কিম পূর্ববর্তীদের পদচিহ্ন পাইয়াছিলেন, মধুসূদন তাহাও পান নাই। তিনি একেবারে ভার্জিল ও মিলটন হইতে ভারতচন্দ্র ও কৃত্তিবাসে সেতু যোজনা করিয়াছিলেন।"—'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'—মোহিতলাল মজুমদার, পরিশিষ্ট—পৃঃ ২৬৬।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর বিগত শতাব্দীর মন অবসন্ন হইয়া ছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। সব কিছু পুরাতন হইয়া গিয়াছে। নবীন বাঙ্গালী কর প্রসারণ করিল বিদেশী ভাষার দ্বারে। সংস্কৃতনবীশদের অনুস্বার বিসর্গে রুচি গেল। বাঙ্গালী টোল ছাড়িয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইল।

কলেজীয় শিক্ষায় প্রথমেই নিজের প্রাচীন রীতি নীতিকে কুসংস্কার বলিয়া বোধ হইল। নবজাগ্রত বাঙ্গালী গৃহসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক বিপ্লবের উদ্যম ও উৎসাহ ব্যয়িত

* বৈষ্ণবীয় ও তান্ত্রিক ধর্মে নানা বিচিত্র আচারের কথা স্মরণীয়

হইল রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়—অন্যত্র। পলাশীর একশো বছর পরে সিপাহী বিদ্রোহ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিদ্রোহ তাহারও পরে।

কিন্তু বাংলার ধীশক্তির মধ্যে বিপ্লবের স্বাদ থাকে। চিন্তা-জগতে বিবর্তন ঘটিল। রামমোহন রায় যে জ্ঞানের ও নূতন চেতনার মন্ত্র কানে দিলেন, তাহার ফলে বিপ্লব ঘটিল চিন্তায়। বিপ্লব ঘটিল সাহিত্যে। এখানেই বাংলার জাগৃতি বা রেনেসাঁস।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে মধুসূদনের সময়ে দেশের মানসিক অবস্থা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে (৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। গৌরবময় আদি যুগের পরে দেশে তখন অজ্ঞান মধ্যযুগ চলিতেছে—মুসলমান শাসনের অব্যবহিত পরে। পরদাপ্রথা এবং বিদেশীয় শাসনভারে বিব্রত বাংলাদেশ পূর্বতন কত না সংস্কৃতি বিস্মৃত হইতেছিল। "১৮০১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল"—পৃঃ ৭৩, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। "যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় মন সমুন্নত হয়, জগত ও মানবকে বুঝিবার সহায়তা হয়, এমন কোন জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থসকল পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত ছিল"—পৃঃ ৭৪, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'।

সুতরাং ভিন্ন জাতি ও ধর্মের শাসকের নিকট হস্তান্তরে বিব্রত দেশে ইংরাজপুরুষ শিক্ষা বিস্তারের যে প্রচেষ্টা করিলেন, তাহার ধারা কিছু পরিমাণে পাশ্চাত্য পথ ধরিয়া আসিল। অশোকস্তম্ভের উপর মাটি পড়িয়াছিল, গুপ্তসাম্রাজ্যের জরাজীর্ণ কঙ্কালকে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ধার করেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্য পল্লবগ্রাহী কৌতূহলকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। পর পর বিদেশীয় ও বিধর্মীয় শাসনে বিভ্রান্ত বাঙ্গালী নিজের সংস্কৃতি ভুলিতে বসিয়াছিল। তাই নূতন যুগের সূচনা দেখা দিল নূতন রূপে। ইংরেজি বা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় নব জাগরণ আনিলেন সংস্কৃত

ভাষার বেদান্ত দর্শনাদির নব্য অনুবাদ ও প্রচার দ্বারা। বৈদিক ধর্মের সহজ সূত্র নিজের ভাষায় সাধারণের আয়ত্তে আনিয়া জীবনে অনুসরণ করা প্রবর্তিত হইল রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা (১৭৭২-১৮৩৩)। তিনি যুক্তিবাদী হইলেন পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া।* তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন বৈদিক ধর্মের ভিত্তির উপর। পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার লোপ করিবার জীবনব্যাপী যুদ্ধ চলিল তাঁহার। তখন দেখা দিল Age of Reason—যুক্তিবাদের যুগ। যুক্তির দ্বারা বিচার করিবার স্বাধীনতা, প্রাচীন গ্রন্থাদির লিপি উদ্ধার, পঠনশীলতা ইত্যাদি গুণচিহ্নিত রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত নবজাগৃতি আশ্চর্য ভাবে য়ুরোপের নবজাগৃতির সহিত একাত্মা।

* পুরাতন ও নূতন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইত্যাদির সমন্বয়ে তিনি এক নূতন দর্শন বাঙ্গালীর দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। এই যৌগিক দর্শনের ভিত্তি প্রোথিত ছিল পাশ্চাত্য যুক্তিজ্ঞানের উপর।

"তাঁকে বলা হয় 'ভুক্তি-মুক্তির' সাধক। প্রাচ্যের ত্যাগের আদর্শ যেমন তাঁর মনোজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি পাশ্চাত্যের ভোগবাদকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। পাশ্চাত্য জীবন থেকে তিনি বিশেষ ভাবে কর্ম ও গতির আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন।···ব্রাহ্ম ধর্মের দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে অনেকখানি পরিমাণ পাশ্চাত্য প্রভাব আছে, তবে এ পাশ্চাত্য-করণ হিন্দু ধর্মের বিরোধিতাপ্রসূ নয়, হিন্দু ধর্মের যথোচিত সংস্কার ও শোধনের আগ্রহ থেকেই তার উদ্ভব।" নারায়ণ চৌধুরী 'বাংলার উনিশ শতকের ভাবধারা'—এশিয়া—২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫৫

রামমোহনের যুক্তিবাদ ঈশ্বরচন্দ্র সমাজ সেবার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করিয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, বহুবিবাহরোধ, স্ত্রীশিক্ষা, উত্তরাধিকার, সর্বোপরি যুগান্তকারী বিধবাবিবাহ, সমস্তের মূলে যুক্তিবাদ। সেবা[illegible]তে বাংলার নবজাগৃতি ঈশ্বরচন্দ্র সফল করিয়া তোলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার পঠন ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর প্রয়োজনীয় মনে করেন। তিনি সংস্কারমুক্ত। মধুসূদন এই জাগৃতির সাধনায় সাহিত্যে বিপ্লব আনিলেন।

রামমোহন খৃষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদের* নিন্দা করিলেন, ফলে "শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায় বিরূপ হইল", (পৃঃ ৬৩, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ')। "পলাতক ষোড়শবর্ষীয় বালক রামমোহন তিব্বতে বৌদ্ধ পৌত্তলিকতার নিন্দা করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন", (পৃঃ ৬০, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'†)। প্রথম হইতেই রামমোহন রায়ের বিচারপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। য়ুরোপের জাগৃতির মধ্যে চার্চের বা ধর্মমন্দিরের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল। এ দেশেও তাই। প্রাচীন শাস্ত্রে আছে মুক্তি। স্বাধীন চিন্তার স্বাদ আছে পৃথক সত্তার স্বতন্ত্র অনুসন্ধিৎসায়। কিন্তু সে পথ ধর্মের পথই। রামমোহন রায়ের জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি ধর্মবিহীন শিক্ষা পছন্দ করিতেন না। অথচ লৌকিক ধর্মের প্রচলিত মূর্তিপূজার প্রতি বিতৃষ্ণায় তাঁহাকে শাস্ত্রসম্মত নূতন ব্রাহ্ম ধর্ম আনিতে হইল। মধুসূদন অবশ্য আপোষমূলক ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ না করিয়া সোজাসুজি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। এখানেও তাঁহার আপোষ করিয়া চলা হইল না।

এধারে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি গরাণহাটায় হিন্দু কলেজ বা মহাবিদ্যালয় খোলা হয়। এই কলেজে শিক্ষক ছিলেন হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে একজন পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি। তিনি কলিকাতায় মৌলালি সন্নিহিত বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। ডিরোজিও ডেভিড ড্রামণ্ডের ছাত্র ছিলেন। ড্রামণ্ড ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীন চিন্তাধারায় মন প্লাবিত করিয়া স্কটল্যাণ্ড হইতে এ দেশে আসেন। সুতরাং ডিরোজিও সেই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইলেন। হিন্দু কলেজে তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া স্বাধীন বিচারের দ্বারা স্বীয়

* ত্রীশ্বরবাদ—খৃষ্টান ধর্মে প্রচলিত Trinity বাদ, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost.

† 'স্বাদেশিকতা' পরিচ্ছেদে রামমোহনের বিষয় দ্রষ্টব্য।

ধর্মে ছিদ্র পাইল। মধুসূদন অবশ্য হিন্দু কলেজে ডিরোজিওকে পান নাই, আর. এল. রিচার্ডসন নামক অধ্যাপককে পান। কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা তখনও হিন্দু কলেজকে আশ্রয় করিয়াছিল। সে শিক্ষা নব চেতনার বাহন।

রামমোহন রায় ডাফ্ সাহেবকে* এ দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলাত গেলেন। বাংলার নবজাগরণ ও হিন্দুদিগের অনাস্থার সুযোগে ডাফ্ সাহেব খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরপরিবারের, হিন্দু কলেজের, অথবা ডিরোজিওর অনেক ছাত্র তখন খৃষ্টান হইতে-ছিলেন সমাজ সংস্কার করিবার আগ্রহে, যথা মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। মধুসূদনের প্রাচীন ধর্মে অনাস্থা আসিল, অথচ নূতন ব্রাহ্ম-ধর্ম তাঁহার ভালো লাগিল না। ব্রাহ্মদিগকে কপট ও ভণ্ড বলিয়া বিদ্রূপ করা তখন শিক্ষিত সমাজে প্রথা ছিল। —পৃঃ ১৭৩, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।' ডিরোজিও প্রবর্তিত স্বাধীন চিন্তাধারা বঙ্গসমাজে পূর্ণমাত্রায় কাজ করিতেছিল। ষোল সতেরো বৎসরের বালক ছাত্র সুরাপান ও অখাদ্যভক্ষণ বাহাদুরী বলিয়া মনে করিত। "যে যত অসমসাহসিকতা দেখাইতে

* ডাফ্ সাহেব—পাদ্রী প্রচারক ডাফ্। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের বিশেষ সাহায্যে ডাফ্ সাহেব স্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের (Duff School) পত্তন করেন। স্বদেশে অর্থ সংগ্রহের জন্য যাইয়া 'India and India's missions' প্রবন্ধে ডাফ্ হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের উপর তীব্র আক্রমণ করেন (১৮৩৯)। দেবেন্দ্রনাথ ফলতঃ ডাফের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের নিন্দার প্রতিবাদ ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা'র সহায়তায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন (১৭৬৫ শক, ১লা ভাদ্র)। তারপরে, বাংলার নবজাগরণের একটি দিক এই পত্রিকার সাহায্যে ভারতব্যাপী প্রচার সুরু করেন প্রধানতঃ অক্ষয়কুমার, রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ প্রভৃতি ব্যক্তিবৃন্দ। এই পত্রিকা চার পাঁচটি ভাষায়—বাংলা, হিন্দী, উর্দু, তেলেগু, তামিলে ছাপা হইত।

পারিত, সেই তত সংস্কারক বলিয়া গণ্য হইত"।—পৃঃ ১৭২, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। মধু সেই দলে ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'সেকাল আর একাল' পুস্তকে পাওয়া যায়—"কিন্তু, হিন্দু সমাজের বর্তমান পরিবর্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে কেবল ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তনা যে উহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, এমত নহে। আর একটি ঘটনা উহার একটি প্রধান কারণ স্বরূপ গণ্য করা কর্তব্য অর্থাৎ রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন।"—পৃঃ ২৯, 'সেকাল আর একাল' (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ)।

সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু কলেজের শিক্ষা বাংলার নবচেতনার উদ্বোধক। ফিরিঙ্গী অধ্যাপক ডিরোজিও ছাত্রদের জাতিভেদের বন্ধন শিথিল করেন উক্ত আছে। কিন্তু, পূর্বেই জাতিবন্ধন স্বতঃসিদ্ধ ভাবে কিঞ্চিৎ শিথিল হইবার উপক্রম দেখায়, যথা কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম।—(পৃঃ ৩৪, 'সেকাল আর একাল') হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশীয় কালীপ্রসাদ দত্ত বিবী আনর নামে এক সুন্দরী মুসলমানীকে উপপত্নী রাখিয়া তাহার সহিত তাহার গৃহে কিছুদিন বাস করেন। ফলে কালীপ্রসাদের জাতিচ্যুতি ঘটে। কিন্তু পরে তাঁহাকে তাঁহার সমগোত্রীয় ব্যক্তিবৃন্দ জাতে তোলেন। কাজেই জাতির বন্ধন যে অজ্ঞাতসারে ক্ষয় হইয়া যাইতেছিল, দেশ নিজের মধ্যে নবীন জন্মলাভের বীজ পাইয়াছিল, একথা সত্য। প্রাচীনে বিরাগ ইহার একটি প্রধান কারণ। চক্রের মত গতিতে কালচক্রের আবর্তনে সত্য এই স্বাভাবিক বিবর্তন। বাইরের বাতাসে গতি দ্রুত হয় মাত্র। ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন 'Idylls of the King' কাব্যে এই কথাই বলিয়াছেন ঃ—

"The old order changeth yielding place to new,
And God fulfills himself in many ways,
Lest one good custom should corrupt the world"—

(The Passing of Arthur)

বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ বাংলার Renaissance বা জাগৃতি ঘটিল। মধুসূদনের মধ্যে সেই জাগৃতি প্রতিফলিত হইল। ১৪৫০—১৫৫০ শতাব্দীর য়ুরোপীয় রেনেসাঁসএর যা লক্ষণ পাওয়া যায়, মধুসূদনের মধ্যে ঠিক সেই লক্ষণ দেখা যায়।

রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডে মিল্‌টন, শেক্‌সপীয়র ও অন্যান্য ইংরাজলেখকের জন্মকালীন প্রতিভার বিচিত্র পরবর্তী উন্মেষ হয়। ইটালিতে কবি পেত্রার্ক রেনেসাঁস আন্দোলনে আত্মার মুক্তি সন্ধান করেন। রেনেসাঁস আন্দোলনের একটি লক্ষণ 'Revival of Learning' অর্থাৎ শিক্ষার উজ্জীবন। ফলে, ইটালি হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপের সকল দেশে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠে উৎসাহ দেখা গেল। মধুসূদন মিল্‌টন ও পেত্রার্ক প্রভৃতি কবির কাব্যে আনন্দ পাইতেন। তাঁহার পঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় রিভাইভ্যাল অফ লারনিং তাঁহার চরিত্রে জাগরুক, (মধুসূদনের পত্রাবলী দ্রষ্টব্য) রেনেসাঁসের অন্যান্য লক্ষণ, যথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চিন্তার স্বাধীনতা, কলানুরাগ মধুসূদনে বিদ্যমান। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সব লক্ষণ পাই মধুর মানসিকপ্রবণতায়। বাংলার যে নবজাগরণ দেখা যায় রামমোহনে, সাহিত্যের দিক হইতে অত্যন্ত বিশিষ্টরূপ তাহার। প্রবন্ধরচনার জন্মকাহিনী ওখানে। উদ্দেশ প্রণোদিত রামমোহনের রচনা পরবর্তীযুগের প্রাবন্ধিকের কাছে অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, বিচারবুদ্ধির দ্বারা মধ্যযুগের তামসিকতাখণ্ডন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায় আধুনিক প্রবন্ধের বিতণ্ডামূলক প্রথম রূপের ইঙ্গিত রামমোহনের রচনাবলীতে আমরা পাই। তবু বাঙ্গালী মধুসূদনের ঋণ অনেকাংশে ছিল প্রতীচ্যভুখণ্ডের নবজাগরণের নিকট। সুতরাং প্রতীচ্যের জাগৃতির রূপ দেখা যাক।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতীচ্য দেশ চার্চের বা গির্জার ঐক্যের বাহিরে পৃথক সত্তার সন্ধানে স্বাধীন মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। চিন্তার স্বাধীনতা, কল্পনার স্বাধীনতা চাহিয়া য়ুরোপ দেখিল অগ্রণী সেই

একটি ছোট দেশ—চির সৌন্দর্যপ্রিয় জাতি। আজ পর্যন্ত পৃথিবীকে সংস্কৃতির আদর্শ দেখাইয়াছে—গ্রীস্ ও গ্রীক্।

মধ্যযুগীয় এক ধর্ম সুতরাং একসাম্রাজ্যের ছত্রতল যুক্তিবাদীর কাছে মধুর লাগিল না। নিজে ভাবিতে চাহিয়া, নিজে কাজ করিতে চাহিয়া মানুষ নূতন চেতনার জন্ম দিল—রেনেসাঁস বা জাগৃতি।

"Now a change was taking place, which was to alter this outlook with its desire to know more about the world and the people in it."—(F. W. Tickner).

পঞ্চদশ শতাব্দীর য়ুরোপে বাণিজ্য প্রসার লাভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে অভিযান-অভিলাষ দেখা দিল স্পেন, পর্টুগাল, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মনে। ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষে আসিলেন, কলাম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। য়ুরোপ উপনিবেশিক সভ্যতার স্তরে আসিয়া বিভিন্ন আবিষ্কার ও অভিযানের মধ্য দিয়া নূতন চিন্তার আবাহন করিল। নূতন পৃথিবীর কাহিনী তখন হইতে সুরু হয়। এই সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্য সন্ধান এবং মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা যুক্ত হইল। স্বদেশপ্রেম য়ুরোপের মানুষকে একত্রিত করিল।

নূতন জগতের সৃষ্টির সঙ্গে নূতন ধরনের অন্য আবিষ্কার পাওয়া গেল। নবীনা পৃথিবীর নব জাগৃতির পক্ষে অমূল্য সেই অবদান। ইটালি এখানে পথ নির্দেশক, বলা চলে। ইটালিতে ছোট ছোট স্বতন্ত্র নগরকেন্দ্রিক স্টেটের জন্ম হয় ইটালির বাণিজ্য প্রসারের জন্য। এই স্টেটগুলি ঐশ্বর্য প্রাচুর্যে কলাবিদ্যায় সময় ও অর্থ ব্যয় করিবার অবকাশ পাইল। সামন্ততন্ত্রের গুরুভার তাহারা প্রতিহত করিয়া মুক্ত হইল। সুতরাং জ্ঞান-বিদ্যা, পুস্তক-চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য, কাব্য, সাহিত্য সর্ববিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহ দেখা দিল। ফ্লোরেন্সে নানাদেশের কলাবিশারদ একত্র হইলেন। আর্টে এই নূতন মানসিকতার আরোপ ও নূতন অর্থ-নির্ণয় বিরাট আবিষ্কার।

"Don M. Wolfe বলেন—"With the coming of

Renaissance, artists' zeal turned from divinity to humanity."

মধ্যযুগে চিত্রীরা দৈব ব্যাপারের ছবি আঁকিতেন। তারপর মনুষ্যদেহের বন্দনা চিত্রে রাফাইল, দা ভিঞ্চি, টিশ্যেন প্রভৃতি শিল্পী প্রচলিত করিলেন। অভিজাত পরিবার ভিন্ন সাধারণ লোকের সুখ দুঃখের প্রতি রচনাকারের দৃষ্টি গেল। একমাত্র মানুষই সর্বোচ্চ মূল্য পাইল। শেক্সপীয়রের মিরাণ্ডার মুখে একই পুরাতন বাণী ধ্বনিত :—

"How beauteous mankind is
O brave new world
That has such people in it" (Tempest)

মেঘনাদবধ কাব্যের মানুষ রাবণ প্রায় দেবতার সমকক্ষ হইয়া উঠিল মধুসূদনের হাতে। প্রতীচ্য চিত্তজাগরণের প্রেরণা হিউম্যানিসম্-এর (Humanism) উদ্বোধন করিলেন কবি বাংলার চিত্তগগনে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর য়ুরোপের অবস্থার সহিত মধুর সমসাময়িক বাংলা তুলনীয়। সংস্কৃত ভাষার ও পণ্ডিতদিগের বাঁধাধরা কাঠামো উপজীব্য ছিল, সাহিত্য সম্পর্কে। নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে তাঁহারা কখনই আঙ্গিকে বা চিন্তায় কোন স্বাধীনতার প্রশ্রয় দেন নাই। নাটকরচনায় সেই প্রাচীন ও অচল সংস্কৃত রীতি, বড় জোর, সংস্কৃতনাট্যের আড়ষ্ট অনুবাদ ছিল সৌখিন রঙ্গালয়ের উপজীব্য। বাঁধাধরা সংস্কৃত ছন্দ ও সুলভ পয়ারে প্লাবিত ছিল কাব্য। মধ্যযুগের য়ুরোপে চার্চ নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিতে ঠিক এইভাবে চিন্তাধারার বিবর্তন প্রতিরোধ করিয়াছিল।

মধুসূদনের রচনার অনুপ্রেরণা-উৎস সন্ধানে দেখা যায় গ্রীক-সাহিত্যের আত্মা তাঁহার মধ্যে মূর্ত। মধুসূদনের উক্তি :—"My

writings are three-fourths Greek" আমার রচনার চার-ভাগের মধ্যে তিন ভাগ গ্রীক।

রিভাইভ্যাল অফ লারনিং বা বিদ্যার উজ্জীবন মধুসূদনের জীবনে যেমন দেখা যায়, তেমনটি দুর্লভ।* সারাজীবন তিনি পুস্তক পরিবৃত থাকিতেন। ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়ন তাঁহার স্বভাব ছিল। বিভিন্ন ভাষাশিক্ষান্তে ভাষার সম্পদ আবিষ্কার করিয়া নিজের সাহিত্যে নব প্রাণপ্রতিষ্ঠা মধুর ব্রত ছিল। মান্দ্রাজে অবস্থান-কালীন গৌরদাস বসাকের নিকট লিখিত পত্রে দেখা যায়··· "My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine ; ···12-2 Greek,···5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embelleshing the tongue of my fathers ?"

—১৮ই আগস্ট, ১৮৪৯।

য়ুরোপীয় জাগৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনান্তে আমরা অবহিত হই যে রামমোহন রায় প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন যে পথে, মধুসূদন সে পথের পথিক ঠিক নন। রামমোহন রায়ের জাগৃতির প্রামাণিক পুস্তকাবলীর ভাষা ও রচনার সঙ্গে মধুসূদনের রচনার সামঞ্জস্য নাই। মধু 'হেক্টর বধ' নামক যে একমাত্র অসমাপ্ত গদ্য পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে রামমোহনের গদ্য ভাষার সাদৃশ্য কম। তাছাড়া মধু কাব্যেই উজ্জীবিত হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে রিচার্ডসন সাহেবের শেক্‌স্‌পীয়র পাঠ অসাধারণ ছিল। সেই পাঠ শুনিয়া ছাত্ররা মনে করিত

* "ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন"।

('মাইকেল মধুসূদন দত্ত'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

শেক্‌স্‌পীয়রের মত কবি আর নাই, ইংলণ্ডের মত দেশ নাই। মধুর মনে সেই সময় হইতে প্রবল কবিত্ব শক্তি জাগরুক হয়। রামমোহন রায়ের জাগৃতির রূপ অবশ্যই মধুসূদনকে অনুপ্রাণিত করে নাই। রাম-মোহন ছিলেন সমাজ সংস্কারক, মধু সাহিত্যসংস্কারক। রামমোহনের প্রবন্ধের দুইটি ভাবধারা "একটিতে ব্যক্তিজীবনের আদর্শ ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শে গড়ে উঠবার প্রবণতা, অপরটিতে প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে পরিবার, সমাজ জাতি সব কিছুর মধ্য দিয়েই মানব কল্যাণ বোধ।" 'প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ'—হোমশিখা, (আষাঢ়, ১৩৬১)। কৃষ্ণ চরিত্রের আদর্শ অবশ্য বঙ্কিমের আদর্শ। রামমোহনের ব্যক্তি আদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া দুঃসাধ্য নয়।*

সুতরাং "রামমোহন এদেশের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশে তাঁহার অন্তরের তাগিদে লিখিতেন।" 'বাংলা গদ্যসাহিত্যে রামমোহনের স্থান', জয়শ্রী (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৬০)। রামমোহন সাহিত্যের লোক নন। মধুসূদন সমাজের ধার ধারিতেন না। সাহিত্য তাঁহার জীবনদেবতা।

"What a vast field does our country now present for literary enterprise……I wish you would take up the subject of criticism—Aristotle, Longinus, Quintilian……Burke……etc."

(রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র)

* 'কৃষ্ণচরিত্র'—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ 'কৃষ্ণচরিত্র'। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপন। "যিনি বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন,—'বেদে ধর্ম নয়, ধর্ম লোকহিতে, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।"

—'ধর্মতত্ত্ব'—বঙ্কিমচন্দ্র।

তাই রামমোহন বাইবেলের অনুবাদ করেন, মধু করেন ইলিয়াডের। রামমোহনের জাগৃতির সঙ্গে মধুর জাগৃতির প্রভেদ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তক পাঠে আরও ধরা যায়। একদল যুবক সকল সংস্কারের আন্দোলনে সাহসিকতা দেখাইতেন। কিন্তু তাঁহারা বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, রামমোহনের মত নবীনে বিশ্বাসী হইয়া প্রাচীনকে হৃদয়ে ধারণ করেন নাই। "আমরা এক্ষণে এই যুবকদলের অতিরিক্ত প্রতীচ্য পক্ষপাতিতার অনুমোদন করিতে পারি না সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে অকপটচিত্তে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের আলোক অনুসারে চলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।" পৃঃ ১৫৪, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। মধু এমনি একজন যুবক।

রামমোহন প্রবর্তিত জাগৃতি ও মধুসূদনের জাগৃতি পৃথক সত্তার। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 'মাইকেল মধুসূদন' গ্রন্থে বলিয়াছেন "রামমোহন নূতন বাংলার প্রথম মানুষ, আর মধুসূদন নূতন বাংলার প্রথম কবি।"

য়ুরোপে যা সময়সাপেক্ষ ছিল, বাংলায় তাহা একশতাব্দীর মধ্যে সম্পন্ন হইল, কারণ বাংলার জাগৃতির মূলে স্টেটের সম্পদ বা সমবেত বিলম্বিত চেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই। ব্যক্তিত্বের নির্দেশ এবং পরিচালনা বাঙ্গালীর জাগৃতির শক্তি। তাই, বাংলার নবচেতনা উন্মেষের রূপ অনেকটা বিপ্লবের মত। ফরাসী বিদ্রোহের স্বাদ যেন মেশানো আছে।

বিদ্রোহ

নৈতিক মানদণ্ড দিয়া প্রতিভাকে মাপা চলে না। সৃষ্টিকর্তা যাহাকে স্বতন্ত্র সৃজনের গৌরব দিয়াছেন, সে তো স্বতন্ত্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে বৃহৎ কাজ তাহার জীবনে, তাহাতে প্রত্যহের খুঁটিনাটি ব্যাপারে লোকমত মানা তাহার কাছে সম্ভব নয়। বৃথা শক্তিক্ষয় তাহার ঈপ্সিত নয়। লৌকিক আচারের লৌহ শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ রাখা তাহার চলে না। যে মানসিকতায় পৃথক, আমরা তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিব।

বন্যার মত বিদ্রোহ আসে, সামাজিক আচার লৌকিক মত ভাসাইয়া নেয়। বিপ্লব আসে রাজ্যজয়ের মত, কখনও ব্যক্তির জয় সমষ্টির উপর ঘোষণা করে। আত্মা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হয়। যে শক্তিহীন, সে ভাসিয়া যায়। প্রতিভা সমুদ্রের স্বাদ পায়, প্রতিভা বৃহত্তর পৃথিবী করগত করে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মধুসূদন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন।

"Rajnarayan Dutt's son never counts money"

('মধুস্মৃতি'—১৮শ অধ্যায়-পৃঃ ৩৭৭)

রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র মুদ্রা গণনা জানেন না।

নিজের সম্বন্ধে মধুর এই উক্তি তাৎপর্যমূলক। জীবনে কোন হিসাব খতিয়ানের ধার তিনি ধারিতেন না।

ভালমানুষ, 'goody—goody' বালকের মত মাতৃদত্ত ক্ষীর-নবনীতে আকণ্ঠ পুরিয়া, পাল্‌কী চড়িয়া, দুই অনুচর দুই পাশে লইয়া রাজনারায়ণের পুত্র বিষয় সম্পত্তির তদারকে নিজের দুর্লভ শক্তি ব্যয় করেন নাই। যে বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে হাতছানি দিয়াছিল, সে অভিজ্ঞতা নিঃসম্বল শিক্ষকের বেশে লবণাক্ত মাদ্রাজ

সমুদ্রতীরে অথবা দরিদ্র নেটিভ কবিরূপে ফরাসী অনুকম্পার দ্বারে ভিক্ষা করাইয়া তবে নিরস্ত হইয়াছে। জীবন কঠোর বেত্রাঘাতে তাঁহাকে দুঃখ বুঝাইয়াছে—রাবণের দুঃখ, সীতার দুঃখ, তারার দুঃখ, শর্মিষ্ঠার দুঃখ। ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে এমন দুঃখের অভিজ্ঞতা কবির কখনও হইত না।

মনঃসমীক্ষণ বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইবার পরে নিঃসন্দেহে আমাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তনের আলোকপাতে এখন দেশের স্মরণীয় জনের আলোচনা উচিত মনে করি। মনঃসমীক্ষণের বিচারে কোন মানুষ নির্বিচারে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট নয়। শিক্ষা, পরিবেশ ও কিয়ৎপরিমাণে মাতাপিতার স্বভাব প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া ঘটনা সংস্থানও চরিত্র নির্মাণ করে।

আঘাত মানুষকে বাধা দেয়, কিন্তু খর্ব করে না। মনস্তাত্ত্বিক দর্শনে দেখি প্রতিঘাত মানুষকে শক্তি জোগায়। বাধা উত্তেজনা বাড়ায়, সংগ্রামের স্বাদ আনে। নিস্তরঙ্গ জীবনে হয়তো শান্তি আছে, কিন্তু সমুদ্রের স্বাদ কোথায়?

আজ মধুসূদনের খৃষ্টান হওয়ায় আমাদের কিছু আসে যায় না। বিদেশী নারীর সাহচর্য, বিজাতীয় বেশ, প্রচুর মদ্যপান ইত্যাদি এবং মধুসূদনের অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আধুনিক যুগকে বিরক্ত করে না। কারণ তাঁহার কাছে পাইবার বস্তু আমাদের অন্য কিছু।

মাতৃভূমির সেবা করিয়া বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। ভূদেব বাবু* শিক্ষার নৈতিক দিক দেখাইয়া বন্দনীয় হইয়াছেন। মধুসূদন সে দলের লোক নন। তাঁহার দিবার বস্তু ওটুকু নয়—'মেঘনাদবধ' যাহা অনেক শতাব্দীর সঞ্চয়কে আত্মসাৎ করিয়া বাংলা-সাহিত্যে অনেক শতাব্দীর সঞ্চয় হইয়া আছে। নীতিবাগীশ ঊনবিংশ

* ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক শিক্ষা' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

শতাব্দী তাঁহার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছে, বিংশ শতাব্দী তাঁহাকে কিন্তু বুঝিতে শিখিয়াছে।

মধুসূদন বাংলার সেই বিদ্রোহী, যে বিদ্রোহ সহজ সাধারণ বিদ্রোহ নয়। যে বিদেশী বণিকের বেশ* ধরিয়া তস্করের মত ভারতবর্ষে উপনিবেশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, যে বিদেশী অত্যাচারে দেশের সর্বত্র বিরাট কারাগারের সৃষ্টি করিয়াছিল নিজের রাজত্ব বজায় রাখিতে, সেই বিদেশীকে মধুসূদন চিনিতেন না। রাজপুরুষ তাঁহার কাছে শ্বেতদ্বীপের সুশিক্ষিত সাহিত্যিক, উন্নত জাতিমাত্র ছিল—লোভী, অত্যাচারী, পররাজ্যলোলুপ, পরগাছা পরদেশী নয়। যে দেশে মিল্‌টন জন্মান—যে দেশে ম্যাকবেথ লেখা হয়, সে দেশ গরীয়ান। পরপদানত ভারতের প্রতিমুহূর্তের গ্লানি, পরাধীনতার অসহ্য নাগপাশ মোচনের মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনে কৃষ্ণছায়া ফেলে নাই। বিংশ শতাব্দীতে অভিশপ্ত ভারতবর্ষ স্বাধীনতার বেদীমূলে যে প্রাণ বলি দিল, সে প্রাণ মহাকবির প্রাণ নয়। রক্তাক্ত জর্জরিত বাংলা শতাব্দীর অধীনতা শৃঙ্খল মোচন করিল যে দুর্বার প্রচেষ্টায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সে প্রচেষ্টা কোথায়?

১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের অমায়িক ভাব দেখা যায়। ছোটখাটো বিদ্রোহ অবশ্য তৎসত্ত্বেও এখানে ওখানে মাথা তুলিতেছিল। ভারতবর্ষ মনে প্রাণে ইংরেজ শাসন মানিয়া লইতে পারে নাই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে। ১৮২৬-এ পুনায় উমাজী নায়কের নেতৃত্বে বিদ্রোহ, ১৮৩১-এ বিহারে কোল বিদ্রোহ ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। এই ছোট ছোট বিদ্রোহ ১৮৫৭-এর সিপাই বিদ্রোহের পূর্বাভাষ। পলাশীর এক শতাব্দী পরে।

* "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে"

—রবীন্দ্রনাথ

পলাশীর আম্রকানন তখনও রক্তসিক্ত, তাই ইংরেজের রাজমূর্তির একহাতে ফাঁসির দড়ি, কিন্তু অন্যহাতে মিষ্টান্নের থালা। স্কুল কলেজ খুলিয়া, আলবোলার নল টানিয়া, বাইবেল বিলাইয়া সেই নূতন রাজার মূর্তি অমায়িকতায় বিগলিত, ঔদার্যে বিকশিত। 'যদিও অন্যায়ভাবে রাজ্য নিয়াছি, তবুও এখন ন্যায়পথে আছি। যদিও তোমাদের ধনরত্ন পরদেশে চলিয়া যাইতেছে, তবু তো নববর্ষে খেতাব বিতরণ করিতেছি।' সদ্যোজাত ইংরেজ শিশু ভারতবর্ষের কোহিনূর লইয়া খেলা করিতেছে, দোলনায় শায়িতশিশুর নিরীহ ভাব মুখে চোখে। তখনও তাহার লাথি গায়ে বাজিত মাত্র, আঘাত করিত না।

সরকারী কাজে অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে। শ্বেতজাতির নৈকট্যবোধে তৃপ্তি আছে। "নূতন আমদানী খেলো বড়মানুষীতে ইংরেজ চোখ ধাঁধিয়ে দিল।"—'ছেলেবেলা', রবীন্দ্রনাথ। মোগল ঐতিহ্য—ভগ্ন মিনার আর ছেঁড়া ভেলভেটের জরিতে ঘুমাইয়া রহিল। "বাবু কালচারের" 'ইষ্টিকবচ' ও 'দাঁতে মিশি'। (হুতোমপ্যাঁচার নক্সা) উঠিয়া গেল। 'একস্নুটের দল' ইংরেজি অনুশীলন করিয়া সরকারী গোলামখানায় কাজ খুঁজিয়া ধন্য হইল। গোটা বাংলা দপ্তরখানার কেরানীত্ব বরণান্তে আয়াসের মরণে মরিতে চাহিল। মধুসূদন বিংশ শতাব্দীর ক্ষুব্ধ দেশকে পাইলেন কোথায়? সাহিত্যিক আত্মা তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিতে তন্ময় হইয়া রহিল। রাজনৈতিক কাজ মধু বিশেষ করেন নাই। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাম-গোপাল ঘোষের পরিশ্রমে বাংলাদেশে নূতন রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। মধু মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া তাহা দেখিলেন। পরে, হরিশ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুমুখী হইলে মধু তৎসম্পাদিত Hindu patriot-এর সম্পাদনা ভার নেন। প্রধানতঃ অর্থাভাবে (হয়তো পারিশ্রমিকের অনিয়মের জন্য) ১৮৬২ সালে তিনি কর্মত্যাগ করিতে উদ্যত হন, 'মধুসূদন দত্ত'—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়', পৃঃ ৬২।

ইহা ভিন্ন দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ মধু

সাহস করিয়া করেন (১৮৬৪)। তজ্জন্য পুলিশ কোর্টে তিনি লাঞ্ছিত হ'ন। মধুর সহিত রাজনীতির যোগ ছিল না, তিনি স্বদেশ-বৎসল থাকা সত্বেও। নীলদর্পণের অনুবাদ হেতু অবশেষে মধু জীবিকার উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হন কথিত আছে। (বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, "বিবিধ" ও মধুসূদন দত্ত—ব্রজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৯-৬০)। সুতরাং মধু স্বাদেশিকতার জন্য লাঞ্ছিতও হন। ('মধুস্মৃতি'—১০ম অধ্যায়—পৃঃ ২০৫-২০৮)

"হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যখন মৃত্যুশয্যায় তখন মধুসূদন দত্ত বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—হরিশের মৃত্যু দেশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি-কারক হইবে, এ সময়ে স্বাধীন চিন্তার পক্ষ সমর্থন করিতে তাঁহার মত আর কেউ নাই।" ('হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়'—শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মন্দিরা—ভাদ্র, ১৩৬২) আমাদের মতে কেবল অর্থাভাবে নয়, অন্তর্নিহিত স্বাদেশিক প্রবণতার জন্যই মধু স্বদেশ প্রেমিক হরিশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং হরিশের Hindu Patriot কিছুকাল সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে বাংলার জাতীয় চেতনা ঈষৎ উন্মেষিত হয়, কিন্তু হিন্দুমেলার বীজ তখনও রোপিত হয় নাই। পরে হিন্দুমেলা, রাখিবন্ধন, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদমূলক অরন্ধন ইত্যাদি জাতীয়তামূলক কার্য খণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রদেশকে ঐক্যের বন্ধনে আনিল। ঐক্যের মধ্য হইতে কংগ্রেসের জন্ম হইল (১৮৮৪), কিন্তু মধুসূদন তখন সমাধি-নিহিত।

তবু তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়াছি, বলিয়াছি স্বাধীনতার প্রথম বাহক। বিংশ শতাব্দীর ক্ষুব্ধবাংলার ক্ষোভ সেদিনকার পদানত প্রতিহত দেশে একটি লোকের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রূপে জন্মলাভ করে। তিনি আমাদের আপন লোক ঊনবিংশ শতাব্দীর আপন নহেন। বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী আত্মা মধুসূদনের মধ্যে অনুভব করিয়াছে নৈতিক বিদ্রোহ।

যে বিদ্রোহ মনে প্রাণে মধুসূদন অনুভব করিয়াছিলেন তাহার রূপ সেদিন ছিল না। তাহাকে তিনিও চিনিতে পারেন নাই। ঘৃণা ও প্রেমের মধ্যে প্রকাণ্ড সাদৃশ্য আছে। আমাদের গান্ধীজী ছিলেন ব্যারিষ্টার, সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রবৃত্ত, জওহরলাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় মানুষ। তাঁহারা অতি নৈকট্যের মধ্যে ঘৃণা করিতেন, সে ঘৃণার মধ্যে হয়তো তারিফের ভাবও ছিল, মনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কদর ছিল হয়তো। বিরোধের উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে তবে বিরোধ হয়।

মধুসূদন অবশ্যই প্রতীচ্যের প্রেমে বিহ্বল ছিলেন, কিন্তু দাসত্বভাব তাঁহার মধ্যে কখনই ছিল না। তাঁহার মধ্যে ক্ষোভের দাবী ছিল। কেন তাহারা আমাকে নিজেদের তুল্য স্থান দিবেনা, কেন আমার দাবী জানিবে না? আমি দেখাইয়া দেব।

নীলদর্পণের অনুবাদের পরে মধু যে নিপীড়ন সহ্য করেন, তাহার ফলে নিশ্চয় বিলাতযাত্রা। চাকুরি করিতে হইলে অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। স্বাধীন ব্যবসায়ী জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের ধার ধারেন না। আদালতে ব্যারিষ্টারের প্রতাপ মধু অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই অপমানিত বিদ্রোহী স্থির করিলেন তিনি সাগরপারে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবেন। শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ তাঁহাকে হইতে হইবে। যে শ্বেতাঙ্গপ্রীতির জন্য মধু-কে আমরা বিজাতীয়তার আখ্যায় ভূষিত দেখিয়াছি, মধুর লাঞ্ছনা সেই শ্বেতাঙ্গদের স্বরূপ দেখাইবার অপরাধেই হইল। অতএব তিনি সত্যই ভারতীয়।

বিদ্রোহ তাঁহার ব্যারিষ্টার হইবার মূল প্রেরণা। মহাকবি হইবার জন্য তিনি পূর্বে বিদেশগমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। দেশেই মহাকবি হইবার পরে তিনি বিদেশ গেলেন দাসত্বশৃঙ্খল মোচন প্রয়াসে। মধু-র জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির মূলে আছে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রবৃত্তি। যে শ্বেতাঙ্গ নিগৃহীত করে, বাঙ্গালী তাহার সমকক্ষ হইতে জানে। মধু মনের গোপন ইচ্ছাগুলি সম্পর্কে নীরব

থাকিতেন। এখানেও তাঁহার মনোভাব আধুনিক সমালোচক উপলব্ধি করেন।

বাঙ্গালীর মনে যে ক্ষোভের আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহার সূচনা ওখানেই। হীনমন্যতা আমাকে পীড়িত করিতেছে। তাহাদের সমান আমাকে হইতেই হইবে।

সুতরাং মধুসূদন 'পাক্কা সাহিব' হইবার জন্য ধর্মত্যাগ করিলেন। 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে আমরা দেখি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম হ্যাটকোট প্রবর্তন ও সিগারেট ব্যবহার মধু-ই করেন "বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই প্রথম দেশীয় সাহেব।" ('মধুস্মৃতি'—১৭শ অধ্যায়, পৃঃ ৩৩৭) মনমোহন ঘোষ মধুর পূর্বে ব্যারিস্টার হইয়াছিলেন চোগা চাপকানের সাজে। মধু একেবারে পূর্ণ সাহেবী পরিচ্ছদে প্রকট হইলেন। ইংরেজ মেয়ে বিবাহে আত্মপ্রসাদে বন্ধুকে চিঠি লিখিলেন—

"Mrs. D. is of English parentage"—(গৌরদাসকে লেখা পত্র-মান্দ্রাজ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯)

আলবিয়নের তীরের উদ্দেশে দীর্ঘ নিশ্বাস তিনি কবিতায় বাঁধিয়া গেলেন—

"I sigh for Albion's distant Shore" (Extemporary Song)

ছেলেমেয়েকে Europeanised করা অবশ্য কর্তব্য মনে করিলেন, যথা—

"I want them to be thoroughly Europeanised"··· (বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠি, ফ্রান্স, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪)

গৌরদাস বসাককে লেখা পত্রে একই মতবাদ—

"If you want your boy to get in, send him here while he is young enough to be Europeanised···what can you do for him in India?"—(ফ্রান্স, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৬৪)

বাংলাভাষাকে 'গেঁয়ো ভাষা' বলিয়া বাংলার মহাকবি একদা উপহাস করেন সত্য। সাহেবপাড়ায় না থাকিলে জীবন ধন্য হয়না, কবিরাজী চিকিৎসায় লজ্জা আসে। এমন বিজাতীয় রূপ নবজাগ্রত বাঙ্গালী সহ্য করিতে পারে না। আহারে বিহারে সর্বতঃ অনুসরণ ও জীবনের কতকগুলি দিক সম্বন্ধে মতামত মধুসূদনের বিদেশী প্রেমের অভিব্যক্তি।

কিন্তু আবার এই প্রেমের প্রতিক্রিয়া বিরোধ। মধুসূদন সমকক্ষ হইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় কলেজিয়েটদের সকলের জন্য একরকম পোষাক দাবী করেন, সাহেব ছাত্রদের দেশীয় ছাত্রদের পূর্বে সুরাদানের অবিচারে ক্রোধে খাবারঘরের আসবাবপত্র ভাঙ্গেন। নেটিভ শব্দের উচ্ছেদের জন্য মান্দ্রাজ প্রবাসে লেখালেখি করেন মধুসূদন। এই শব্দটি তাঁহার মনে শেলের মত বাজিয়াছিল। ফ্রান্সের ভের্সাই নগর হইতে গৌরবাবুকে মধুসূদন লেখেন—"Everyone, whether high or low, will treat you as a man and not a-" "d-d niggar". But this is Europe, my boy and not India." (২৬শে অক্টোবর, ১৮৬৪) তাই বোধহয় য়ুরোপে পলায়ন মধুর সমকক্ষতার আশা। পরবর্তী যুগে সাহেব বিচারককে নির্ভয়ে মধুসূদন 'pretty long ears' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারিয়াছিলেন।*

হিন্দুধর্মত্যাগী মধু খৃস্টধর্ম গ্রহণান্তে সেখানেও বিদ্রোহ ও বিপ্লবা চিন্তাধারা আনেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হয়ঃ—

* 'মধুস্মৃতি', (১৬শ অধ্যায়—পৃঃ ৩২৭)।

এই ক্রমে উল্লেখ্য যে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে কোন সামাজিক নিমন্ত্রণে সকল ধুতি চাদর ধারীর মধ্যে মধু বিদেশী পোষাকে আসিয়া জবাবদিহি করেন, "ইহা Ruling race-এর পোষাক"।—('মধুস্মৃতি'—১৭শ অধ্যায় —পৃঃ ৩৪০)

"Michael Dutt's Christian friends differed from him because of his peculiar views of Churchmanship. Michael believed that there was no special spiritual benefit in joining any particular Church : in his eyes all the Churches were the same and he thought he might attend divine worship wherever it pleased him."

Reminiscences of the Death of Michael
Modhusudan Datta—Revd.
Joseph Prannath Biswas, B.A., Chaplain of
Trinity Church, Cal.

তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার বিষয়ে তাঁহার ধর্মমত বাধার সৃষ্টি করে। জীবনীকারের বিবরণ হইতে আমরা জানি যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট এই গোলযোগ অবগত হইয়া বিদ্রোহী ও বিপ্লবী মধু বলেন যে, আকাশের নীচে যে কোন তৃণভূমি যেন তাঁহার শান্তি-বিশ্রাম হয়। মানুষের নির্মিত ধর্মমন্দিরের জন্য তিনি ব্যাকুল নন।

আজ দেশ বোঝে মধুসূদনের অশান্ত ক্ষোভ বিদ্রোহ; তাঁহার সাহেবীয়ানা সংগ্রামেরি অন্য রূপ। তিনি বিজিত হইয়া দম্ভে ও স্পর্ধায় বিজেতাদিগের সমকক্ষ হইতে গিয়াছিলেন। তিনি যে তাহাদের নীচে নন ইহাই প্রমাণ করিতে কি না করিলেন! নিজের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিলেন।

ইংরেজ তখনও মৃদু ছিল, বন্ধুত্বের ভান করিত। প্রসাদবিতরণে তাহার দক্ষিণপাণি ছিল প্রসারিত। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কারণ মধুসূদন পান নাই। তিনি ছিলেন সাহিত্যে সকল জাতির সহিত একাত্মা। তবু বিক্ষোভ কেন?

কবির লগ্নপত্রে শুক্র গ্রহ থাকে প্রধান স্থানে। ফলে সে কবিত্ব শক্তির সহিত তারুণ্য যোগায়। মধু ছিলেন চিরশিশু। তিনি বুঝিতে পারেন নাই বিদেশীর প্রতি ঘৃণাই তাঁহাকে প্রেমের রূপ ধরিয়া প্রলুব্ধ করিতেছে। ক্ষোভের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা কারণ নাই, অথচ ক্ষোভ আছে।

তিনি সমকক্ষতার দাবী করিতেন। স্বাধীন মনোভাবে বিজেতার সহিত একাত্মা ছিলেন তিনি। শেলী, শেকস্‌পীয়র, মিল্‌টন যখন বিভিন্ন স্থানের ভাষা চয়ন করিয়া নিজের ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইলে আমিই বা করিব না কেন? আমি কম কিসে? আমার পক্ষে বাধা থাকিতে পারেনা, কারণ ইহা আধুনিক সাহিত্যের নিয়ম। মধুসূদনের সমস্ত অনুসৃতির পিছনে কাজ করিত এই মনোভাব। তিনি ভুলিয়া যাইতেন যে পরাধীন দেশে ইংরেজ ও তিনি এক পর্যায়ের লোক নন। সুতরাং ইংরেজের সঙ্গে সমকক্ষতা বোধ, সমান অধিকার দাবী, দেশের ঐতিহ্যে আস্থা, স্বদেশপ্রেম মধুর রচনায় যে প্রাণ দিল, সে প্রাণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবী বাংলার কেন সারা ভারতবর্ষের প্রাণ।

আমি তোমাকে দেব, আমি তোমাকে সাজাইব—তোমার ভূষণে, অন্য রূপাদর্শচয়নে। ভাষার যুগান্তব্যাপী দৈন্য, ভাবের ক্ষুদ্রতা যিনি ঘুচাইলেন, তাঁহাকে বিপ্লব করিতে হইল। মধুসূদন বাংলার সেই প্রথম বিপ্লবী।

বিপ্লব

বিপ্লব অর্থাৎ 'দ্রুত আমূল পরিবর্তন' (পথের দাবী, শরৎচন্দ্র)। বাংলার আদিযুগ ছিল অদ্ভুত বানান ও ভাষাতত্ত্বের জগাখিচুড়ি। ভারতচন্দ্র ছিলেন মঙ্গলকাব্যধারার শেষ কবি। প্রেম উপজীব্য হইলেও দৈবই তাঁহার প্রখ্যাত বিদ্যাসুন্দরের নিয়ন্তা। তবে তিনি সমাজের ধর্মশাসিত নিয়ম বর্জন করিয়া সোজাসুজি স্ত্রী-পুরুষের মিলন দেখাইলেন। এটি উল্লেখযোগ্য।

'অন্নদামঙ্গল' বা অন্নপূর্ণামঙ্গল কাব্য তিনভাগে বিভক্ত। ইহারই দ্বিতীয় অংশ বিদ্যাসুন্দর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কালিকামঙ্গল বা কালীর মাহাত্ম্যবর্ণন কবির উদ্দেশ। ধর্মঘটিত ও দেবসচেতন প্রাচীন সাহিত্যের ধারায় ভারতচন্দ্র একটু নূতনত্ব আনিলেন গোঁড়া ধর্মের বাড়াবাড়ির প্রতি ঈষৎ কটাক্ষে আধুনিক মনোভাবের চিহ্ন প্রকাশ দ্বারা। রামপ্রসাদেও একই আধুনিক চিহ্ন দেখা যায়। ('বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', পৃঃ ৬০৭, প্রথম খণ্ড, শ্রীসুকুমার সেন।)

তাছাড়া ভারতচন্দ্রের শব্দচয়নের ক্ষমতাও একটি আধুনিক লক্ষণ। ফার্সী ও হিন্দীভাষা শিক্ষা করায় ভারতচন্দ্রের চারটি ভাষার উপর নির্ভর ছিল, ফার্সী, হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষাও তিনি যত্নে শিক্ষা করেন।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আধুনিক কালের হাওয়া বাংলা সাহিত্যে বহিতে সুরু করে। লৌকিক রচনার সূত্রপাতও এই শতাব্দী হইতে। নীতিকাব্য, ঐতিহাসিক গাথা ও গণিতের আর্যা প্রভৃতি দেবমাহাত্ম্য-নিরপেক্ষ ও আদিরসহীন লৌকিক রচনা সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী, দেবদেবীর পাঁচালীর মধ্য হইতে মাথা তোলে।

ইতিপূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও বৈষ্ণব-সাহিত্য রচনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের নবীনতার বীজ পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে কোন মানুষকে সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান করা হয় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের মানুষিক কাহিনীর ইঙ্গিত হয়তো ওখানেই ছিল।

ভারতচন্দ্রের পরে উল্লেখযোগ্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যিনি বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আধুনিকত্ব দেখা দিল কাব্যের বিষয়বস্তুতে। তাঁহার ব্যঙ্গরচনা তো ছিলই, তাঁহার কবিপ্রকৃতির মুখ্যপ্রকাশ ব্যঙ্গে। যথা :—

"গুরু গুরু গুরু গুরু সকলেই কয়
গুরুরব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়।"—(গুরু)

ভারতচন্দ্রের মত এখানে অনুপ্রাসের বহর ও ধর্মে কটাক্ষ। গুপ্তকবির কবিতার মর্মবাণী দ্বিতীয় পংক্তিতে নিহিত আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাংবাদিক ভঙ্গিতে হাল্‌কা রচনার কলম ছিল তাঁহার। নীতি-আদর্শ, দেশপ্রিয়তা, সমাজসেবা, ঈশ্বরভক্তি ইত্যাদি নূতন বিষয়ে কবিতা লিখিয়া এবং সামান্য কিছু কিছু ইংরেজির অনুবাদ ও অনুসরণ করিয়া একটি নূতন পথ কবি দেখাইলেন।

তারপরে উল্লেখযোগ্য রচনা নাটকাবলী। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ নাট্যকারের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া বাংলা নাটককে জড়তামুক্ত না করিলেও কিছুটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। কুলীনের কুলপ্রথার দোষ, বিধবাবিবাহসমর্থন, বহুবিবাহের বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি নানা কুপ্রথার বিরুদ্ধে লেখা হইতেছিল। সমাজসংস্কারক সাজিয়া বাংলার নাটক মঞ্চে উঠিয়াছিল।

বাঙ্গালীর নবজাগৃতির প্রতিক্রিয়া দুইভাবে তৎকালীন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। ইংরেজি শিক্ষায় বাঙ্গালীর মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রথমতঃ, পূর্বতন প্রাচীন সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ ও তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা। গুপ্তকবি লেখেন—

"তারা কি এমন করে পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে ?
তারা আপনহাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

আবার দ্বিতীয়তঃ, সমাজসংস্কারপ্রচেষ্টা অন্যদিকে সাহিত্যে এক অভিনব সমাজ-সচেতনতা উপস্থিত করিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিশিষ্ট লক্ষণ এই সমাজ ও ব্যক্তি-সচেতনতা।

প্রথম লক্ষণ দুইভাবে সাহিত্যে পাওয়া যায় :—

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের পাঠ্যপুস্তক ও সামাজিক নাটক, প্রহসনে।

দ্বিতীয় লক্ষণ মধুসূদনের ব্যক্তি-সচেতনতা। মধুসূদনের পূর্বে সাহিত্যের সৃষ্ট চরিত্র ছিল টাইপ চরিত্র। মধু টাইপের পরিবর্তে ব্যক্তি সৃষ্টি করিলেন। চতুর্দশপদী বা অন্যান্য গীতিকবিতায় তাঁহার আত্মচেতনা ও কখনও আত্মকেন্দ্রিকতা পরিলক্ষিত হয়—

"রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে ?"

এই সূত্রে বিহারীলালের রচনা গীতিকবিতার আত্মকেন্দ্রিকতার পূর্ণ বিকাশ হয়। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথে আত্মপ্রসারের যুগ।

বাংলার গীতিকাব্যে প্রথম হইতে দুইটি সুনির্দিষ্ট ধারা দেখা যায়। মিষ্টিক গান ও পাঁচালি। চর্যাপদ ও শৈবসিদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া যুগী, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, কর্তাভজা, গুরুসত্য ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া অবিচ্ছিন্ন অধ্যাত্ম ও দেহবিষয়ক মিষ্টিক সাধনগীতি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়া আসে ও বিংশ শতাব্দীতে পূর্ণ বিকশিত হয় রবীন্দ্রনাথে।

দ্বিতীয় ধারা, পাঁচালির ধারা অন্য ভাব লাভ করে মধুসূদনে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচালি পদাবলীধারাপ্রধান ছিল। কীর্তন, যাত্রা, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, কথকতা, কৃষ্ণলীলা, কবি, ধর্মঠাকুর ও

শিবের গাজন গান, মায়ুর বা শিববিষয়ক গান—সব পাঁচালি অথবা ছড়াগানের পর্যায়ে পড়ে। বিরাট ও বিস্তৃত এই পাঁচালি কাব্যের ধারা। দাশরথি রায় পাঁচালির বিবর্তন আনেন 'বিধবাবিবাহ পালা' নামক আধুনিক পাঁচালি লিখিয়া। ভারতচন্দ্র পাঁচালিধারার আধুনিক রচয়িতা। দেবমাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক ও আদিরসাত্মক আখ্যান গেয় গাথার রূপে গাঁথিয়াছিলেন তিনি।

প্রাচীন পাঁচালিধারার নূতন শাখার কবি মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীর জাগৃতি গ্রহণ করিয়া প্রথম বাংলার আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন। সেজন্য তাঁহাকে বিপ্লব করিতে হইল এই পটভূমিকায়।* বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহকারে বক্তব্য আমরা পরিস্ফুট করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "এই প্রাচীন দেশে তুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী—জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন!"

মধুসূদনের সাহিত্যনির্দেশ করিয়াছেন বিভিন্ন সমালোচক; যথা—

"মাইকেলের সময় হইতেই বাংলাভাষার নবযুগ। ইংরেজি সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের "সঞ্জীবনৌধিরসে" সঞ্জীবিত হইয়াছিল—যেন একটি উত্তাল ভাবসমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙিয়া-চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গসাহিত্য-ও সেইরূপ সেইসময়ে ইংরেজিসাহিত্যদ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাবরাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল। বঙ্গভাষা নবযৌবন লাভ করিল। মাইকেল আধুনিক পদ্যসাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা।" (ভারতবর্ষ—১৩২০, আষাঢ়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।)

* "প্রাচীন ভারতের এবং বাংলাকাব্যসাহিত্যের সর্ববিধ পুরাতন সংস্কার তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুরাতন ভিত্তির উপরেই নূতন সৌধ গড়িতে পারিয়াছিলেন।"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত—পৃঃ ১১২

শশাঙ্কমোহন সেন মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"মধুসূদন সুরু হইতেই নব্যযুগের বিদ্রোহসুর আনয়ন করিলেন, যেন 'যুদ্ধং দেহি' "—

শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনায় দেখা যায় মধু ঘোষণা করিতেছেন—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে   মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

গদ্য সাহিত্য রামমোহন রায় হইতে নবীন জাতি লাভ করিয়া অন্য অন্য লেখকদের রচনায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের উদাহরণে বাংলা গদ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা', রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যকল্পদ্রুম পত্রিকা'র মত পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। আদর্শ তাহাদের ছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী'র হাল ধরিয়াছিলেন। নানা দিক হইতে বাংলা-গদ্যের সুসময়। উনবিংশ শতাব্দীর গদ্যের ইতিহাসে উইলিয়াম কেরির চেষ্টা এই সঙ্গে স্মরণীয়। শ্রীরামপুর মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দ ইংরেজি হইতে বাংলায় নানা অনুবাদ করেন। অপরদিকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রাচীন কবি সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিতে থাকেন। কোম্পানীর আমলে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কেরি সাহেবের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের মুদ্রণ আরম্ভ করে। কিন্তু পদ্য তখনও পূর্ণতার প্রতীক্ষু। ভারতচন্দ্রের আদিরসাশ্রিত কাব্যমাদকতা হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা কাব্যকে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিলেন হাস্যরস প্রবর্তনা ও ব্যঙ্গমূলক সমাজ সমালোচনার দ্বারা। "ঈশ্বরচন্দ্রে পাশ্চাত্যভাবের প্রতিবিম্বন হইলেও, প্রাচ্য ভাবেরই প্রাধান্য, মধুসূদনে ঠিক ইহার বিপরীত। ঈশ্বরচন্দ্র একযুগের শেষ, মধুসূদনে অপর যুগের সূত্রপাত। উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ভাবের সমন্বয়ে অনুপ্রাণিত একজন কবি, উভয়ের সংযোগরূপে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন পদ্মিনী উপাখ্যান-প্রণেতা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"—(জীবন চরিত, পৃঃ ২০৩, যোগীন্দ্র বসু) ভাবকে ভাষার সিংহদ্বার পার করিয়া আনিলেন যুগস্রষ্টা মধুসূদন দত্ত।

মান্দ্রাজ প্রত্যাগত ইংরেজি ভাষার লেখক মধুসূদন কলিকাতায় কার্য গ্রহণ করিয়া বাস করিবার সময়ে প্রতিভার প্রথম বিদ্যুৎ-জ্যোতি প্রদর্শন করেন। তখন বাংলাদেশে নাট্যকলার পুনরুত্থান হইয়াছে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই নাটকের অভিনয় চলিতেছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হইবার পূর্বে অভিজাতবংশীয় ধনীকুল সখের নাটক অভিনয়ে আনন্দ পাইতেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপন করেন। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় শ্রীহর্ষ প্রণীত সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী' অবলম্বনে একখানি বাংলা নাটক অভিনয়ার্থে লিখিয়াছেন।

শুভমুহূর্তে মধুসূদনের ইংরেজি রচনার খ্যাতি 'রত্নাবলীর' ইংরেজি অনুবাদ কর্মে পাইকপাড়ার রাজাদের নাট্যালয়ের সহিত তাঁহাকে যুক্ত করিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক মধুর জন্মসূচনা। বিদেশী অতিথিদের নাট্যবোধনার জন্য রত্নাবলীর ইংরেজি অনুবাদে প্রবৃত্ত মধুসূদনের মনে সহসা পুরাতনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নাটকে মুক্ত দিগন্তের স্বাদ অনিতে বাসনা হইল।

মধুসূদনের পূর্বে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদসম্বল বাংলা নাট্যমঞ্চ পথ চাহিয়াছিল যুগপ্রবর্তকের। 'শর্মিষ্ঠা' দেখা দিল যুগপ্রবর্তনের রূপ লইয়া। মধু পূর্বাহ্ণেই গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন পত্রে—

"For I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits."

সংস্কৃত রীতি ভিন্ন যে অন্য প্রথায় নাটক রচিত হইতে পারে এ ধারণা কাহারও ছিল না। মধুসূদন বৈদেশিক রীতিতে প্রথম বাংলা নাটক লিখিয়া সাহিত্যে বিপ্লব আনিলেন। পূর্বোক্ত পত্রে আবার দেখা যায়—"There will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama. And it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit."

শৃঙ্খলমোচনের বিদ্রোহ মধুসূদনকে প্রথমে নাট্যকাররূপে সাহিত্য ক্ষেত্রে আনে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ বাংলা সাহিত্যের শুভলগ্ন।

'রত্নাবলী'র অনুবাদ-পীড়িত মধু বলিয়াছিলেন, "রাজারা এই বাজে নাটকের পিছনে এত টাকা নষ্ট করিতেছেন কেন?"...গৌরদাস বলিলেন,..."ভাল নাটক বাংলা ভাষায় কোথায়?" মধু বলিলেন, "ভাল নাটক? আচ্ছা আমি রচনা করিব।" (গৌরদাস বসাক লিখিত 'স্মৃতিকথা' হইতে গৃহীত।)

মধুসূদনের জীবনে প্রায় সমস্ত বৃহৎ ঘটনার মূলেই আছে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকরার প্রবৃত্তি। নাটক লিখিয়া তিনি দেখাইয়া দিবেন।

এই বিদ্রোহ হইতে মধুসূদনের দ্বারা সাহিত্যবিপ্লব সম্ভবপর হয়।*

১৮৫৮ সালে 'শর্মিষ্ঠা', ১৮৬০ সালে 'পদ্মাবতী' ১৮৬১ সালে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক ক্রমে ক্রমে রচিত হইল। 'পদ্মাবতীর' সময়ে মধুসূদন

* নাটকের প্রয়োগরীতির মধ্যেও বিপ্লবী মধুর দান আছে। দৈনিক বসুমতীর 'নাট্য নৃত্য চিত্র' নামক রবিবাসরীয় বিভাগে হেমেন্দ্রনাথ রায় লেখেন—"সকলেই জানেন চিরবিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন জিদ ধরাতে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতারা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে সর্ব প্রথমে নারী শিল্পী গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত করেন।"

রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন, "It is also written on the Classical model". 'পদ্মাবতী'তে গ্রীক পুরাণের ছায়া আছে।

১৫ই মে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পত্র "I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan".

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকেও মধুসূদন য়ুরোপীয় নাটকের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নবযুগ প্রবর্তন করেন। বঙ্গভাষায় 'কৃষ্ণকুমারী' প্রথম বিয়োগান্ত ও প্রথম ঐতিহাসিক নাটিকা। এখানেও মধু পথিকৃৎ। সংস্কৃত নাটকের নির্দেশ তিনি অমান্য করেন।*

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন লইয়া মধুসূদন ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাদানুবাদ চলিতেছিল। যতীন্দ্রমোহন অমিত্রচ্ছন্দে বিশ্বাসী নহেন। মধু বলিলেন, যদি আমি স্বয়ং অমিত্রচ্ছন্দে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনাকে দেখাই, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?† ('জীবনচরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসু। ১০ম অধ্যায়—পৃঃ ২৫৮)

এই চ্যালেঞ্জ লইয়া আবার অমিত্রচ্ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'

* সংস্কৃত নাটকের নিয়মে বিয়োগান্ত নাটক লেখা হইত না। ভাসের 'উরুভঙ্গ' একমাত্র বিয়োগান্ত সংস্কৃত নাটক। 'কৃষ্ণকুমারী' মুদ্রণশেষের পূর্বে মধুর হিতৈষী পাইকপাড়ার ছোটরাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যু হয়। পাথুরিয়াঘাটার রাজা যোগেন্দ্রমোহন সিংহ নিজের থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, ১৮৫৯-৬০। কিন্তু তাঁহার মাতা হিন্দুগৃহের সীমানার মধ্যে নায়িকার ওইভাবে মৃত্যুদৃশ্য প্রদর্শনে আপত্তি করেন। মধুর নবসৃষ্টির সদ্য পরিণতি এই। অবশেষে প্রহসন দুইখানি ও কৃষ্ণকুমারী শোভাবাজার থিয়েটার সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করিয়াছিলেন, (১৮৬৫ ও ১৮৬৭)।

† 'মধুস্মৃতি', নগেন্দ্রনাথ সোম। (অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ ১০৫—একই বিবরণ পাওয়া যায়)

রচিত হইল, ১৮৬০।* মধুসূদন সগর্বে রাজনারায়ণকে লিখিতে পারিলেন—"Our blank verse thrashes the Englishers."

(২৪শে এপ্রিল, ১৮৬০)

মধুসূদনের আকাশস্পর্শী অহঙ্কার 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র পশ্চাৎপট আকাশের ঊর্ধ্বে, দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে স্থাপন করিয়াছে। দেব ও দেবী তাঁহার কাব্যের নায়ক। দৈত্য প্রতিপক্ষ মাত্র।

তাহার পরেই অমিত্রাক্ষরের পূর্ণ বিবর্তন মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'মেঘনাদবধ মহাকাব্যে' (১৮৬১)।

এই তিন বৎসর মধুসূদনের সাহিত্যিক প্রতিভার পূর্ণ পরিচয়। একটির পর একটি রচনা তাঁহার কলমে ধরা দিতেছিল সহজ সাবলীলতায়। অনুপ্রেরণার প্রাবল্যে তিনি কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতেন কাব্যরচনা ও আবৃত্তির মাধ্যমে। মধুসূদনের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।

সমসাময়িক দৃষ্টিতে মধুসূদনের জীবন-আলেখ্যের রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা দিয়াছে। মধুসূদনের কাব্যজীবনের অতি যথার্থ ও চমৎকার পরিচয় মেলে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'মাইকেল মধুসূদন' অভিনয়ে। মঞ্চে নাট্যাচার্য কবির জীবন-অভিনয়ে স্রষ্টা মধুসূদনের রূপ প্রদর্শন দ্বারা মধুকে সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। নিত্যনূতন উদ্ভাবনের প্রতিভায় অস্থির মধুসূদন দত্ত স্বয়ং নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

"My position as a tremendous literary rebel demands the consolation and the encouraging sympathy of frienship." (রাজনারায়ণ বসুকে পত্র, ১৪।৭।৬০)

* ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র দুই সর্গ রচিত হয়। 'পদ্মাবতী' নাটকের মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ মধু অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেন। অমিত্রচ্ছন্দে সম্পূর্ণ একখানি নাটক লিখিবার ইচ্ছা ছিল তাঁহার। 'পদ্মাবতীর' অমিত্রাক্ষর প্রথম ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের বা অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন।

'ব্রজাঙ্গনা' খণ্ডকাব্যও অনুরূপ 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে লিখিত, যদিও বৈষ্ণবপ্রেম ইহার উপজীব্য। কথিত আছে ভূদেববাবু মধুকে বলিয়াছিলেন, "ভাই, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনাতে পার? মহাকাব্য তো লিখলে।" ('মধুস্মৃতি', ১০ম অধ্যায়, পৃঃ ১৮৮) ফলে মধু আবার দেখাইয়াছিলেন--

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ,
চল সখি, ত্বরা করি দেখিগে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।" * †

পাইকপাড়ার ছোটরাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাংলা নাট্যে প্রহসনের অভাব অনুভব করিয়া 'শর্মিষ্ঠা' রচনার পরে মধুসূদনকে প্রহসন লিখিতে অনুরোধ করেন—

Just to show the public that we can act the sublime and ridiculous at the same time."

(৮ই মে, ১৮৫৯)

অতএব ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। বাংলার আদি প্রহসনের গৌরব ইহারাই পাইয়াছে।

* খৃষ্টান মধু চিরকলঙ্কিতা রাধার মর্মবাণী প্রকাশনায় নিজের সাহসের পরিচয় দেন। কথিত আছে নবদ্বীপবাসী একজন বৈষ্ণব মধুকে মহাভক্ত বৈষ্ণব মনে করিয়া দেখিতে আসেন। ('মধুস্মৃতি', ১০ম অধ্যায়, পৃঃ ১৯৫)

† ব্রজাঙ্গনা কবিতাগুলি ওডসের পর্যায়ভুক্ত। "তৎকালীন প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদীর গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া তিনি নানা ছন্দ মিলাইয়া মিলাইয়া বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম নূতন মিশ্রছন্দের প্রবর্তন করেন। এদিক দিয়া বিচার করিয়া অনেকে মধুকে বাংলায় অভিনব গীতিকবিতার প্রবর্তক বলিয়া মনে করেন।" 'মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় ভাগ—বসুমতীসাহিত্যমন্দির।

১৮৩৫ সালে শিক্ষার মাধ্যম হইল ইংরেজি ভাষা।

"যেদিন হইতে ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন হয় এবং একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত হয়, সেইদিন হইতেই এদেশের শিক্ষিত লোকেরা স্বীয় শ্রেণীকেই 'দেশ' বলিয়া জানিতেন। ইতিহাসের দ্বন্দ্বনীতি (Dialectic Method) অনুযায়ী ভারতে ইংরেজের আওতায় মধ্যবিত্ত কুলসমূহ উত্থিত হইতেছে, সেই স্বপ্নেই শিক্ষিতেরা মসগুল।" ("স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত," গল্পভারতী, মাঘ, ১৩৬০, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত)

১৮৩৫ সালের ফল বাংলায় 'ইয়ংবেঙ্গলের' সৃষ্টি। ইংরেজিয়ানার অন্ধ ও হাস্যকর অনুসৃতি দ্বারা এই নব্য বাবুরা বা নূতন ইংরেজি শিক্ষিতের দল দেশের সমস্ত কিছু মন্দ ও ইংরেজের সমস্ত কিছু ভালো প্রমাণ করিতে লাগিলেন। মধু ও তাঁহার বহু বন্ধু প্রথমে 'ইয়ংবেঙ্গলে'র দলে ছিলেন।

কিন্তু, য়ুরোপ হইতে ইয়ংবেঙ্গলদের শিক্ষাগুরু য়ুরোপীয় পণ্ডিত-গণের এক নূতন ভাবধারা ইয়ংবেঙ্গলদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করিল। ভারতবর্ষে অনেক সম্পদ আছে, আমাদের বেদান্ত উপনিষদ। আমরা ভারতীয় হিন্দুগণ কৃষ্ণ হইলেও য়ুরোপের আর্যজাতির বংশধর। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে তখন তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণার অন্তে য়ুরোপের পণ্ডিতগণের মত দেখা গেল যে ভারতবর্ষ প্রতীচ্য ভূখণ্ডের সহিত একই রক্তে যুক্ত। বেদ অতুলনীয় সাহিত্য। তখন নূতন করিয়া আবার স্বদেশিয়ানার জন্ম হইল নিজের দেশের সংস্কৃতি-অনুশীলনের মধ্যে।

"বাংলায় নূতন সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিল।···একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিচয় দিবার জন্য। হিন্দু কলেজের ছাত্র, ঘোরতর সাহেব ও ইয়ংবেঙ্গলদলের উজ্জ্বল রত্ন মাইকেল মধুসূদনের হাত হইতে বাহির হইল 'একেই কি বলে সভ্যতা ?'· ·("ইংরেজিয়ানা ও বাংলায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব" 'গল্পভারতী'

পৌষ, ১৩৬০)। মধু ওই সমাজের দিকপাল, কিন্তু নিজ সমাজের দোষ প্রদর্শন করিয়া বিপ্লবী মনের পরিচয় দিলেন।

মধুসূদন মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া বাংলাভাষার উজ্জীবন দেখিলেন। দেশের যে সুর তাঁহাকে খৃষ্ট ধর্মে অবশেষে দীক্ষা দেয় (১৮৩৪), সে সুর রাগভ্রষ্ট (১৮৫৬)। প্রতিক্রিয়ার প্রভাব মধুর মনেও কাজ করিয়াছিল।

ইয়ংবেঙ্গলদের বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের পরে মধুসূদন রক্ষণশীল সমাজের ভণ্ডামি অনাবৃত করেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে। প্রকৃতপক্ষে, তখন তাঁহার মধ্যে সমাজ সংস্কারক জাগ্রত হইয়া ওঠে। সুতরাং সমাজের দুইদিকেই পক্ষপাতশূন্য ভাবে তিনি বিদ্রূপের আঘাত দ্বারা সংস্কার চাহিয়াছিলেন।

পুস্তকাগারে রক্ষিত প্রাচীন 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' সাময়িক সমালোচনা দেখা যাক—

"অধুনা নাটকের সম্যক সমাদর হইতেছে, সকলেই নাটক দর্শনে উৎকণ্ঠ, অতএব বর্তমানের কুপ্রবৃত্তিসকল নাটকদ্বারা সুন্দর রূপে তিরস্কৃত হইতে পারে, এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' নামে একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ নববাবুদিগের পানাসক্তির নিগঞ্জন।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ', শকাব্দ ১৭৮০,

নূতন গ্রন্থের সমালোচন (৬০ খণ্ড, ২৮১ পৃঃ)।

মধুসূদনের বিপ্লবাত্মক প্রহসন দুইখানি বাংলাদেশ সহ্য করিতে পারে নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তাহাদের মঞ্চস্থ করিতে বাধা দেওয়া হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রোমান কবি ওভিডের 'হিরোয়িক এপিস্টল্‌স্‌ নামক খণ্ডকাব্যের আদর্শে মধু বীরাঙ্গনাকাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব যে ইহাতে মধুসূদন অবৈধ প্রেমের প্রকাশ্য চিত্র অঙ্কন করেন। ইতিপূর্বে এ রকম চিত্র সাহিত্যে ছিল না, যথা,

সোমের প্রতি তারার পত্র। গুরুপত্নীর শিষ্যের প্রতি এমন অবৈধ আকর্ষণ সমাজস্বীকৃত নয়।*

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রচনান্তে বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট প্রবর্তন করিবার উদ্দেশে মধু 'কবি মাতৃভাষা' লিখিয়া রাজনারায়ণকে দেন। পরে পরিমার্জিত রূপে এই সনেটটি 'বঙ্গভাষা' নামে ফ্রান্সে লিখিত চতুর্দশপদীর প্রথমে স্থান পায়; ('মধুসূদনের বঙ্গভাষা'—দীননাথ সান্ন্যাল)

ইটালীর নবযুগ রেনেসাঁসের সৃষ্ট সনেট মধুসূদন বাংলায় এইভাবে আনেন। জার্মান গন্থের আদর্শে কার্লাইলের ভঙ্গির সাদৃশ্যে লেখা হয় হেক্টরবধ। হোমরীয় ভাষাভঙ্গি এখানে পরিলক্ষিত।

ফরাসীকাব্যের আদর্শে মধু বাংলায় নীতি-কবিতা আনেন, "রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে" ইত্যাদি। কাব্য ও নাটকে সংস্কৃত আঙ্গিক কখনও ব্যবহার করিলেও মধু প্রকৃতপক্ষে বিদেশীয় আঙ্গিক বাংলায় আনিয়া সমগ্র বাংলাসাহিত্যের আত্মকেন্দ্রিক ভাবধারায় বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন।† শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষা দিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন তাহাতে নব ভাবধারা আনিয়াছেন।" কিন্তু বাংলাসাহিত্যে শুধু ভাবধারা নয়, রূপরাগ ও ভাষাগঠন-

* "তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বৈচিত্র্যহীন জীবন নিয়ে রাষ্ট্র চলতে পারে, সাহিত্য চলতে পারে না। এ অবৈধপ্রেম মানব প্রবৃত্তিসম্মত এবং যা মানব প্রবৃত্তিসম্মত, তাকে সাহিত্যে উপজীব্য করে তুলে মধুসূদন তার সমসাময়িক কালের সমাজ ও সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বর্তমানে সাহিত্য যে তাঁর নিকট কত ঋণী সে কথা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হোয়ে থাকতে হয়।"

"কবি ওভিড ও শ্রীমধুসূদন"—ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার (পূর্বরঙ্গ মাঘ, ১৩৬০)।

† বাংলার নবজাগরণ বা 'Renaissance in Bengali……' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। গুজরাটের ইন্দু-প্রকাশ নামক ইংরেজি দ্বৈমাসিক পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজি-ভাষায় এই পর্যায়ে প্রবন্ধ লেখেন, (১৮৯৩)।

কৃতিত্ব একমাত্র মধুর প্রাপ্য। নাটক, প্রহসন, ট্রাজিডি, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, সনেট, নীতিকবিতা, গীতিকবিতা, অমিত্রাক্ষর, মিত্রছন্দ একসঙ্গে তিন বৎসরের মধ্যে ভাষায় আনিয়া যিনি যুগান্তর উপস্থাপিত করেন, তাঁহার প্রতিভার মানদণ্ড এখনও নির্মাণ হয় নাই। তাঁহার রচনার বিশদ আলোচনায় তাঁহার প্রতিভা সম্যক অনুভূত হইবে।

শুধু আঙ্গিক বা ভাব নয়—কবিতার নূতন ভাষাও ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের শিরশ্ছেদ করিয়া বাক্য সংক্ষেপ মধুর সৃষ্টি, যথা, মথিয়া, দহিয়া, হেরিনু, পশিলাম ইত্যাদি।

বরুণের স্ত্রী ব্যাকরণসম্মতভাবে বরুণানী হয়—মধুসূদন লিখিলেন বারুণী। শ্রুতিসুখকর নিঃসন্দেহে।

বাংলাভাষায় এই নূতন শব্দচয়ন মধুর নামের সহিত যুক্ত হইয়া বহুল অনুসৃত হয়।

মধুর ইংরেজিয়ানার পশ্চাতে এই মনোভাবই দেখি, "চ্যালেঞ্জ, দেখাইয়া দেব। ইংরেজকে দেখাইব নেটিভ কেমন ইংরেজি লেখে"। পরাধীন হইলেও সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি রাজার দেশের সমান। তাই ইংরেজি ভাষার অনুশীলনে তাঁহার ক্ষাত্রবীর্য প্রকাশ পাইয়াছিল। তখন বাংলাভাষাকে তিনি অপাংক্তেয় মনে করিতেন।

মধুর বাংলাসাহিত্য রচনার পশ্চাতেও একই মনোভাব, দেখাইয়া দেব। দেশের লোককে, বিশেষতঃ পণ্ডিতদিগকে দেখাইয়া দিব সাহেব কেমন বাংলা লেখে। ইংরেজদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রেমের রূপ ধরিয়া মধুকে প্রতারণা করে ও গৃহছাড়া করে। পূর্বেই বলিয়াছি যাহাকে আমরা ঘৃণা করি মনস্তত্ত্বে দেখা যায় যে তাহারি প্রতি গুপ্ত প্রেম থাকে। সংস্কৃতপণ্ডিতদের প্রতি বিদ্বেষ-বোধ মধুকে বাংলাভাষায় প্রেম প্রদান করিল। পুনর্বিচারে দেখা যায় বিদ্রোহ ও অবশেষে বিপ্লব মধুর কাম্য। এই প্রসঙ্গে সম্যক

আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। তবু পুনর্বার স্মরণ করি মধুসূদনের সংকল্প—

"It is my intention to throw off the fetters, forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit"

(গৌর বসাককে লেখা চিঠি 'শর্মিষ্ঠা' রচনাকালে)

"We, friend, are the men to turn away those beggars of pretenders, whom they call Pundits, but whom I call barren rascals."

(রাজনারায়ণকে লেখা চিঠি, ১৪।৭।৬০)

বিদ্রোহী মধুসূদন ভাষার বন্ধন মোচনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র উৎসর্গকালে মধু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখেন—

"এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।" (উৎসর্গ পত্র)

"প্রকৃত কবিতা-রূপী কবিতার বলে,—

চীন নারী সম পদ কেন লৌহফাঁসে ?" ('মিত্রাক্ষর' সনেট)

শৃঙ্খলমোচনের চেষ্টা মধুসূদনের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধুর যুগে দেশে তাঁর মত ব্যক্তির নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। তিনি প্রকৃত বিপ্লবী।

'ধর্মত্যাগ', 'শ্বেতাঙ্গিনীবিবাহ', 'বৈদেশিক' ও 'বিজাতীয় আচরণ' সব কিছুই এক বিদ্রোহী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন দেশের এমন একটি সময়ে যখন তাঁহার আবির্ভাব প্রয়োজনীয় ছিল। বাংলাদেশ রাজনৈতিক অর্থে তখনও অবশ্য বিপ্লব করে নাই। কিন্তু ঘনীভূত স্বাদেশিকতা ও ধূমায়মান অসন্তোষ বিপ্লবের অন্তর্নিহিত অগ্নির সমিধ রচনা করিতেছিল নিঃশব্দে, গোপনে। সাহিত্যিকক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব আনিলেন—কবি শ্রীমধুসূদন। "A Tremendous Literary Rebel !"

ছোট ছোট লক্ষণগুলি আপাতদৃষ্টির বিচারে নূতনত্বের সন্ধান দেখায় না সত্য, কিন্তু সামগ্রিক মধুসূদনের বিচারে তাহাদের বার বার উল্লেখ অপরিহার্য হইয়া ওঠে। ক্ষুদ্রের সমষ্টিগত সংগ্রহ ক্ষুদ্র নয়। সাহিত্য-বিপ্লবীর জীবনী নূতন আলোকপাতে আজ আমরা পড়িতে চাই।

স্বাদেশিকতা

প্রতিটি জীবনীকার ও সমালোচক মধুসূদনকে বিশেষণ দিয়াছেন 'বিজাতীয়'। উৎকট পাশ্চাত্য-পন্থী, ধর্মত্যাগীকে এভাবে অভিহিত করিলে আপত্তির ক্ষেত্র কমই থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নূতন চিন্তালোকে মধুসূদনকে আমরা অন্ততঃ অন্যভাবে দেখিবার চেষ্টা করি।

মধু ইংরেজকে দেখাইয়া দিলেন যে তিনি কোন বিষয়ে ন্যূন নন। বিদেশী সম্পদে দেশীয় সাহিত্যের অঙ্গরাগ করিলেন বিপ্লবের উল্লাসে। তাঁহার উৎস সন্ধানে দেখা যাইবে বিদেশীয় সাহিত্যের কাছে তিনি কত ঋণী। কেবল মাত্র এই সকল বাহ্য কারণ ধরিয়া বহু সমালোচকই স্থূল ভাবে একটি কথা বলিয়া গিয়াছেন—কবির বিজাতীয়তা, অর্থাৎ জাতীয়তার অভাব। নিম্নের উদ্ধৃতিসমূহের বিচার করিলে দেখা যাইবে মধুসূদনের বিষয়ে পরস্পরবিরোধী কত উক্তির উদ্ভব হইয়াছে।

"মধুসূদনের গ্রন্থে যে জাতীয় ভাবের এত অভাব এবং বিজাতীয় ভাবের এত প্রাধান্য, তাঁহার ধর্মমত পরিবর্তনও তাহার কারণ।"

('জীবনচরিত', পৃঃ ১৩৩, যোগীন্দ্রনাথ বসু)।

"পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে নয়

পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য পরগাছার ফুল। "অর্কিডে"র মত তার আকারে অপূর্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাকলেও তার সৌরভ নেই। ('সবুজ পত্রের মুখপত্র'—প্রমথ চৌধুরী, বৈশাখ, ১৩২১)

"মেঘনাদবধের সমালোচনা যখন লিখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ১৫। তাছাড়া, তখন মাইকেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথের পত্র সজনীকান্ত দাসকে—

('আত্মস্মৃতি'—শ্রীসজনীকান্ত দাস।)

"মধুসূদনের গায়েও একটু আঁচ লাগলো। নীলদর্পণের অনুবাদক বলে তাঁকে সরকারী কার্য থেকে বিচ্যুত হতে হল।" ('বিপ্লবী বাংলা' পৃঃ ৩৪, রাজেন্দ্রলাল আচার্য)

" 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ঘটনাস্থল নবীন সমাজের লীলাক্ষেত্র কলিকাতা শহর, কিন্তু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র সংযোগস্থল প্রবীণ সমাজের পীঠস্থান পল্লীগ্রাম। পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিলেও মাইকেল তাহার কথা জীবনে কোন দিনই ভুলেন নাই।···দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিক ইঁহাদের কথা সাহিত্যে আলোচনা করিয়াছেন মাইকেলের পরে। বিধর্মী, সমাজদ্রোহী মাইকেলের পক্ষে পল্লীসমাজের দুর্গত লোকের চরিত্র সম্বন্ধে আগ্রহবান হওয়া বিস্ময়কর বটে।" (পৃঃ ৬৫)

('বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এ প্রাদেশিক ভাষায় নাটকীয় চরিত্রের কথোপকথন পাওয়া যায়। পৃঃ ৬৭)

('বাংলা নাটকের ইতিহাস'—শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ)

"ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রলয় উৎসবের দীপালীর আলো হইতে মাইকেল যে প্রদীপ জ্বালাইলেন সেই প্রদীপ হইতে কেহ আলো জ্বালাইতে আসিল না।"

('প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য', শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী—প্রবাসী, পৌষ, ১৩২১, পৃঃ ৩১২)।

"যতগুলি লোক মত পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই মেঘনাদবধ কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছে মেঘনাদবধ কাব্য।" (শত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের ভোট সংগ্রহ—'বেতালের বৈঠক'—প্রবাসী, পৌষ, ১৩২১, পৃঃ ৩৬২)

সাহিত্যানুসন্ধানীদের পরম দুর্ভাগ্য মধুসূদন ছিলেন বিধর্মী। বাংলাসাহিত্যের সেবা ও তত্ত্বানুসন্ধানের কাজ হিন্দুরা করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টমতাবলম্বী ইংরেজি ভাষায় অধিকতর পরিশ্রমী। মধুসূদনের বংশধরেরা বিজাতীয় হইয়া গিয়াছেন। পূর্বপুরুষের স্মৃতি অনুশীলন করিয়া স্মৃতি রক্ষার উৎসাহ তাঁহাদের নাই। বাংলা-ভাষা তাঁহারা জানেন না। যে নাম বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু হইয়াছে তাহা তাঁহাদের অনুপ্রেরিত করে না। সুতরাং মধুসূদনের ভক্তদের সে সকল স্থানে তথ্যসংগ্রহের কোনই উপায় নাই। কয়েকটি প্রাচীন জীবন-কাহিনী, কয়েকখানি মধুসূদন দত্তের সাহিত্য আলোচনা পুস্তক ও আধুনিক যুগে লিখিত একদেশদর্শী দুই একটি রচনা সম্বল করিয়া বাংলাসাহিত্যের নবযুগপ্রবর্তকের যথার্থ প্রামাণিক আলোচনা করা যায় না। বিশেষতঃ মান্দ্রাজ বাসের সময় তিনি প্রায় অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। তাছাড়া, আত্মচরিত হাতে না থাকায় জটিলচরিত্র প্রতিভার অন্তর্জীবন সম্পর্কে কথা বলা বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত নয়। যে যুগ আমরা দেখি নাই, সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর বিষয়ে প্রামাণিক কিছু বলিতে হইলে আমাদের আজ সম্বল তাঁহার রচনাবলী ও পত্রগুলি। এ বিষয়ে পূর্বসূরীদের স্বকপোলকল্পিত আলোচনা আলোকপাত করিতে পারে না।

'বিজাতীয় ভাব', 'বৈদেশিক প্রভাব' প্রভৃতি কথা সাহিত্যিক অবদানে প্রয়োগ চলেনা। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রী নয় —দেশের ও যুগের সম্পদ। ভুঁইফোঁড় লেখক জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহার জন্মের সঙ্গে বিশ্বের যত সাহিত্য, যত জ্ঞান জন্মস্বত্ব রূপে তিনি

লাভ করেন। সাহিত্য বিজ্ঞানের মত। নিজের ভাষা ও নিজের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিদেশীয় বা স্বদেশীয় পূর্বস্থূরীদের সংগ্রহ হইতে শক্তিশালী লোক যাহা গ্রহণ করেন, তাহা গ্রহণ মাত্র, অনুকরণ নয়। অ্যাসিমিলেশন বা স্বাঙ্গীকরণ ও ইমিটেশন বা অনুকরণ এক সংজ্ঞা নয়। যিনি যুগের পথ-নির্দেশক, একটি যুগের নানামুখী ভাবধারা তাঁহার মধ্যে বিকাশ লাভ করে। তিনি যেন আধার মাত্র হন—আধেয় তাঁহার যে ব্যক্তিমানস তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানসে পেঁছায়—সেই ব্যক্তিমানস। আধেয়, তাঁহার সেই সঞ্চয়, যাহা চারি পাশের খণ্ড কালকে অতিক্রম করিয়া একটি যুগের কক্ষে কক্ষে আবর্তিত হয়। যিনি যে যুগকে যত বেশী রূপ দিতে পারেন, তিনি তত বেশী শক্তিশালী। যিনি শতাব্দীর সঞ্চয় যত বেশী আত্মসাৎ করিতে সক্ষম হন, তিনি তত বেশী জ্ঞানী। নিঃসঙ্গ মানুষের মনের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না। কাল নূতন করিয়া কোন কিছু রচনা করিতে পারেনা। সময়ের হাতে তাসের সংখ্যা বড় কম। 'Everything is on the table.' তাই যুগে যুগে দেখি পুনরাবৃত্তি। একই অখণ্ড বস্তুর কালের বিভিন্ন দর্পণে প্রতি-ফলিত বিভিন্ন নূতন রূপ।

মানুষের নিজেকে রূপ দিবার চেষ্টা মানেই তাহার জগৎকেও রূপ দিবার প্রচেষ্টা। যে মানুষ যত বেশী বহির্বিশ্বে মুক্ত, তাহার মন তত বেশী স্বাধীন। সে শুধু চারপাশ লইয়া কখনই তৃপ্ত থাকেনা। তাই মধুসূদনের সর্বগ্রাসী প্রতিভা নানা দেশ ও নানা কালকে স্বচ্ছন্দে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশে প্রথম সাহিত্যিক পরিব্রাজক।

ইতিপূর্বে জাগৃতি শীর্ষক পরিচ্ছেদে মধুসূদনকে রামমোহন রায়ের সহিত তুলনা করিয়াছি। রামমোহন রায় বাঙ্গালীর চিন্তা জগতে নূতন আলোড়ন আনিয়াছিলেন। সাহিত্যে সেইরকম নূতন চিন্তার প্রবর্তক নিঃসন্দেহে মধুসূদন দত্ত। ষোড়শবর্ষ বয়সে রামমোহন তিব্বতের

গিরিশৃঙ্খল উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বজগতের* সম্মুখে বাঙ্গালীর মনের বল দেখাইয়াছিলেন। মধু পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাষারূপ ব্যবধান অতিক্রম করিয়া বাংলাকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আনিয়া ফেলিলেন।

মহাকবি দান্তের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মধুসূদন একটি বাংলা সনেট লিখিয়া ফ্রান্স হইতে স্বকৃত ফরাসী ও ইতালীয় অনুবাদ ইটালীর রাজাকে পাঠাইয়াছিলেন। ইটালীরাজ ভিক্তর ইমানুয়েল কবিকে লেখেন, "আপনার কবিতা রাখীবন্ধনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে যুক্ত করিবে।"

কোন সমালোচক মহাশয় তাঁহার 'মাইকেল মধুসূদন' গ্রন্থে এই ঘটনার বিষয়ে লিখিয়াছেন ঃ—

"মধুসূদনও জানিতেন না, ইটালীরাজও জানিতেন না, যাঁহার কবিতা সত্যই প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে সংযুক্ত করিবে, তিনি অতি দূরে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে কোনও শিশুশাখায় সেদিন নিদ্রিত।"

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুর ফ্রান্সে প্রবাস ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে কি অর্থে যুক্ত করিল?

কাব্যরসিকমাত্রে জানেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও কাব্যের উৎস সম্যকভাবে প্রাচ্যে নিহিত। পাশ্চাত্য গীতিকবির যৎসামান্য প্রভাব তাঁহার কাব্যে দৃষ্ট হয়। উপনিষদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত

---

* Raja Rammohan Ray—Mary Carpenter. নিজের লেখা সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে রামমোহন বলেছিলেন, "when about the age of sixteen, I composed a manuscript calling in question" the validity of the idiolaterous system of the Hindoos. This together with my known sentiments on that subject, having produced a coolness between me and my immediate kindred, I proceeded on my travels and passed through different countries, chiefly within, but some beyond the bounds of Hindusthan with a feeling of great aversion to the establishment of British power in India."

কাব্য তাঁহার। বিহারীলাল হইতে কবীর, জৈনসাহিত্য, বৌদ্ধ দোঁহা, বৈষ্ণব কবি, কালিদাস হইতে বাউল, আউল, কীর্তনীয়া প্রভৃতি কবির অতি প্রচুর প্রভাব তাঁহার মধ্যে দেখা যায়। গ্রীক নাটক বা বিদেশী কাব্যের সঙ্গে তুলনার ক্ষেত্র নগণ্য। এখানেও আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পূর্ণ ভূঁই-ফোঁড় কবি নহেন। তাঁহার বৃহত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া শতাব্দীর সাহিত্য সঞ্চয় তাঁহাকে মালমসলা যোগাইয়াছে। প্রাচ্যের প্রতিনিধি কবি রবীন্দ্রনাথ।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচ্যের ভাবসম্পদ প্রতীচ্যের দ্বারে উপস্থিত করিয়া দুইটি ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, অথবা রহস্যাবৃত ভারতবর্ষের গভীর আধ্যাত্মিক মর্মবাণী বহন করিবার দাবী একমাত্র রবীন্দ্রনাথের থাকিলেও তিনি প্রাচ্য চিন্তা ও দর্শনে প্রতীচ্যকে যোগ করেন নাই। অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষের সঙ্গে বাস্তববাদী য়ুরোপের যে কোথাও মিল নাই তাহা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মত করিয়া কে আর বুঝিয়াছিল? উভয় দেশের চিন্তাধারার অঙ্গাঙ্গী সংযোগ হওয়া হয়তো সম্ভবপর নয়—তবে মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে শান্তিকামী ভারতবর্ষ জগতকে আহ্বান করিয়াছে প্রেমে 'ভারততীর্থে' 'মহামানবের সাগরতীরে'। ধ্বংসোন্মুখী পশ্চিমী সভ্যতার করালগ্রাসে পশ্চিমের অধোগতির পাশে পাশেই ভারতবর্ষের প্রাণের উপাসনা দেখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

"এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
নহে কভু সৌম্য রশ্মি অরূপের লেখা
তব নব প্রভাতের"

(নৈবেদ্য)

"প্রতীচ্যে সত্য শিব সুন্দরের আশ্বাসবাণী" ধ্বনিত হইবে—রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পথে মুক্তি নাই —মুক্তি "চিত্তসম্পদের পরিপূর্ণতায় অখণ্ড ঐক্যের পথে, ব্রহ্মের পথে, জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে।"

এই ভারতীয়চিন্তাধারা যুগদেবতা রামকৃষ্ণের উপদেশে সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। এই চিন্তাধারা গানে গানে পশ্চিমের দ্বারে বহন করিয়া নিলেন রবীন্দ্রনাথ। অশান্ত য়ুরোপ তাঁহাকে মর্যাদা দিল। ভারতবর্ষের চিন্তাধারার পার্থক্য তাহারা বুঝিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ করিলেন পাশ্চাত্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব—চিন্তার সংযোগ নয়। তিনি ভারতের বাণী য়ুরোপে বহন করিলেন, য়ুরোপের বাণী ভারতে আনিলেন কম।

সুতরাং অনায়াসেই বলিতে পারা যায় সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের যে যোগসূত্র চিন্তার, তাহা মধুর দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের পূর্বে। তীক্ষ্ণধী ভিক্তর ইমানুয়েল ভ্রান্ত আশ্বাস দেন নাই।*

---

* "তিনি আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বদীক্ষিত এবং বিশ্ব অধিবাসী বাঙ্গালী"। ('মধুসূদন', অন্তর্জীবন ও প্রতিভা, শশাঙ্কমোহন সেন)

বহু বৎসর পরে কবির সমাধিক্ষেত্রে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিবার সময়ে (১৮৮৮, ১লা ডিসেম্বর) ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ তাঁহার ইংরেজি বক্তৃতায় কবির পূর্ন বয়সের মতামত বলেন—

—"চব্বিশ বৎসর পূর্বে ফরাসী দেশের ইতিহাসবিশ্রুত ভরসেল্‌স্‌ নগরীতে দত্তজ মহাশয় যখন কবিগুরু দান্তের সম্বন্ধে তাঁহার সুপরিচিত চতুর্দশপদীরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন—যখন উপরিউক্ত পরিপাটি ভাষায় অনূদিত করিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন যে, যে কোন বিদেশীয় ভাষায় যতই উৎকৃষ্ট অধিকার লাভ করুক না কেন, নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন যেন অন্য ভাষায় কবিতা রচনার চেষ্টা না করে * * যিনি আপনার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধশালিনী করিতে এতদূর করিয়া গিয়াছেন"—('মধুস্মৃতি,' ২১শ অধ্যায়, পৃঃ ৪৩৯)

"পূর্ব ও পশ্চিমের সম্মিলন স্থাপনের জন্য ব্রাহ্ম সমাজ এদেশে আবির্ভূত হইয়াছে……বিশাল মুক্তির তত্ত্বকে মুক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে প্রদান করিতেছেন এবং য়ুরোপের সর্বোচ্চ মুক্তির আদর্শের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইতেছেন।"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

('পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদান প্রদান'—প্রবাসী ভাদ্র, ১৩২৪)

রামমোহন রায়ের দ্বারা সাহিত্যিক গদ্যে তত্ত্বালোচনার পরে বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার ভঙ্গিতে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যে, প্যারীচাঁদের কাহিনীতে কিঞ্চিৎ য়ুরোপীয় প্রভাব ছিল। সে সময়ের জনপ্রিয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইংরেজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ না হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক ভাষানুসরণের প্রয়াস পাইতেন যথা, 'প্রণয়ের প্রথম চুম্বন' প্রভৃতি কবিতায় পাশ্চাত্যভাব। কিন্তু ঐশ্বর্যময়, প্রতীচ্যের ভাবধারা, প্রতীচ্যের ছন্দ, প্রতীচ্যের আঙ্গিক আনিয়া বাংলার মৃত ভাষাকে যে অসামান্য প্রতিভা উজ্জীবিত করিলেন, তাঁহার দানের তুলনা কোথায়? মধু বিদেশে থাকিতে—Tennyson, Victor Hugo, Goldstuker প্রভৃতি বিদগ্ধ ও বিখ্যাত মনের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁহার যে পরিচিতি কত বিস্তৃত ছিল তাহার প্রমাণ দেখি বিদ্যাসাগরকে লিখিত পত্রে, (১৭ই জানুয়ারি, ১৮৬৬)।

"I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College, London."

একজন সহায়হীন দীন দরিদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ কথা নয়। বাংলার কবি য়ুরোপের সঙ্গে হাত মিলাইলেন আদান প্রদানের মধ্য দিয়া। তরুণ জীবনে অপরিণত কবিত্বশক্তি প্রতীচ্যের দ্বারে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়াছিল। পরবর্তী জীবনে কবি প্রতীচ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সমগ্র কবিসত্তা পিপাসিত হইয়াছিল দেশের মাটিতে একটু স্থান পাইবার জন্য। বিভিন্ন ভাষাজ্ঞপণ্ডিত বিদেশী ভাষায় রচনা করিতেন কেবল বিদেশী ভাষার অনুশীলন অভ্যাস হেতু। বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ কবিবার কামনা তাঁহার সাহিত্যজীবনের মূলমন্ত্র। প্রতীচ্য তাঁহার নিকট হইতে যতটা পাইতে পারিত তাহা বহন করিবার, বিতরণ করিবার সময় তাঁহার অল্পজীবী জীবনে ছিল না। তিনি মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

সমগ্র জীবন মধুসূদন ছাত্রের জীবন যাপন করিয়াছেন, বাংলা-ভাষার সাহিত্যিক হিসাবেই, বিজাতীয়তার জন্য নয়। মান্দ্রাজে

অবস্থান কালীন মধু গৌরদাস বসাককে লেখেন, "(১৮ই আগস্ট ১৮৪৯) যে মাতৃভাষার উৎকর্ষের জন্যই তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজির চর্চা করিতেছেন—পুনর্বার।" ('জাগৃতি' দ্রষ্টব্য)

মান্দ্রাজে ইংরেজিভাষায় লেখক, ইংরেজ দুহিতার স্বামী হইয়াও তিনি মনে মনে স্থির সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন কোনদিন নিজের ভাষায় সাহিত্যিক হইবার, আপন ভাষারই অঙ্গরাগ করিবার।

ফ্রান্স হইতে গৌরদাস বসাককে পত্র, (২৬শে জানুয়ারি, ১৮৬৫),

"You know my dear Gour, that the knowledge of a great European language is like the aquisition of a vast and well cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarise my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue."*

এই পত্রে মাতৃভাষায় তাঁহার অকপট অনুরাগ ও মাতৃভাষার মানবর্ধনের আকাংক্ষা ছত্রে ছত্রে গ্রথিত। মান্দ্রাজে থাকিবার সময়ে মধু ছোট ছোট কবিতা ছাড়া দুইখানি ইংরেজি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, 'The captive Ladie' ও অসমাপ্ত 'The Visions the Past'.

এখনও অনেকে ভ্রমাত্মকভাবে বলেন যে, ইংরেজি কাব্যের আশানুযায়ী আদর না হওয়াতে, বীটন সাহেবের অনুরোধ ও গৌরদাসের সস্নেহ অনুনয়ে মধু বাংলাভাষায় লেখা স্থির করিলেন।

"বীটনের পত্রে মধুর মনের গতি ফিরিল। তিনি অতঃপর মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসংকল্প হইয়া বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন।"

* I dare say the sonnet চতুর্দশপদী will do wonderfully well in our language.

('সাহিত্য সাধক চরিত মালা'র ২৩ খণ্ড, 'মধুসূদন দত্ত', শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়)

এই উক্তি যথার্থ নয়।

বীটনের কথা গ্রাহ্য করিবার মত লোক মধুসূদন নহেন। জীবনে তাঁহাকে বহু ব্যক্তিই সৎপরামর্শ দিয়াছিল, তিনি কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার জীবনে দুঃখের মূল সেখানেই। এত বন্ধু থাকিতেও কবির শেষ জীবনের অবস্থা ভয়াবহ হইল কেন? তাঁহার বন্ধুরা কি এতই উদাসীন ছিলেন? তাহা নহে, তিনি কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না, একগুঁয়েমি তাঁহার ধর্ম ছিল। (যথা, ধর্মান্তর গ্রহণ, মাদ্রাজ গমন ইত্যাদি।) পরম উপকারী বিদ্যাসাগর পর্যন্ত স্পেন্সেস হোটেল হইতে তাঁহাকে স্বহস্তসজ্জিত গৃহস্থপাড়ার ভাড়া বাড়ীতে আনিতে পারেন নাই।* য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পরে জাঁকজমক ও বিলাসিতার পথে মধু ফিরিয়া গেলেন পূর্বকালের কৈশোরদিনের মত। ধীশক্তি-বিকাশ-দীপ্ত সৃষ্টির দিনগুলিও বিলাসপঙ্কে ও চঞ্চল মানসিকতায় লুপ্ত হইল। সৎ পরামর্শ গ্রহণ না করিবার ফল।

সুতরাং আমরা দেখি মধুর মনে বাংলাভাষার প্রতি প্রীতি আসিয়াছিল স্বতঃ। (বীটনের পত্র পাইবার তারিখ ২০শে জুলাই, ১৮৪৯) ইহার পূর্বেই মধু গৌরদাস বসাককে ১৪ই জানুয়ারি, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পত্রে লেখেন :—

"I say, old Gour Das Bysak! Cannot you find me a copy of the Bengali Translation of the Mahabharat by Casidas as well as the ditto of Ramayana—Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention. Won't you oblige me, old friend, eh, old Gour Das Bysak?"

এই চিঠির আবেগ বাংলাভাষার প্রতি আবেগ। বীটনের পত্র

* 'মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্রনাথ সোম (ষোড়শ অধ্যায় ৩১৪-১৫ পৃঃ)

পাইবার পূর্বেই বাংলাভাষার ও নিজের দেশের প্রতি মধুর প্রবল আবেগ আসিয়াছিল। এই আবেগের উৎস বিরহ। বিরহ ভিন্ন এমন প্রেম হয়না। এই বিরহ যাহাকে ইংরেজিতে nostalgia বলিব, ভাবুককে রচনাকার্যে যত অনুপ্রেরিত করে এমন আর কিছুই করেনা। কলিকাতায় ছাত্রজীবনে থাকা অবস্থায় মধুর যে আদর্শ ছিল, পরে পরিণততর বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সে সব আদর্শের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। ছাত্রজীবনে বাংলাভাষায় লেখা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। ইংরেজি ভাষায় রচনা করিয়া ইংরেজ কবির সমকক্ষ হওয়া ছিল তাঁহার ঈপ্সিত। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত তখনই বীটনের পত্র পাইবার পরে নয়। তাঁহার অনন্য কবিত্বশক্তি ভিন্ন আরও একটি অনন্য বস্তু প্রথম হইতেই তাঁহার মধ্যে ছিল পাণ্ডিত্য-শক্তি, মেধা ও বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা। হিন্দু কলেজ ও বিশপস্ কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যেই ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা ছিল। পারস্যভাষা মধুর আয়ত্তে ছিল। তিনি বিশপস্ কলেজে "কুমার-স্বামীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।" ('মধুস্মৃতি', ৪র্থ অধ্যায়—পৃঃ ৪৪, নগেন্দ্রনাথ সোম) কাজেই ভাষাশিক্ষাও বহুপূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

মধুসূদনের মান্দ্রাজবাসের চিত্র অস্পষ্ট। আমরা কোন লিখন অথবা ইতিহাস পাইনা, যে সূত্র ভাবী মহাকবির অজ্ঞাতবাসের চিত্র বলিয়া দিবে। সমগ্র মান্দ্রাজপ্রবাসের উপর রহস্যের যবনিকা। অথচ, তাঁর জীবনের যৌবনমত্ত শ্রেষ্ঠ দিনগুলি ওখানেই অতিবাহিত হয়।

মান্দ্রাজসমুদ্রের উপকূলে দেখিলাম সেই মহাবিদ্যালয়টি; যেখানে মধুসূদন দত্ত প্রবাসজীবনে অধ্যাপনা করিতেন। সেখানে উপস্থিত হইলে প্রথমেই চোখে পড়ে সাগরমেখলা ধরিত্রীর রূপ। প্রচণ্ড তরঙ্গভঙ্গে মহাসমুদ্র নীলাভ-শুভ্র-দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছে। বেলাতটে বালুর বুকে হয়তো কোন শুভলগ্নে মহাকবির দৃঢ় পদক্ষেপ পড়িয়াছিল। এত বছরের সমুদ্রবারি সেই সমুদ্র সিকতা প্লাবিত

করিয়া মুছিয়া নিয়াছে পদচিহ্ন। কিন্তু সমুদ্রতীরে ভ্রাম্যমান কবির মনোভাব অমর হইয়া আছে তাঁহার কাব্যে।

প্রকৃতই দেখা যায় সমুদ্রবন্ধন ও স্বর্ণলঙ্কার কাব্য উৎপত্তির মানসিক সূত্র এখানেই। এই অশান্ত সমুদ্রতীরে অশান্ত কবি হয়তো সমুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মহাকাব্যের উৎস খুঁজিয়া পান। তিনি তাঁহার পরবর্তী রচনায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের পটভূমিকা স্থাপন করেন একটি দ্বীপে, যাহার চারিপাশে নিত্য-বীচিভঙ্গে সমুদ্র চির-প্রবহমান।

কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ আসিবার পথটি রামায়ণের দেশ। পঞ্চবটী বন, গোদাবরী কূল, সমস্তই যাত্রাপথে পড়ে। শৈশবে জননীর স্নেহাঞ্চলে কবির মন রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। সেই শৈশবস্মৃতি তীক্ষ্ণধী কবি অন্তরে বহন করিয়াছিলেন। সে স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। মান্দ্রাজপ্রবাসে স্বভাবতই কবি রামায়ণের স্মৃতিচিহ্নিত পথে রামায়ণের কাহিনী আবার কুড়াইয়া পাইলেন। তাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য রামায়ণসঞ্জাত, মহাভারতপুষ্ট নয়।

মধুসূদনের আটবৎসর মান্দ্রাজপ্রবাস অচিহ্নিত। কিন্তু এই-সময়ে তাঁহার কল্পনাপ্রবণ কবিচিত্ত যে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার অমৃতফল আমরা পাইয়াছি। নির্জনে, স্বজনবিহীন সমুদ্র-তীরের প্রবাসে সমুদ্র ও রামায়ণের দেশ তাঁহার অবচেতনে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রেরণা দীর্ঘকাল পরে তাঁহাকে মহাকাব্য-রচয়িতা করিল।

জানি না অন্য কোথাও প্রবাসী হইলে ঠিক এই অনুপ্রেরণা মধু পাইতেন কি না। অতএব তাঁহার মান্দ্রাজযাত্রা ও সেখানে প্রবাস, বিশেষতঃ সমুদ্রকূলের মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা গুরুতর তাৎপর্যপূর্ণ।

মধুসূদনের নূতন কোন জীবনীকার তাঁহার মান্দ্রাজযাত্রাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়া নিঃসন্দেহে আরও গুরুত্ব দিবেন।

মধুসূদন বাছিয়া বাছিয়া মান্দ্রাজ গেলেন কেন? আমরা

দেখিয়াছি চিরকাল মধুসূদনের সমুদ্রে প্রেম। ইংলণ্ড একটি দ্বীপ, সমুদ্রপরিচুম্বিত। মধুসূদন বিদেশী তীরের জন্য নিঃশ্বাস ফেলেন—

"I sigh for Albions distant shore."

যখন ইংলণ্ড হইল না, তখন সমুদ্রপারের মান্দ্রাজে যাওয়া যাক। সমুদ্র চিরদিন মধুর মনে অপরিসীম আকর্ষণের হেতু। তাঁহার সমুদ্রপ্রশস্তি লক্ষণীয়। রাবণ সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের রাজা। উত্তাল জলধির বক্ষে লঙ্কা তাহার রাজত্ব। তাই রাবণকে মধুসূদন ভালবাসেন। রত্নাকর ঐশ্বর্য-বীর্যের প্রতীক, রাবণও তাই। রাজসিক সমুদ্রের স্বর্ণ-লঙ্কাদ্বীপের রাজসিক রাজা রাবণ মধুসূদনের মনোহরণ করিলেন।

কপোতাক্ষ তীরের কবি সমুদ্র পাইলেন। শৈশবে যে জলকে তিনি জন্মভূমির সন্নিকটে পাইয়াছিলেন, সেই জল ছিল তাঁর তীব্র ও গভীর আকর্ষণ।—

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে" ('কপোতাক্ষ নদ')

চতুর্দশপদীর বিভিন্ন কবিতায় মধুসূদনের বারিপ্রীতি দেখা যায়, উপমারূপক মাধ্যমে,

"—বিস্মৃতির জলে
ও তব ধবল মূর্তি স্থদল কমলে ;—* *
এ মানব-দেহ-সরে—" ('শ্রীপঞ্চমী')
"—যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে
ধাতার প্রশংসাগীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; * *
রজতের উপবীত স্রোতরূপে গলে,
······মানসরোবরে
(স্বচ্ছদরপণ !)"— ('পরিচয়')
"ভূতরূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।" ('নূতন বৎসর')

"লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেনচূড় জলরাশি—" ('যশঃ')
"স্রোতঃপথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণকাল, অল্পায়ু পয়োরাশি চলে—" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

পত্নীকে সম্বোধন

"প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মুরতি— * *
সাগরসঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চিরবাস—"

'সমাপ্তে' সনেটে

"বিসর্জিব আজি মাগো, বিস্মৃতির জলে— * *
ডুবিলা সে তরী
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদবলে—"

এইরূপ অন্যান্য বহু রচনায় উপমা-উপমেয়-রূপকের মধ্যে—মধুসূদনের সলিল প্রীতি লক্ষণীয়।

কপোতাক্ষ তীরে শৈশব, খিদিরপুরে গঙ্গা প্রবাহিতা, শিবপুরে গঙ্গার কূলে বিশপস্ কলেজ। সর্বত্রই জলকল্লোল মধুর জীবনে। সমুদ্রযাত্রার জন্য তিনি উন্মাদ, অবশেষে মান্দ্রাজে সমুদ্রসৈকত পাইলেন।

তমলুক হইতে গৌরকে পত্র (অক্টোবর-১৮৪২)—"there is one consolation for me I am nearer that sea"—

মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া বাঁধাঘাট-সুশোভিত সরোবর-তীরে, কিশোরীচাঁদের ১নং দমদম রোডের উদ্যানবাটিকায় সুহৃৎসম্মিলন ('মধুস্মৃতি', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৮২) হইত। কিছুদিন কবি সেখানে ছিলেন।

তারপরে মধুসূদন সমুদ্র-পাড়ি দিলেন। এদেশে ফিরিবার পরেও মধুসূদনের জলের তীরে তীরে বাস মনোমত হইত। চন্দননগরের গঙ্গাতীরে একটি ভিলা ভাড়া করিয়া তথায় "অবকাশ বিনোদন" করিতেন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর একটি রম্য-নিকেতনও কিছুদিন মধুসূদনের বিশ্রামবাস ছিল। ('মধুস্মৃতি', ১৬শ অধ্যায়, পৃঃ ৩১৪)। স্ত্রীর অসুখে—"I took her on the river" (রাজনারায়ণকে পত্র-১৮৬১)। গঙ্গাতীরে বা কোন সায়রের তীরে উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ অবগাহনে নামিতেন। কৃষ্ণনগরে অঞ্জনার কূলে ভ্রমণে আনন্দ—"O ! Anjuna, great is my delight in seeing you" ('মধুস্মৃতি', ১৫শ অধ্যায়, পৃঃ ৩৫৪) ১৮৬৯ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীরবর্তী লাইব্রেরী ভবনে তিনি বাস করিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে জীবনের শেষ কয়েকটি দিন (১৮৭৩ এপ্রিল-মে) দেড় মাস সেই গঙ্গাতীরের বাড়ীতে যাপন করেন নিজে উপযাচক হইয়া ('মধুস্মৃতি', ১৯শ অধ্যায়, পৃঃ ৪০০)। কপোতাক্ষ তীরের শৈশব তাঁহাকে বারিধারার প্রতি অনুরাগী করিয়াছিল অবশ্যই। তাঁহার সমুদ্রগমনের অদম্য-বাসনা ও মান্দ্রাজ গমন মনোনয়ন সকলই একসূত্রে গাঁথা। রেবেকার প্রতি উন্মাদ প্রেম, কাব্যরচনার ('The Captive Ladie')-প্রথম অনুপ্রেরণা মান্দ্রাজের লবণাক্ত সিন্ধু তীরে। বাংলার বিরহ মধুর মনে সাহিত্যিক বিরহ। তিনি যে মান্দ্রাজ বাসকালীন স্ব-আচার ত্যাগ করিয়া 'ট্যাস ফিরিঙ্গি' বনিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে বাংলার প্রতি অপ্রীতি নাই, আছে অনন্যোপায় আত্মসমর্পণ মাত্র।

মান্দ্রাজে মধুসূদন ইংরাজি প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেন।* একমাত্র দৈনিক পত্রিকা 'Spectator'-এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন,

* "I am a poor usher in a poor school viz. 'The Madras Male Orphan Asylum for the children of Europeans and their descendants' in Black Town, Madras."

ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সম্পূর্ণ ভাবে ইংরেজ সাজা ভিন্ন হয়তো তাঁহার উপায়ন্তর ছিল না। মধুর পত্র হইতে আমরা ইহা প্রমাণিত করিতে পারি।

গৌরবাবুকে লেখা পত্র, ১৯শে মার্চ, ১৮৪৯—

"All my pupils are Europeans and East Indians. I dress like them, both on account of my good lady and the situation I hold······I make a passable "Tash Feeringee".

*সাহিত্যিক, বৈবাহিক এবং কর্মজীবনে মধুসূদন তখন ইংরেজ আশ্রয়ী (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে বাঙ্গালী ছিল না বলিলেই হয়)। মধু সেখানে ফিরিঙ্গি সমাজেই গৃহীত হইয়াছিলেন। উপরের পত্র হইতেই বোঝা যায় তিনি অশ্রদ্ধায় নিজেকে 'ট্যাস ফিরিঙ্গি' বলিয়াছেন। বিদেশীয় সমাজ হয়তো তাঁহাকে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্কুল ও কলেজের সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরের দূর হইতে দেখা অন্ধ অনুরাগ মান্দ্রাজের ইংরেজ সমাজে গৃহীত হওয়ার পরে কতটা ছিল, তাহা বিবেচ্য। কিন্তু, সামাজিক কারণে ইংরেজি ভাষায় প্রথম কাব্য লেখা স্বাভাবিক। মাতৃভাষায় চর্চার অভাবে মাতৃভাষায় লেখার ক্ষমতাও কবির ছিল না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিব লেখার বিষয়বস্তু ও মূলসুর। ভাষার গণ্ডী মনকে আবৃত

* বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকায় তিনি রচনা প্রেরণ করিতেন। জীবনীতে দেখি স্থানীয় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের তিনি শিক্ষক ছিলেন। (১৮৫২-১৮৫৬, জানুয়ারি)। মান্দ্রাজে মধু, 'Hindu Chronicle' নামে নিজে একখানা ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করিতেন (১৮৫১)। 'Madras Circulator & General Chronicle', 'Athenaeum' ও 'Spectator', তিনখানি পত্রের সহিত মধু যুক্তছিলেন। তিনি প্রধান সম্পাদকরূপে 'Athenaeum' পত্র কিছুদিন পরিচালনা করেন। ('মধুসূদন দত্ত'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

রাখিতে পারে নাই। যে মধু 'My Fond Blue-eyed Maiden' লিখিয়া ভাবে ও মানসিকতায় নিজেকে সম্পূর্ণ ইংরেজধর্মী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তিনিই প্রথম প্রকাশিত ইংরেজি কাব্য লিখিলেন রাজসূয় যজ্ঞ ও পৃথ্বিরাজ সংযুক্তার উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া। ভাষা প্রকাশের বাহন মাত্র। প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনাসৃজনে মধুসূদন স্বদেশধর্মী। 'The Captive Ladie'-র লেখককে বিজাতীয়তার অপরাধ দেওয়া কোনমতেই চলেনা। মধুসূদনের প্রথম পরিণত জীবন আরম্ভ হইয়াছিল মাতাপিতার স্নেহচ্ছায়া ও সম্পদ ত্যাগ করিবার পরে। তাই পূর্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মধুসূদন খৃষ্টান হইয়াছিলেন।

বিরহ তাঁহাকে লুপ্তপ্রায় স্বদেশপ্রেম ফিরাইয়া দিল। ইংরেজ-মহিলার পাণিগ্রহণ, ধর্মত্যাগ, কর্মজীবন ইত্যাদি তাঁহাকে সুদূরারোহ মহীরূহ ফল পাশ্চাত্য সমাজের কেন্দ্রস্থলে আনিয়া ফেলিল। তাই, আমরা দেশাত্মবোধসম্পন্ন কবিকে পাইলাম। তিনি অবশ্যই দেখিলেন মরীচিকার মায়া নিকটে আসিলে বিলীন হইয়া যায়। বীটনের পত্রোক্ত উপদেশ পাইবার পূর্বেই তাঁহার আত্মচেতনা ফিরিয়া আসে।

১৮৪৮-১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের আটবৎসর ব্যাপী মান্দ্রাজ প্রবাসে মধু লিখিলেন—

"The home of Youth, 't is far, oh far away,—
The hopes of youth, they 've fled & taught to weep,
The friends of youth, e'en they,—oh where are they ?
Ask memory & the dreams which haunt in

('The Captive Ladie'-র মুখবন্ধ)

"As when, Bengala—on the sultry plains" ইত্যাদি পংক্তি পাই 'Visions of the Past' খণ্ড কাব্যে। বীটনের পত্র পাইবার বহুপূর্বেই মধুর মনে এই ভাব ছিল।

বিশপস্ কলেজের পণ্ডিত কুমারস্বামীর নিকট মধু্ সংস্কৃত শিক্ষা করেন পূর্বেই দেখিয়াছি।

"মাতা জাহ্নবী দাসী রামায়ণ মহাভারত ও কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতি বাংলা কাব্য সমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন।···মেধাবী মধু্ আটদশ বৎসর বয়সের সময়ে মাতাকে ও বাড়ীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন।" ('জীবনচরিত'—যোগীন্দ্রনাথ বসু। প্রথম অধ্যায়—বাল্যজীবন)

এই শিক্ষাই মধুসূদনের সমস্ত শিক্ষার মূল। পরমপণ্ডিত, ধর্মত্যাগী, ম্লেচ্ছভাবালম্বী মাইকেলের জীবনের পরম যাহা সঞ্চয়, যাহা তাঁহাকে অমরত্ব আনিয়া দিল, যে কাহিনী মান্দ্রাজের রুক্ষ দিন-পরিধিতে, স্বদেশের রাজকীয় আড়ম্বরে, বিদেশের দূর প্রবাসে বারে বারে তাঁহার আত্মবিস্মৃত জীবনে ঘুমপাড়ানিয়া ছড়ার মত অবচেতন হইতে ভাসিয়া আসিত—তাহা তাঁহার মাতার দান। যে বাঙ্গালী-মেয়ের শিক্ষাদীক্ষার দুর্ভাগ্য হাস্যজনক ভাবে বর্ণনা করিয়া হিন্দু্ কলেজের ছাত্র মধু্ প্রবন্ধপ্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন* সেইরূপ একটি অশিক্ষিতা পল্লী-নারীই অমর মহাকবির কবিত্বের পাথেয় যোগাইয়াছিল কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে। স্কচপত্নী রেবেকা, ফরাসী পত্নী আঁরিয়েৎ তাঁহাকে সেই অনুপ্রেরণা দিতে পারেন নাই। মনের অণুকণায় নিহিত ছিল

* "In India, I may say, in all the oriental countries, women are looked down upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men."

হিন্দু্ কলেজে মধুসূদনের দত্তের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক।

মায়ের শিক্ষা, মাতৃভাষার সঞ্চয়—রামায়ণ ও মহাভারত। যখনই বিধর্মী, ম্লেচ্ছবেশী, ইংরেজনারীর স্বামী, ব্যারিষ্টার মাইকেল লেখনী ধারণ করিলেন, তখনই পাইলাম প্রাচীন ভারতবর্ষের সমগ্র পুরাণ কাহিনী। বিদেশী ভাষার গুণ্ঠনে ম্লাননয়না, তবু সে ভারতীয়া, কখনও বিদেশে নীতা, তবু সে বাঙ্গালী, পানপাত্রের সম্মুখে আহূতা, তবু সে হিন্দু। এই দৃষ্টি দ্বারা বিচার করিলে মধুসূদনের মত জাতীয়তার বাহক বাঙ্গালী সাহিত্যিক আর নাই।*

সত্যই বিস্মিত হই, যে কোন ভাবে, যে কোন ভাষায় রচনা হোক না কেন, যেখান হইতেই উৎস বা অনুস্মৃতি আসুক না কেন, মধুর রচনার প্রত্যেকটি উপমা ও প্রত্যেকটি রচনার পটভূমিকা সর্বতঃ ভারতীয়। পুরাণের উদাহরণে আচ্ছন্ন তাঁহার কাব্য। কোন কোন সময়ে পৌরাণিক উপমার অতি বাহুল্যে আধুনিক মন পীড়িত হইয়া ওঠে, স্বীকার করি। একটি ছত্রও তিনি লেখেন নাই, যাহা বিজাতীয়। বাংলার আধুনিক লেখকের মত নিজের দেশে বসিয়া সাগরপারের রূপক ও উপমা ধার করিবার প্রয়াস তিনি কখনও করেন নাই। বরঞ্চ সাগরপারে বসিয়াও স্বদেশের বিরহে তিনি স্বদেশীভাব ও ভাষায় সনেটগুচ্ছ রচনা করিয়াছেন।†

* 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "Anglicised Michael was in his heart of hearts, however, a pucca Indian. The patriotism of Michael was no mere lip patriotism. His Anglicism was only the outer husk, the heart within overflowed with love for his country." ('মধুস্মৃতি,' উপসংহার, পৃঃ ৪৪৮)

† "'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে একটি লক্ষণীয় বিষয় মধুসূদনের অপূর্ব দেশপ্রেম। ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভালবাসা এই সনেট কয়টিতে ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। এই প্রেমের তুলনা বাংলাসাহিত্যেও দুর্লভ।"

('চতুর্দশপদী কবিতাবলী'—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকা)

প্রকৃতির শোভা বৈচিত্র্য মধুর কাছে "দ্রৌপদীর শাড়ী", পরেশনাথ পাহাড় "তপোমগ্ন ব্যোমকেশ", ময়ূরের "রাখাল রাজার মত চূড়াখানি কেশে।" এমন কি, "রেখ মা দাসেরে মনে" শীর্ষক বিদায়ের কবিতাটিতে কবি যখন স্মৃতিজলে তামরসের মত ফুটিতে চাহিয়াছেন তখনও উপমা আসিয়াছে কৈলাস শিখরের মানস হ্রদের পদ্ম হইতে, যথা -

"ফুটি যেন স্মৃতিজলে মানসে মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে।"

ছোট গীতিকবিতার সামান্য উল্লেখ করিতেছি। 'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমা', 'বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি কাব্যের আখ্যানবস্তু, রূপক উপমা, উদাহরণ সব কিছু স্বদেশীয়।

আঙ্গিক বা সাময়িক দৃষ্টিভঙ্গি ধরিয়া কবিকে বিচার সমীচীন নয়—জীবনদর্শন ও কাব্যের মূলসুর বিচার যথার্থ বিচার। সংক্ষেপে মোহিতলাল মজুমদারের উক্তি উল্লেখ করা যাক :—

"বাঙ্গালী গৃহসংসারের সেই পুণ্যদীপ্তি মধুর হৃদয়ে তাঁহার মায়ের সেই স্নেহ ব্যাকুলতার স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম হইতে রক্ষা করিল। নারীর চিরন্তন রূপ মাতা ও বধুর বেশে বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মী···। এই

"সপ্তসিন্ধুপারে বসি
ভোলে নাই গ্রামনভে উদিল যে শশী।" 'দীপায়ন'

(মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয়, কার্তিক, ১৩৬০)

"তিনি ছন্দের প্রণালী বিদেশ থেকে নিলেন বটে, কিন্তু কাব্যের গুণবাদ সম্পূর্ণ দেশের বিষয়বস্তু ও ভাব থেকে গ্রহণ করলেন পরিবেশনের জন্য। তাঁকে চিনতে বেশ সময় লেগেছিল।"—অসিতকুমার হালদার।

'বাংলা ছন্দের মুক্তি', (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৫৮)।

"কাছ থেকে দেখার ফল আন্তরিক অনুকম্পা, দূর থেকে দেখার ফল বুদ্ধিসম্মত বিচার ও নিরাসক্ত বিশ্লেষণ।—ভরসেলসে বসে তিনি ওই সনেটটি না লিখলে বঙ্গসাহিত্যে দূর থেকে দেখা কপোতাক্ষের কলধ্বনি অশ্রুত থাকতো।" —রঞ্জন

'কবতক্ষ', (শারদীয় 'জনসেবক' ১৩৬১)

কাব্যের স্বর্গ, নরক, পৃথিবী ও সমুদ্রতল ব্যাপী আয়োজন, রাজসভার ঐশ্বর্য, রণসজ্জার আড়ম্বর সমস্তর ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গলার কুললক্ষ্মী, বাঙ্গালীর অনুভূতি।" ('আধুনিক বাংলাসাহিত্য', পৃঃ ৪৫)

প্রমথ চৌধুরীর অনুরণনে বহু একদেশদর্শী সমালোচককে আমরা বলিতে শুনিয়াছি মেঘনাদবধ অর্কিডের ফুল। রামায়ণ হইতে গৃহীত আখ্যান, বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক ভাষা, স্বাদেশিক পুরাণ, পৌরাণিক উপমা ভারাক্রান্ত মহাকাব্য কি করিয়া যে অর্কিডের ফুল হইতে পারে তাহা আমাদের মস্তিষ্কে আসেনা। তবে ঠাকুরবাড়ীর আপত্তি জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের মাধ্যমে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ্য অভিযোগের রূপে জানা যায়ঃ—

"রাম লক্ষ্মণের চরিত্র বাংলার প্রাণের সামগ্রী। কোন স্পর্ধায় মধুসূদন তাঁহাদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিকৃত করিয়া আঁকিতে পারেন? তাহা তাঁহার অধিকারের বাহিরে।"

কবির কল্পনাশক্তি অদেখা বস্তুর ইচ্ছামত রূপায়ন করে। কবির স্বাধীনতা অর্থাৎ পোয়েটিক্ লাইসেন্স বিখ্যাত। মধু রাবণ চরিত্র ঐশ্বর্যশালী করিয়া রাম লক্ষ্মণের চরিত্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল করিয়াছেন বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রের অভিযোগ। মধু রাম বা রাবণের সহিত ঘর করেন নাই, তাঁহারা কাল্পনিক। স্বর্ণলঙ্কার প্রবলপ্রতাপ রাবণকে রাজসিক ও বনবাসী ফলাহারী রামচন্দ্রকে সাত্ত্বিক করা স্বাভাবিক। কবি নিজের রসে সৃষ্ট চরিত্র রাঙাইতে পারেন ('ধর্ম' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথকে পতিতা অহল্যার প্রতি করুণায় মুখর হইতে দেখি ('অহল্যা' কবিতা) 'চিত্রাঙ্গদায়' ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয় বীর অর্জুনের শস্ত্রসাধনা ও যুদ্ধসমাকুল জীবনের গান শুনিঃ—

"কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশ কুসুম চয়নে,
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে।"

আমরা এক্ষেত্রে মনে করি পুরাতন ঐতিহ্য ত্যাগ করিয়া কবি অন্যায় করিতেছেন না। কারণ, কবি আমাদের অপেক্ষা ভাল বোঝেন। সুতরাং মধুসূদনের বিরুদ্ধে সমালোচনার বিপক্ষ যুক্তি আছে।

মধুসূদনের ইংরেজি শিক্ষাও তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে স্বাদেশিক করিয়াছে। স্বদেশপ্রিয়তা ইংলণ্ডের ভাব বস্তু।*

মধু ভাবিতেন ইংরেজ জাতি শিক্ষিত, ভারতবাসী অশিক্ষিত। পরাধীনতার গ্লানি অসহ্য। বাড়ীর শাসন তাঁহাকে অসহিষ্ণু করে, তিনি স্বাধীনতার স্বাদ চান, তিনি লেখেন—

"For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells & heaven-born liberty
Makes even the lowest happy"—

('Literary Gleaner', 1842)

---

* "বঙ্কিম—ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী···যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটি কথা আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু জানিত না।"

('বিপ্লবী বাংলা'—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, পৃঃ ৪৯)

"ভারতীয় সংস্কৃতিজ্ঞ সিলভ্যাঁ লেভি—'ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ সুগম করে ইংরেজ যে ভুল করেছেন, ফরাসীরা যেন তাঁদের অধিকৃত দেশে সে রকম ভুল না করেন'।" ('বিপ্লবী বাংলা', পৃঃ ৫০)

ইংরেজি আমলের প্রথম হইতে অর্থাৎ হিন্দু কলেজ স্থাপনার পূর্বে "সেকালের" বহু নিন্দাবাদ করিয়া রাজনারায়ণ বসু "একালের" অর্থাৎ হিন্দু কলেজ স্থাপনার পরের কথায় বলেন যে স্বাদেশিকতায় কিন্তু একালের নব্য বাবুরা উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। সেকালের লোকের স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবোধ ছিল না, একালে আছে।

(সেকাল ও একাল)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ—

কিন্তু বহুদিন পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিলাতযাত্রার পূর্বে এই মধু রাজনারায়ণ বসুকে পত্রে লেখেন—

"Far away—Far away
From the land he love'd so well"—

বিদায়ের পূর্বে লেখা (৯ই জুন, ১৮৬২) পত্রের কবিতা 'বঙ্গভূমির প্রতি'—

"রেখ মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে" কবিতাটির মধ্যে জন্মভূমির প্রতি জীবন্ত অনুরাগ দেখা যায়। মধু নিজের দেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেশপ্রেমিক।

ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর মনে জাতীয়তাবোধের জাগরণ হয়। ইতিপূর্বে আমরা ইংরেজ প্রীতির মধ্যে মধুর বিদ্রোহ দেখিয়াছি। নীলদর্পণের অনুবাদকার্যের মধ্যেও স্বাদেশিক বিদ্রোহ। ইংরেজি শিক্ষা হেতু বাংলাদেশে মধুর দান অপরিসীম হইয়াছিল নিঃসন্দেহে। মধুর জন্মার্জিত সংস্কার তাঁহার অন্তর্জীবনে দৃঢ়মূল ছিল। গৌরদাস বসাকের অনুরোধে তিনি প্রথম জীবনে যে দুই একটি অসংস্কৃত বাংলাভাষায় কবিতা লেখেন তাহার মধ্যে "দানবাদি দেবযক্ষ", "মদন রাজা" প্রভৃতি শব্দে যে সুর-যোজনা দেখি, উত্তরকালে তাহাই তাঁহার সাধনামার্গ হইয়াছিল। ('বর্ষাকাল' ও 'হিমঋতু' কবিতা দ্রষ্টব্য—মধুসূদন)

মান্দ্রাজে ছাত্রের মত তিনি বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন এবং রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করেন স্বদেশের কবি হইবার জন্য। মেঘনাদবধ কাব্য প্রমুখ মধুসূদনের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে সমগ্র বাংলাসাহিত্য ও ভারতীয় সভ্যতার আদি কাহিনী পাঠ করা হয়। এমন মনে প্রাণে হিন্দুপুরাণকার এমন অন্তরে ভারতীয় কবি বিরল।

চরিত্র

মধুসূদনের জীবনে সর্বাপেক্ষা জটিল অংশ এখানে। ইতিপূর্বে আলোচিত 'পটভূমিকা' ও 'বিদ্রোহ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা তাঁহার চরিত্রের কিঞ্চিৎ সন্ধান পাই। অন্যান্য পরিচ্ছেদেও অল্প-বিস্তর তাঁহার আশ্চর্য চরিত্রের বিষয়ে বলা হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য যে তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে বিজড়িত।

মনোবিৎ বলেন যে, জীবনের প্রথম দশবৎসরের প্রভাব ভবিষ্যৎ জীবনে গুরু প্রভাব রাখে। মধুসূদনের জীবনের সেই প্রভাব মাতার ধর্মপুস্তক ও বাংলার মাটি জল। সহজ কবিত্ব, হিন্দুত্ব ও আদর্শবাদ যে মুহূর্তে জীবনের একতারে ঝঙ্কৃত হইল, পর মুহূর্তে পিতার রাজসিকতা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশ্চাত্য প্রভাবরূপ অন্য তার এত উচ্চে ধ্বনিত হইয়া উঠিল যে অবচেতন মনে প্রথম সুর নিঃশেষ বিলয় লাভ করে। কিন্তু বার তের বৎসর পর্যন্ত প্রথম সুর জীবনের রূপ দিল। তারপরে মধুসূদন কলিকাতায় আসেন।

বাল্য হইতে মধুসূদন অত্যধিক আদরে মানুষ হইয়াছিলেন। ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যশালী দত্ত বংশের সর্ব কনিষ্ঠ রাজনারায়ণের একমাত্র পুত্র সন্তানের পক্ষে যে অপরিমিত আদর ও বিলাসিতা প্রাপ্য মধু তাহার শেষ বিন্দু নিঙরাইয়া গ্রহণ করেন। মাতা জাহ্নবীদেবী দুইটি সন্তানের অকাল মৃত্যুর পরে মধুকে পাইয়া অতি স্নেহে তাঁহাকে লালন করিতেন। জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন "যেরূপ আদরে ও গৌরবে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজ-পুত্রগণের বোধহয়, সেরূপ হয়না।" (পৃঃ ৮)।

শিশু জন্মকালীন বংশাবলীর প্রভাব পায়, কথিত আছে। মধুসূদন পিতৃপুরুষের নিকট হইতে ব্যয়শীলতা, দান, বিদ্যা ও

কবিত্বশক্তি লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাধামোহন বংশে সৌভাগ্যের সূচনা করেন স্বীয় পারসীভাষায় বুৎপত্তি দ্বারা, ('জীবন-চরিত' পৃঃ ৩, যোগীন্দ্র বসু)। রাধামোহনের বিদেশী ভাষায় দক্ষতা লক্ষণীয়। পিতা রাজনারায়ণ তো পারস্যভাষায় দক্ষতার জন্য 'মুন্সী' অভিহিত হইতেন। বিদেশী ভাষায় মধুর দক্ষতার উৎস ওখানেই।

মধুসূদনের খুল্লপিতামহ মাণিকরাম দত্ত কবি ছিলেন ও পারস্য-ভাষায় অতি সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। মাণিকরাম মুসলমান প্রভুকন্যার মনোহরণ করেন কাব্যের দ্বারা,—('জীবনচরিত', পৃঃ ৫) কিন্তু ধর্মবন্ধন হেতু প্রভুকন্যার প্রেমের প্রতিদান দিতে পারেন নাই। ফলে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মনঃসমীক্ষণের চোখে ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। বিদেশীভাষায় কাব্যের দ্বারা মধুও ম্লেচ্ছতরুণীর মনোহরণ করিয়াছিলেন। মাণিক-রামের অতৃপ্ত আত্মাই হয়তো যুগান্তরের পারে তরুণ বংশধরের রক্তে অশান্তি উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল। নিষিদ্ধ প্রেমের পথে পদক্ষেপের সাহস দিয়াছিল। বংশধারার প্রভাব অস্বীকার্য নয়।

ধর্ম ও সংস্কার বশে মাণিকরাম প্রেমকে গ্রহণ করেন নাই। সেই বঞ্চিত প্রেমের অভিশাপে তাঁহার বংশধর হয়তো ধর্মত্যাগ করিলেন। তিনি প্রেমকে স্বীকার করিলেন, তবু সুখ তাঁহার হইল না। এক বংশের দুই কবিই প্রেমের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। মাণিকরাম সংসার, মধুসূদন সমাজ।

মধুসূদন পিতার নিকট হইতে বিলাসিতা, ভোগস্পৃহা ও অমিত-ব্যয় শিক্ষা করেন। প্রতিভার পিতা মহাপুরুষ না হইলে বিস্ময় নাই। বিভিন্ন জীবনচরিত্র ও আখ্যায়িকায় মধুর পিতার যে মূর্তি পাইয়াছি, তাহা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। অত্যন্ত আত্মসুখপরায়ণ, দাম্ভিক ও নির্মম প্রকৃতির রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রকে ভালবাসার মধ্যে নিজেকেই আবার ভালবাসিতেন। আমাদের মতে মধুসূদনের জীবনে ব্যর্থতার জন্য প্রথম ভাগে দায়ী তাঁহার পিতা। বাংলার

জগাখিচুড়ি সংস্কৃতিসঙ্কটে মধুসূদন দত্তও এক জগাখিচুড়ি পারিবারিক মণ্ডলে মানুষ হইয়াছিলেন। যে পিতা পুত্রকে স্বপীত শটকার নল অনায়াসে বন্ধুদিগের সম্মুখে দিতেছেন, তিনিই আবার জোর করিয়া অশিক্ষিতা নাবালিকার সহিত তাহার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। অথচ মধুসূদনের অন্য কোন উচ্ছৃঙ্খলতায় তাঁহার আপত্তি নাই এবং তরুণ পুত্রকে অগাধ স্বাধীনতা তিনি দিতে দ্বিধা করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় কোনরূপ বিলাসিতা ও ভোগে বারণ নাই, কোনরূপ শাসন নাই।

"This over-indulgence of his father was the rock on which was wrecked his domestic peace and happiness" (Reminiscences of Modhusudan Dutta by G. Bysak)

মধুসূদন ছাত্রাবস্থায়ই প্রতিভার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এরূপ পুত্রের জনক হইয়া পিতা গৌরব বোধ করিতেন। পুত্রকে প্রাধান্য দিয়া, ভালবাসিয়া নিজেকেই তিনি ভালবাসিতেন। নিষ্ঠুরতা তাঁহার চরিত্র-ধর্ম ছিল। তিনি তাঁহার পত্নী জাহ্নবীদেবীকে ভালবাসিতেন। আমরা বহু প্রমাণ পাই। কিন্তু পুত্র ধর্মত্যাগী হইলে তিনি আবার পুত্রার্থে পর পর তিনটি রূপবতী তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন জাহ্নবীদেবীর সম্মুখেই। জীবনীকার যোগীন্দ্র বসু ঘটনায় দোষ দেখিতে পান নাই (পৃঃ ৯)। জাহ্নবীদেবী মৌখিক সম্মতি দিয়াছিলেন, সুতরাং জীবনীকারের মতে রাজনারায়ণ দোষমুক্ত। আমরা নগেন্দ্র সোমের প্রামাণিক জীবনচরিত 'মধুস্মৃতি' হইতে জানি (পৃঃ ৪):—

"বংশরক্ষার অভিপ্রায়ে স্বামী যখন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন, তখন শোকে দুঃখে উন্মত্তপ্রায় জাহ্নবীদেবী তাঁহার সঙ্গিনীদিগের নিকটে বলেন, 'আমার এই জীবন্ত পুত্রশোকের উপরে তিনি আমাকে যে মনস্তাপ দিলেন, আমার যে অপমান করিলেন,

তাহাতে আর কি বলিব, আমি যদি সতী হই, ওঁর উপরে যদি আমার অটল ভক্তি থাকে, তবে আমা হইতে সন্তানের মুখ যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই যেন শেষ হয়, আর যেন অন্যা স্ত্রী হইতে সন্তানের মুখ না দেখেন।' ” অভিসম্পাত ফলে কি না জানি না, কিন্তু তিনটি বিবাহও রাজনারায়ণকে সন্তান দিতে পারে নাই। 'মধুস্মৃতি'তে পাই শ্রীমতী মানকুমারী দেবী লিখিয়াছেন, “জাহ্নবীদেবী বংশরক্ষার্থ গুরুপুরোহিত এবং পৌরজনের অনুরোধে স্বামীকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার স্বামী বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি মনে মনে একটি আঘাত প্রাপ্ত হন।”* ('ভারতবর্ষ' পত্রিকায় —১৩২২ সনের—চৈত্র মাসে এই অংশ আছে। পুস্তকে সংকলিত হইবার পূর্বে 'মধুস্মৃতি' প্রথম 'ভারতবর্ষে' মুদ্রিত হয়। তখন মানকুমারী দেবী পত্রোত্তরে এসকল তথ্য জানাইয়াছিলেন। 'মধুস্মৃতি'তে অনেক অংশ পরিত্যক্ত হয় পরে।)

রাজনারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী সাতবেড়িয়া গ্রামের শিবসুন্দরী “অত্যুত্তমা সুন্দরী” ছিলেন, কিন্তু অচিরাৎ মৃত হন ('মধুস্মৃতি')।

---

* রাজনারায়ণ দত্তের তিনবার বিবাহ এ পর্যন্ত পুরুষ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। মহিলা সমালোচকের কাছে এই কাজ অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে হয়। বংশরক্ষা অজুহাত মাত্র। কারণ, প্রাচীন যুগে রাজা মহারাজ প্রভৃতিরাও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া বংশরক্ষা করিতেন। একাধিক বিবাহের নিষ্ঠুরতা অনেকেরই ছিল না। সেকালে পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রথা বহু প্রচলিত ছিল। পুত্র বিচ্ছেদাহতা প্রৌঢ়াগৃহিণী পত্নীর সম্মুখে তাঁহাকে মর্মব্যথা দিবার মত কাজ না করিয়া তিনি অনায়াসে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন। দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ভাবে কতকগুলি কন্যাস্থানীয়া তরুণীর সর্বনাশ না করিয়া গেলে ইতিকথায় তাঁহার নাম আমরা আর একটু শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিতে পারিতাম। বিবাহের পর নিজের দোষ-মুক্তির জন্য পত্নীকে লেখা রাজনারায়ণের পত্র ন্যাকামীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ যথা, “তোমার জন্য যে একটি সেবিকা আনা হইয়াছে”—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুতরাং বংশরক্ষা না হওয়াতে দত্ত মহাশয় বারাসত মহকুমার প্রসন্নময়ী দাসীকে পুনর্বার বিবাহ করিয়াও সন্তান লাভে অসমর্থ হন।

"অধীর চিত্তে" তিনি যশোহর জেলার "অনিন্দ্যসুন্দরী" হরকামিনী দাসীকে তৃতীয়বার বিবাহ করেন। তৃতীয় সপত্নীকে বরণ করিবার অল্পদিন পরে "ভগ্নহৃদয়া" জাহ্নবী দাসী প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতার কৃতকর্মের ফলে তরুণী, সুন্দরী হরকামিনীর অকাল বৈধব্য মধুকে ব্যথিত করে* ('মধুস্মৃতি,' ১ম অধ্যায়, পৃঃ ৫)। রাজনারায়ণ, বলা বাহুল্য বিধবা দুইটির ভরণপোষণের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করিয়া যান নাই।

কোন শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি যে কোন যুগেই হোক এইরকম কাজ করিলে তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্ক বলা ভিন্ন কোন মতেই ক্ষমা করা যায় না। স্ত্রীকে ভালবাসাও তাঁহার পুত্রকে ভালবাসার মতই নিজেকে ভালবাসা। স্ত্রীকে ভালবাসিলে তিনি তাঁহার এত বড় অসম্মান করিতে পারিতেন না। কোন অবস্থাতেই না।

খুলনা জেলায় কাটপাড়ার অতি ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তিশালী জমিদারের দুহিতা ~~(কাটপাড়া)~~ গুণবতী জাহ্নবীর মূল্য আরোপ করিবার পক্ষে তাঁহার বংশমর্যাদা অনুকূলে। কিন্তু ভোগসুখ ও আত্মতৃপ্তি পত্নীপ্রেমের অপেক্ষা রাজনারায়ণের জীবনে অধিকতর শক্তিধর। লক্ষণীয় এই যে, পত্নীগুলি আবার পরমাসুন্দরী ছিলেন। বংশরক্ষার ন্যায় নীরস ধর্মকর্মে অবশ্যই রূপের প্রয়োজন হয় না। কালো কুশ্রী অরক্ষণীয়াকে বিবাহরূপ পুণ্যকর্মের সহিত বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করা চলিত।

* "The sight of his unprotected, lone stepmother, who in the full bloom of her youth, beauty, was withering in the scorching blast of perpetual widowhood deeply saddened his heart."

Reminiscences of Michael M. S. Dutta
by Babu Gour Das Bysak.

মধুকে পিতা ভালবাসিতেন—"রাজনারায়ণস্ সন্" হিসাবেই। মধুও এই হিপনোটিসমের বশে বারবার নিজেকে রাজনায়ণস্ সন্ বলিয়াছেন। আপোষমূলক মনোবৃত্তি পরিচালিত রাজনারায়ণ পুত্রকে নিজের মত করিয়া গড়িতে চাহিলেন কোন জমিদারের লাবণ্যময়ী বালিকা কন্যার হস্তে সমর্পণ করিয়া। হয়তো পুত্রের বিষয়ে কোন জনশ্রুতি তাঁহাকে ভীত করিয়াছিল। কিন্তু চরম স্বাধীনতায় বর্ধিত বিংশবৎসরের অতিনব্য, ইংরেজিনবীশ, কবি পুত্রের যে মন বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে, সে হিসাব মুন্সী রাজনারায়ণের খাতায় লেখা হয় নাই। অতি উচ্চাভিলাষী, স্বাধীনমানস, তেজস্বী মধুসূদনের ক্ষেত্রে জোর করা অত্যন্ত ভুল হইয়াছিল। যদি মাতাপিতা পুত্রের সুখের দিকে চাহিয়া ধীরগতি অবলম্বন করিতেন, যদি তাঁহারা পুত্রকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কয়েকটি জীবন বিয়োগান্ত নাও হইতে পারিত। কিন্তু রাজসিকবৃত্তিসম্পন্ন রাজনারায়ণের মতে তাঁহার ইচ্ছাই আদেশ, তিনি ঈশ্বরের মতই নিজের ইচ্ছায় জীবন গড়িবেন। সন্তানকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারা চিন্তা করেন, বিলম্ব করেন। দ্রুত জোর করেন না। বিদ্রোহী মধুসূদনের বিদ্রোহী সত্তা অগত্যা পিতার প্রতি শেষ বিদ্রোহে পিতার সহিত সম্পর্ক ছেদ করিল। মধুসূদনের পারিবারিক জীবনে নীতি বা সংযমশিক্ষার বালাই ছিল না। * রাজনারায়ণ নিজের জীবনের প্রতিফলন পুত্রের জীবনে দেখিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। 'আমার পুত্র' 'আমার সম্পত্তি', এই সম্পত্তিবোধ রাজনারায়ণের জীবনবেদ। সদর দেওয়ানী আদালতের ধনী উকীল রাজনারায়ণ একমাত্র পুত্রের বিলাসিতায়

---

* ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসাবাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল, সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এই জন্যই, সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোনদিন করে নাই।"

নিজের অমিতব্যয় জাহির করিয়া আনন্দ পাইতেন। তাঁহার পুত্র, রাজনারায়ণস্ সন্, সে তো যুবরাজ। তাহার জাঁকজমক রাজনারায়ণের ঐশ্বর্যের বিকাশ। তাহাকে মিতব্যয়ী অথবা স্বাবলম্বী হইবার শিক্ষা যে পিতা দেন নাই, হঠাৎ তাহাকেই ত্যজ্যপুত্র করিয়া কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলা পিতার কর্তব্য নয়। তিনি নিজের মানরক্ষার হেতু টাকা দিয়া পুত্রকে চোখের অন্তরালে পাঠাইবারও বিপক্ষে ছিলেন না। এখানেও রাজনারায়ণের আমিত্ববোধ প্রবল। রাজনারায়ণ পুত্রকে ভালবাসিতেন, কিন্তু সে স্নেহ জাহ্নবী দেবীর মত অনাবিল, নিখাদ ছিল না। মধুসূদন যখন ধর্মত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ছিলেন অপরিণতবয়স্ক, লঘুচিত্ত, ধনীর পুত্র; বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে বৈদেশিক আবহাওয়ায় বর্ধিত। জীবনে প্রাপ্তবয়স্ক তিনি হইতে পারেন নাই। সুতরাং তখন তাঁহার কোন নিজস্বতা ছিল কী? এছাড়া প্রলোভন* তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল। রাজনারায়ণ দত্তের আশাভরসা সমাধিস্থ হইল, মানসম্মান গেল, প্রবল পুত্রস্নেহে আঘাত পড়িল। কিন্তু তবু কি আমরা বলিতে পারি তিনি দোষমুক্ত? আমরা তাঁহার শোকে অশ্রুপাত করিতে পারিব, দুঃখে সমব্যথী হইতে পারিব। কিন্তু, মান্দ্রাজ গমনের পূর্বে যে অভিমানী কিশোর সহসা পিতৃস্নেহ ও পিতৃসাহায্য বঞ্চিত হইয়া লবণাক্ত সমুদ্রতীরে সহায়হীন নিঃসঙ্গ জীবন বড় দুঃখে গ্রহণ করিতে স্থিরসংকল্প হইলেন, তাঁহার দুঃখের কাছে রাজনারায়ণের দুঃখ যে তুচ্ছ হইয়া যায়।

"১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দূর অতীতের এক বিস্মৃত দিবসে গোপনে মধুসূদন বিরাগে তাঁহার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।" 'মধুস্মৃতি' নগেন্দ্রনাথ সোম, (৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৭৯)।

* কাপ্তেন রিচার্ডসনের মন্ত্রশিষ্য মধুসূদন গুরুর আঁকাবাঁকা লেখা পর্যন্ত নকল করিবার চেষ্টা করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। (বাবু বঙ্কুবিহারী দত্তের উক্তি —'জীবনচরিত')

চিঠিপত্রে বা কথাবার্তায় মধুসূদনকে অত্যন্ত প্রাণ-খোলা মানুষ বলিয়া মনে হইলেও তিনি জীবনের গভীর দুঃখগুলি সম্পর্কে নীরবই থাকিতেন। পিতার কঠোরতা, প্রথমা পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ, দেবকীর চিরবিরহ এই সকল বিষয়ে তিনি অল্পবিস্তর নির্বাক। যে আশায় ধর্মত্যাগ, সে আশা পূর্ণ না হইলেও তিনি নীরব ছিলেন। সুতরাং পিতার ব্যবহার যে তাঁহাকে কত আঘাত দিয়াছিল, তাহা তাঁহার পরবর্তী কবিতার বেদনা উৎস হইতে মাত্র সন্ধান পাই।

মধু আট বৎসর (১৮৪৮—৫৬) মান্দ্রাজে নিরুদ্দেশ ছিলেন। বিস্ময় এই যে, এই কালের মধ্যে মধুর সন্ধান রাখিবার ব্যাকুল প্রয়াস করেন তাঁহার পিতা নয়,—মধুর শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ গৌরদাস বসাক। গৌরের চিঠিতে জানা যায় একমাত্র তিনি মধুর কথা চিন্তা করিতেন। ক্রুদ্ধ ও অভিমানী রাজনারায়ণ একের পর এক বিবাহে ব্যস্ত ছিলেন, জলপিণ্ডলোপ হইবার আতঙ্কের কাছে পত্নীপ্রেম ও পুত্রস্নেহ নিষ্ফল হইয়াছিল। মধুকে তিনি অভিমানে ত্যাগ করিতে পারেন, কারণ মধু নিজের সুখ ও জিদ বজায় রাখিতে পিতার মুখের দিকে তাকান নাই। কিন্তু নিরুদ্দেশ পুত্রের সন্ধান না রাখা, অথবা পুত্রের উত্তরাধিকারের পথে কণ্টকরোপন ঠিক প্রবল পিতৃস্নেহ নয়।

কোমলা, করুণহৃদয়া জাহ্নবীর সহিত তুলনায় রাজনারায়ণ বড় নীচে নামিয়া গিয়াছেন। জাহ্নবীর ভালবাসা কোন প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে নাই, কখনও বিকৃত হয় নাই। আমরা রাজনারায়ণের ব্যবহার সমর্থন অথবা দূষন কিছুই করিতে চাই না। তবে সমালোচনার আলোতে তাঁহার স্নেহ খাদশূন্য পিতৃস্নেহ নয়। সেই সন্তানপ্রেম নিস্বার্থ হইবে ঃ—

"তুমি কাছে থাকো নাই থাকো,
মনে করো, মনে করো না,
পিছে পিছে তব চলিবে ছুটিয়া
আমার স্নেহের ঝরণা।"—রবীন্দ্রনাথ

মধু বিধর্মী হইবার পরেও রাজনারায়ণ তাঁহার শিক্ষার ব্যয় বহন করিয়া উদারতার পরিচয় দেন। জাহ্নবীর অনুরোধে রাজনারায়ণ পুত্রের শিক্ষার ব্যয় দিতেন বিশ্‌পস্‌ কলেজে। মাঝে মাঝে পুত্রকে ধর্মান্তরিত করিয়া হিন্দু ধর্মে ফিরাইবার চেষ্টাও চলিত। হয়তো যতদিন আশা ছিল, ততদিন মমতার নমনীয় রূপটাই ছিল। নিজের মানরক্ষা দত্ত মহাশয়ের কাছে জগতের সব কিছুর উর্ধ্বে। পুত্রের ধর্ম অপেক্ষা নিজের মান তাঁহার অধিকতর রক্ষণীয়। বিভিন্ন জীবনী হইতে আমরা পাই 'হরকরা' পত্রের উদ্ধৃতি, (১৮৪৩, ১৩ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা)—

"The Conversion & Baptism of a Hindoo Youth".

…"A thousand rupees in Government security was sent to him, with a request that he should immediately take his passage to England and get baptised there,—that no obloquy might be cast upon his family by his embracing Christianity on the spot. He refused—"

'হরকরা' লিখিয়াছেন মধুর "সম্মানীয় ও ধনী" আত্মীয়েরা এই টাকা পাঠান। এক্ষেত্রে রাজনারায়ণ দত্তের কথাই বোঝা যায়।

মধুসূদন বিশ্‌পস্‌ কলেজে থাকাকালীন উচ্ছৃঙ্খল হ'ন ও পিতার সহিত নানারকম বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। অবশেষে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজনারায়ণ কোন বাদ প্রতিবাদের ফলে পুত্রের অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন :—

…"At length a disagreement with his father arising out of a very trivial matter resulted in the discontinuance of the payment of his necessary charges and put an end to his College career." কিশোরীলাল হালদার

পুত্রকে অবাধ স্বাধীনতা, অতিবিলাস দিয়া জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ

অনুপযুক্ত করিয়াছিলেন পিতা। মদ্যপান ইত্যাদির সমর্থন করিয়া, শেষের দিকে পুত্রের সঙ্গে আচরণ বিলম্বিত শাসনের অজুহাত হইতে পারে, কিন্তু সেই পিতাকে "স্নেহময়" বলা জীবনীকারদিগের উচ্ছ্বাস মাত্র। যে ছেলের পড়া শেষ হয় নাই, যে উপার্জনের শিক্ষা পায় নাই, ধর্মত্যাগের ফলে যে স্বজনবিহীন, তাহাকে রাতারাতি কপর্দকসাহায্যবিহীন করা রাজনারায়ণ দত্তের স্নেহ বা বিবেচনার প্রকৃষ্ট পরিচয় নয়। ক্রুদ্ধ পিতার কঠিন অভিমান বলিয়াও আগাগোড়া সমর্থন করা যায় না। এইসমস্ত লক্ষণ রাজনারায়ণ মুন্সীর নিষ্ঠুরতা।

পিতার নিষ্ঠুরতা সরল কবি মধুর চরিত্রে উত্তরাধিকার সূত্র। মান্দ্রাজে মনোনীতা পত্নী রেবেকা ম্যাকটাভিস্‌কে চার সন্তানসহ পরিত্যাগ, ভাবী মহাকবির চরিত্রের মহত্ত্ব বোঝায় না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পত্নী রেবেকা, দুই পুত্র ও দুই কন্যার সহিত মধুসূদনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অথচ তিনি তাহাদের লইয়া সুখে ছিলেন।* অতি অল্প দিনের মধ্যে মধুসূদন আবার Amelya Henrietta Sophia (এমেলিয়া আঁরিয়েৎ সোফিয়া) নামক ফরাসী নারীকে গ্রহণ করেন। পূর্ব স্ত্রী ও পুত্র কন্যাকে তিনি বিস্মৃত হন। কখনও তাহাদিগকে অর্থ প্রেরণ বা সংবাদ নেওয়া তাঁহার জীবনচরিতের কোথাও দৃষ্ট হয় না।

* "Heigh ho! My stars are brightening—I expect to be a father Soon." গৌরকে পত্র, ৬ই জুলাই—১৮৪৯

"She is a very fine girl".—গৌরকে পত্র, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯

"I have got a fine English wife and four children".

গৌরদাসকে পত্র, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৫৫

"Mrs. D. is of English parentage. I had great trouble in getting her, however, all is well, that ends well".

গৌরদাসকে পত্র, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯

রেবেকা পুনর্বার বিবাহ করেন নাই, সুতরাং হয়তো তাঁহার চরিত্রদোষ ঘটে নাই। তবে কেন বিবাহ বিচ্ছেদ? মধু কি আঁরিয়েৎকে দেখিয়া প্রেমে পাগল হইয়া রেবেকাকে ত্যাগ করেন সাত বৎসরের দাম্পত্য জীবন অন্তে? মধুসূদনের যশ ও প্রতিভাদীপ্ত মহাকাব্য রচনার সময়ে গীতিকবিতা একটি পাওয়া যায় (১৮৬১)। সেই সময় পূর্বস্মৃতি আহ্বান ভিন্ন অন্য কোন প্রেরণা কবিতায় চিহ্নিত করা যায় না।

তাহা হইলে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতায় এ খেদ কেন?

"প্রেমের নিগড় করি   পরিলি চরণে সাধে
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক শিখা লোভে তুই কালফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়   ধাইলি অবোধ হায়
না দেখিলি না শুনিলি এবেরে পরাণ কাঁদে।"

বিভিন্ন জীবনীকারদিগের মত হইতে পাওয়া যায় রেবেকার সহিত দীর্ঘ সাত বৎসর বাস করিবার পরে তুই পুত্র, তুই কন্যার জননীকে ত্যাগ করার মধ্যে মধুসূদনের দোষ অধিকতর। বিস্ময়কর নয়।

"মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন কোন শিক্ষকের তুহিতা কুমারী হেনরিয়েটার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এবং এই মহিলাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনযাপন করিয়াছিলেন।..." ('জীবনচরিত', পৃঃ ১৪৯)

"...আশ্রম ধর্ম প্রতিপালন করিয়া সুখী হইতে হইলে যে সহিষ্ণুতার, স্বার্থত্যাগের ও আত্মসংযমের প্রয়োজন মধুসূদনের চরিত্রে তা ছিল না। ('জীবনচরিত', পৃঃ ১৪৮)।

"গ্রহ বৈগুণ্যে বিবাহের সাত বৎসর পরে মনোমালিন্যবশতঃ রেবেকার সহিত মধুসূদনের পত্নী সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।"

('মধুস্মৃতি', ১২শ অধ্যায়, পৃঃ ৩৭)

"মধুসূদনের চিরদুর্ভাগিনী পরিত্যক্তা পত্নী রেবেকা।"

('মধুস্মৃতি', ১২শ অধ্যায়, পৃঃ ২৪০)

"While in Madras he married the daughter of a European Indigo-Planter, but the marriage was by no means happy"

Michael Madhu Sudan Dutta

—G. Parameswaram Pillai.

মধুসূদন পত্নীত্যাগের অল্প পরেই দ্বিতীয়া রমণী গ্রহণ করিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সময় অল্পতায় অসঙ্গতি দেখিয়াছেন, (মধুসূদন দত্ত, পৃঃ ২৮) কিন্তু, পাত্রী যদি পূর্বেই যোগাড় থাকে তবে মিলনে বাধা কি? বিবাহের সময় হয়তো থাকে না। জীবনীকারদিগের রচনা পাঠান্তে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, মধু আঁরিয়েৎকে ভালবাসেন ও অসুখী বিবাহ স্বয়ং ছিন্ন করেন। তাহা হইলে 'আত্মবিলাপে' খেদ কেন?

দাম্পত্য জীবন ও প্রেম

মধুসূদনের জীবনের উপরোক্ত অংশ সম্পর্কে সকলেই নীরব। আঁরিয়েৎ প্রকৃত সহধর্মিণী ছিলেন। বিদেশিনী নারীর পক্ষে এতটা সহিষ্ণু প্রেম ও আনুগত্য দুর্লভ। মধুসূদন প্রেমে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। প্রচুর বিলাস, অর্থ ও স্বাধীনতার মধ্যে বর্ধিত, আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন তরুণ, সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে উদাসীন ও বিদ্রোহী মধুসূদন। সর্বাপেক্ষা বড় কথা কবির মন, চির প্রেমপিপাসু। বায়রণ তাঁহার আদর্শ। সুতরাং মেধাবী ছাত্র জীবনেও তিনি প্রেমিক ছিলেন।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপসী ও বিদুষী কন্যা

দেবকী কবির মনোহারিণী ছিলেন বলিয়া প্রচলিত মত আছে।* মধুসূদনের প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ ইংরেজিভাষায় লিখিত কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার গভীর প্রেম বোঝা যায়।† কবিতাগুলি অবান্তর বলিয়া মনে হয় না। মনে মনে কবির কোন মানসী ছিলেন। তিনি যে দেবকী নয় তাহাও বলা চলে না। "মেরী" নামে কখনও তিনি মানসীকে আহ্বান করিয়াছেন। জীবনীকার নগেন্দ্র সোম কল্পনা করেন কোন কোন কবিতা সত্যই "মেরী" নামধেয়ার উদ্দেশে রচিত। কিন্তু "মেরীর" অস্তিত্ব কবির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। তিনি ইংরেজ ও লেক কবিদের অনুসরণে চিরন্তনী "মেরীর" বন্দনা করিয়াছিলেন মাত্র। অনূঢ়া কুমারীর নাম কবিতায় লেখা অসম্ভব ছিল। অভিসার-সঙ্কেত-স্পন্দিত কবিতাগুলিও হয়তো কাল্পনিক। কবি তখন পিতৃগৃহে স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস জীবন যাপন করিতেছিলেন

---

* রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে তখন বাস করিতেন ও ক্রাইষ্ট চার্চ এর ধর্মযাজক ছিলেন। দেবকী তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা। বিদ্যা ও জ্ঞানে কৃষ্ণমোহন বরেণ্য ছিলেন। কলিকাতার করদাতাদের পক্ষগ্রহণ পৌরসমিতির বিতর্কে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান। মধুসূদনের ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খৃষ্ট ধর্মগ্রহণে কৃষ্ণমোহনের অতি আগ্রহের জন্য তিনি হিন্দু সমাজে অপ্রিয় হন। মধুর ধর্মান্তরের সময়ে তিনি chosen witness ছিলেন।

† খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলে এই কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে, যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার এরূপ আশা জন্মিয়াছিল।

'জীবনচরিত', যোগীন্দ্র বসু।

"He used always to tell me that he would rather die a Benedict, than wed an illterate, uneducated girl. Educated female was a 'rara avis' in our society, the one solitary exception being in the family of a native Christian clergyman, but his hopes in that quarter if any, were nipped in the bud." Reminiscences of Michael M. S. Dutta by Babu Gour Das Bysak.

রাজকীয় আদরে। বহির্গমন তখনও সম্ভবপর ছিল না। প্রাণের গভীর প্রেমপিপাসার উপযুক্ত মানসী ছিল দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায়।* এই সময়ে প্রেমের অনুপ্রেরণায় মধুসূদনের কবিসত্তা দিব্য জন্ম গ্রহণ করে, আমরা দেখিয়াছি। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মধু খৃষ্টান হন। অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই ইংরেজি ভাষায় ১৮৪১—১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এই কবিত্বশক্তির অবিরল প্রকাশ বন্ধুকে লেখা চিঠিতে ক্লাশের খাতায়, অলস মুহূর্তে। প্রেমের সহিত কবিতা জন্ম নিল, মহাকবি হইবার স্বপ্ন দেখিয়া হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মধু ঘরছাড়া হইলেন।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ে বাড়ীতে মধুর যথেষ্ট যাতায়াত ছিল নগেন্দ্র সোম, যোগীন্দ্র বসু ও মধুর বাল্যসহচরদিগের স্বীকারোক্তি অনুসারে মধু দেবকীকে ভালবাসেন ও প্রথম দিকে কিছু আশা পান। এই সময়ে প্রেমের প্রাবল্যে মধু যে সব ইংরেজি গীতিকবিতা রচনা করিতেন, তাহা বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকায় প্রেরণ করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুদূর বাংলার প্রান্ত হইতে সতের আঠারো বৎসরের 'নেটিভ' কবির রচনা সর্বত্র সমাদৃত হয় নাই। মধুর মনে আকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক যে, বিদেশে ইংরেজি সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে গমন করিয়া চেষ্টা করিলে তবে হয়তো তিনি কবির সম্মান পাইবেন। যে কবিদের অনুসরণে এই সময়ে মধুসূদন বিশেষত্ব-বর্জিত গতানুগতিক প্রেমের কবিতা লিখিতেন, কবিতাগুলি

* রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রূপবতী, বিদুষী দ্বিতীয়া কন্যার সহিত মধুসূদন পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া মধুসূদন তাঁহার পাণিগ্রহণে একান্ত অভিলাষী ছিলেন। উক্ত কুমারীও মধুসূদনের বিবিধ সদ্‌গুণে তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন। এ বিবাহে কন্যার পিতারও আপত্তি ছিল না; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে সুরা-পান ত্যাগ করিতে বলেন। মধুসূদন কিছুতেই পান-দোষ ত্যাগ না করায় এ বিবাহ হয় নাই।" ('মধুস্মৃতি', ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৩৮)

তাঁহাদের অনুকরণ মাত্র হইত। তুলনায় কবি উভয় রচনায় সাদৃশ্য পাইয়া বালবুদ্ধি বশবর্তী হইয়া চিন্তা করিতেন দুই-ই এক। সুতরাং তাহাদের দেশে কোনমতে যাইতে পারিলেই তিনি 'তাহারা' হইবেন নিঃসন্দেহে। ইংলণ্ড গেলে যখন জাতিনাশ অবশ্যম্ভাবী তখন পূর্বেই জাত দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে মনোনীতা পত্নীলাভ হয়, বিদেশগমনের আশা মেটে। অথচ হিন্দু জবরদস্ত পিতার কাছে মনের ইচ্ছা প্রকাশ সম্ভবপর নয়। এই সময়ে মধুসূদন দারুণ frustration ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার জীবনের কোন অবস্থায় তিনি এমন বিজাতীয় ভাবসম্পন্ন আর হ'ন নাই। ইংরেজের সব ভালো দেশের সব মন্দ। এই দেশ তাঁহার প্রতিভার যোগ্য নয়। মনের আদর্শ ইংরেজ। ইংরেজি সাহিত্যই আদর্শ। সেই ভাষায় মহাকবি হওয়া চরম লক্ষ্য। যে ভাষা পরে সযত্নে শিক্ষা করেন এবং সাদর যত্নে মর্যাদা দেন, সেই বাংলা ভাষাকে তিনি ঘৃণায় "language of patois" (K. M. Banerji's Reminiscences)* বলেন এবং ইংরেজনারীর গুণমোহিত হন। গৌরদাস বসাকের Reminiscences হইতে আমরা জানি যে বিদেশগমনের আশা মধু পান ও কৃষ্ণমোহন মধুকে ধর্মান্তরিত করিতে সাহায্য করেন। কৃষ্ণমোহন এইরূপে ঠাকুর বাড়ীর পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রহণে সহায়তা করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন কৃষ্ণমোহনের জামাতা হ'ন। মধুর পানাসক্তি হেতু কৃষ্ণমোহন তাঁহাকে কন্যাদানে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হন না বলিয়া 'মধুস্মৃতি'তে কথিত আছে। যে কোন কারণেই হোক, দেবকীর প্রতি প্রেম মধুর জীবনে সফল হয় নাই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মধুসূদন বিধর্মী হন। তখনও জীবনে ঔজ্জ্বল্য ছিল। পিতা তখনও আশাবাদী, সন্তানের প্রতি সজাগ—

* এই কথার সমর্থন 'মধুস্মৃতি', ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৪৩ ও 'মধুসূদন দত্ত' ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯-এ পাওয়া যায়।

"I am now about to come and live with or rather near to my father :—I am not going to England with Mr. Dealtry—my father won't allow that"—

গৌরকে পত্র।

মধুর সহিত পিতার পুরাতন রীতিনীতি বিষয়ে প্রায় বিতর্ক হইত। ক্রোধী ও জেদী রাজনারায়ণের মনে আহত পিতৃস্নেহ প্রতিশোধ-পরায়ণ ছিল। সুতরাং ধর্মত্যাগের পরেও প্রশ্রয় দিলেও, শেষ পর্যন্ত মধু পিতার সাহায্যবঞ্চিত হইলেন।

দূর হইতে ইংরেজের গুণকীর্তন অনভিজ্ঞ কিশোরের যত প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, নেটিভ ক্রিশ্চান রূপে বিশ্‌পস্ কলেজে লাঞ্ছনার মধ্যে সেই প্রীতি অবশ্যই অদৃশ্য। তিনি তেজস্বী ও আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন। হিন্দু কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ছাত্রের প্রায়ই বিশ্‌পস্ কলেজের সহিত বিবাদ বাধিতে লাগিল। মধুর প্রায়শ্চিত্ত মান্দ্রাজ সিন্ধুকূলে নয়—এখানেই গঙ্গার ধারে বিশ্‌পস্ কলেজের পরিবেষ্টনীর মধ্যে আরম্ভ হইল। দেশী খৃষ্টান ও ইংরেজদের মধ্যে পোষাক, আহার প্রতিটি ক্ষেত্রের পার্থক্য দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হ'ন ও বিদ্রোহ করেন। এই ক্ষোভ কবির মনে নিহিত ছিল। অতএব বহুদিন পরে প্রবাসীর পত্রে আমরা পড়িতে পাই বিদেশে 'নিগার' শব্দ নাই ('বিদ্রোহ' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ধর্মান্তর গ্রহণের পরে যে উচ্ছ্বাস ও আনন্দ মধুর পত্রে ক্ষরিত, doggerel-র লাইনে উৎসারিত* সে আনন্দ ধীরে ধীরে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিলীনপ্রায়। কারণ, মধুসূদন প্রাপ্তবয়স্কের দৃষ্টিতে

* "Come brightest Gour Dass, on a hired Palkee, And see your anxious friend M. S. D."—"I will pay—I will. I have plenty of money" তুলনীয় :—"I was the neediest rascal in Bishop's College." তুলনীয় :—"I am very busy just now"—১৩ই অক্টোবর—"I have n't been able to answer your two very kind letters." (27th January '45). "I am about to dress and

জগতের রূপ দেখিতে শিখিয়াছেন। জগতের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

কবির জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত প্রেম পরিমিশ্রিত থাকে। অন্যান্য আশাভঙ্গের মধ্যে প্রেমের বেদনা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, কোন কোন বিষয়ে মধুসূদন নীরবতাধর্মী ছিলেন। মান্দ্রাজ যাইবার পূর্বে তিনি কাহাকেও জানান নাই* কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই। দারুণ অভিমান তাঁহার চরিত্রে ছিল। পিতার বিরুদ্ধে তিনি নালিশ করেন নাই। ধর্ম গ্রহণের পূর্বে কাহাকেও বলেন নাই। তিনি গোপনে অনেক সময়ে জীবনের গভীর দিকগুলি রাখিতে ভালবাসিতেন অবশ্যই।

প্রেমে বিফল হইলে মধুসূদন অবশ্যই তাহা প্রচার করিবেন না। তারিখ সম্বলিত, আত্মচরিত্রধর্মী কবিতাগুলি এবং জীবনের ঘটনা-

go out to a party", (7th Janu. '46) ধীরে ধীরে মধুসূদন পুরাতন বন্ধুদের আনন্দ হইতে দূরে সরিয়া নাগরিক সহরে জীবনের স্রোতে আত্মসমর্পণ করিতেছিলেন। তাই এত অভাব। তাই কবিতা অন্তর্হিতা হইবার জন্য ব্যগ্র।

"I have written very little poetry ever since my baptism, I am plotting something though. They will appear where do you think-boy-in no less a place than London itself," গৌরকে পত্র। "Oh How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which, I am almost sure I shall be, if I can go to England," গৌরকে পত্র।

* "When I left Calcutta…I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons"—গৌরকে পত্র ১৮ই মার্চ ১৮৪৯—এই রকম, ধর্মত্যাগের পূর্বেও তিনি গোপনতাধর্মী স্বভাবের পরিচয় দেন—"বিস্ময়াপন্ন হইলাম এই জন্য যে মধুর সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, মধু খৃষ্টান হইবে এ সকল কথা ঘুণাক্ষরেও বলে নাই।" (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লিখিত স্মৃতি)।

সমূহ একত্রে গ্রথিত করিয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, ইতিপূর্বে কোন জীবনীকার সেই আলোকপাতে মহাকবিকে দেখেন নাই।

মধুর ধর্মত্যাগ বিদেশগমনের আশায় বা মহাকবি হইবার আশায় শুধু নয়। তিনি কিশোর বালক মাত্র ছিলেন, তিনি অপেক্ষা করিতে পারিতেন। মাতৃভাষায় রচনার পূর্বে দীর্ঘদিনের অপেক্ষা তাঁহার সহ্য হইয়াছিল। কিন্তু, একমাত্র প্রেমজীবনে আঘাত তাঁহাকে এত অধীর করিতে পারে বলিয়া অনুমান*। দেবকী অল্পবয়স্কা থাকা হেতু কেহ বলেন দেবকীর প্রতি মধুর অনুরাগের ভিত্তি কতটা সত্য? কিন্তু সেকালে অতি অপ্রাপ্ত বয়সেই পরিণয় হইত, প্রেম জন্মলাভ করিত। সেকালে বালিকাদের মানসিক পরিণতি বিস্ময়কর ছিল। নজির স্বরূপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্মিণী কাদম্বরী দেবীর উল্লেখ করিতে পারি। অতি কিশোর বয়সে তৎকালে বহু বালিকাই কিশোর বা তরুণের গভীর ও প্রকৃত প্রেমের কেন্দ্র হইয়াছিলেন।

দেবকীর সহিত মধুর প্রেমের আদান-প্রদান আদৌ হইয়াছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু মধুসূদন মনে মনে উক্ত কুমারীর অনুরাগী ছিলেন, এ বিষয়ে সকল জীবনীকার ও সমালোচকবৃন্দ একমত।

যদি প্রেম একতরফা হইয়াই থাকে, তাহা হইলেও উহা কবির চরিত্রে ছায়া ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। মধুর মত রোমান্টিক-প্রেমিক চিত্তের পক্ষে সুরূপা, গুণবতী বালাকে ভালবাসা স্বাভাবিক। তাঁহার রচনায়—জীবনে ক্ষণস্থায়ী হইলেও—এই প্রেমের প্রভাব পড়া আরও স্বাভাবিক। উপযুক্ত প্রতিদান না পাইলে ক্ষতি নাই।

মধুসূদন উপযুক্ত বা অভীষ্ট প্রতিদান পান নাই দেবকীর ক্ষেত্রে

* "মধুসূদন বিবাহ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শেষে খৃস্টধর্ম গ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন।"

('মধুসূদন দত্ত'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে সম্মত আছি। নচেৎ হয়তো তাঁহার পূর্বপুরুষ খুল্লপিতামহ মাণিকরামের মত তিনি সন্ন্যাস আশ্রয় লইতেন। কৃষ্ণমোহন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হাতে কন্যাকে দেন নাই, অতএব খাঁটি ইংরেজ দুহিতাকে বিবাহ করিয়া মধুসূদন যে নেটিভ ক্রিশ্চানকে দেখাইয়া দিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। উল্লেখ্য যে, ধর্মত্যাগের সংকল্প লইয়া মধুসূদন প্রথমে কৃষ্ণমোহনের নিকটেই গিয়াছিলেন।

মধু frustration এর মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত ছিলেন। তারপর, নিষিদ্ধ সমাজের প্রেম তাঁহার জীবনে আসিয়াছে। বিলাসী, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন কবির মনে প্রেমের প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ। বিবাহের পূর্বে কোর্টশিপ তাঁহার ঈপ্সিত ছিল। ("He longed for courtship, though courtship was a myth in Hindu life"—Rem. of G. D. Bysak)

দেবকীর সহিত তাঁহার যোগাযোগ কম হইলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ "Madhu had great faith in love at first sight" (Rem. of G. D. B.)। ইংলণ্ডগমনের আশা তাঁহার ধর্মান্তর গ্রহণের একটি কারণ সত্য। গৌরদাস বসাকও বলেন। কিন্তু হয়তো এত তাড়াতাড়ি মধু হিন্দুধর্ম হইতে পলায়ন করিতেন না। মধু ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় মিশন রো-এর Old Mission Church-এ Arch Deacon Dealtry দ্বারা 'মাইকেল' নামে খৃষ্টান হন। তাহার সামান্য কিছুদিন পূর্বে, বিবাহ স্থির হইবার পরে খিদিরপুরে ২৭শে নভেম্বর, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মধ্যরাত্রে মধু শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ গৌরদাস বসাককে পত্র লেখেন—

"You don't know the weight of my affliction." "I wish (oh ! I really wish) that somebody would hang me. At the expiration of three months from hence I am to be married ;—dreadful thoughts ! It

harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine."

মধুর চিঠির ভাষা হইতে তাঁহার মনের ভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান। বিবাহের কুড়ি বাইশ দিন পূর্বে তিনি ধর্ম ত্যাগ করেন।

মনে হয়, মধুর জীবনে প্রেম ও কাব্যের মিলিত ক্ষেত্রে যখন frustration প্রবল হইয়াছিল, তখন জোর করিয়া অবাঞ্ছিত বিবাহ দেওয়ার চেষ্টাই তাঁহার অবিলম্বে ধর্মত্যাগের কারণ। তিনি বিবাহের পত্র ঠিক হইয়া গেলে মাকে বলেন, "মা, এ কাজ কেন করিলে, আমি তো বিবাহ করিব না।" মাতাপিতার মতে মনোনীতা কন্যা সর্বগুণরূপবতী, অভিজাতা। মধুর জীবনে বোধ হয় প্রথম তাঁহার মাতা জাহ্নবী দাসী পুত্রের মনের কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

"পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তাহার মন ভাল হইবে এই বিবেচনায় তিনি শীঘ্র বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।" ("মানকুমারীর স্মৃতি", জীবনচরিত, পৃঃ ১২০)*

মধু তখন তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্রকে লেখেন—

"বাবা, এক কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ কবিব না। আমি এমন কাজ করিব যে, যেজন্য, বাবাকে চিরকাল দুঃখ করিতে হইবে।" ('জীবনচরিত' পৃঃ ১২১)

সুতরাং মধুসূদন মাতাপিতাকে সম্মত করাইতে পারিলেন না। চিরদিনের খেয়ালী জীবনে তাঁহার বজ্রাঘাত হইল। প্রেমের কুসুম

* মধু মাতাকে বলেন "যতই বল না কেন বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে গুণে কখনই ইংরেজমেয়ের শতাংশের এক অংশ হইতে পারে না।" পুত্রের মতামত ধর্মপ্রাণা জাহ্নবী দাসীকে ভীত করে এবং বিবাহের দিন আরও অগ্রসর করিয়া দেয়। (জীবনচরিত, ১২০ পৃঃ)

ফুটিবে না, পরিণয়ের শৃঙ্খল বন্ধন দিবে। তিনি মনের আদান-প্রদান চান। তাঁর প্রেমের লক্ষ্য মিলিয়াছে ঃ—

"I am like the Earth, revolving
Ever round the selfsame sun—boy,"

('Song'—1842)

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রচিত অসংখ্য প্রেমের কবিতার সুর এই। মানসীর কখনও বিরাগভ্রূকুটি সম্পর্কেও ক্রমাগত উল্লেখ আছে—হয়তো ভবিষ্যতে প্রত্যাখ্যানের আভাস।

"I am not false—nor love thee less,
Tho' thou oft with disdain
Imbiter'st all my happy days,
And leav'st me drowned in pain"

('To'—April, 1841)

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের শেষে রচিত ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রচিত ছোট ছোট কবিতাগুলি বিষাদ এবং বিদায়ব্যথায় ভারাক্রান্ত। কবি যেন অনুভব করিতে পারিয়াছেন যে সকল প্রেমের পরিণতি সুখ নয়।

"How fearful thus to feel alone
with not a heart responsive to mine own !"

('Stanzas'—1845)

এই সুর মান্দ্রাজের প্রথম কবিতাগুলিতে দেখা যায় ঃ—

"And such dark grief is his, whose sleepless soul
Strives but in vain, to burst the galling thrall
Of circumstances"—

('Sonnets'—27th July, 1849)

১৮৪২এর শেষের ও তারপরের ইংরেজি কবিতাগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, কবির কাব্যে প্রেমের একনিষ্ঠতা অন্তর্হিত। লঘু প্রেমের

সুরে নানা মহিলাকে উদ্দেশ করিয়া রচিত প্রেমের কবিতাগুলি মধুসূদনের বহুকামী মানসিকতা ও অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষী। হয়তো দেবকীকে না পাওয়ায় কবির অতৃপ্ত প্রেম আশ্রয় সন্ধানে ব্যগ্র ছিল। তিনি খৃষ্টান, পৈত্রিক গৃহের সজাগ পরিবেশচ্যুত, স্বজনবন্ধুর কাছে সুদূর। পূর্বেই দেখিয়াছি তিনি পার্টি ও নূতন বন্ধু লইয়া ব্যস্ত। পুরাতন বন্ধুদের সহিত তাঁহার যোগসূত্র শিথিল। ফিরিঙ্গিয়ানার নূতন স্বাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে মহিলার সহিত মেলামেশা চলে। কবি ও আধুনিক মধুসূদন ইংরেজিতে কোন মহিলার গান শুনিয়া ('On hearing a Lady sing') কোন মহিলার শুষ্ক ফুল পাইয়া ('On a faded lily given to the author by a lady') এই মহিলাকে ('To a Lady') ওই মহিলাকে ('To another Lady') স্তুতি করিয়া নানা কবিতা রচনা করিয়া প্রমাণ করেন: তাঁহার জীবনে বহু মহিলার আবির্ভাব ঘটিয়াছে; Self-same Sun বা একটি প্রেমপাত্রী আর নাই। দেবকীর প্রেমে ব্যর্থতা জীবনের চঞ্চলতার কারণ বলিলে ক্ষতি কি? মধু অনায়াসে, ভগ্নচিত্তে বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসাইলেন। পিতার কৃপাদত্ত অর্থ তাঁহার জীবনযাত্রার মাশুল যোগাইতে অক্ষম হইল—

("I used to pawn my books"—'মধুস্মৃতি', ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৪৭)

মধু বিশ্‌পস্‌ কলেজে প্রবিষ্ট হইলে সহধ্যায়ী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে সেখানে যাইতেন। বন্ধুর পরিবর্তন তাঁহারও চোখে পড়ে :—

—"কিন্তু পূর্বের ন্যায় সে মুখের ভাব, সে চক্ষুর জ্যোতি কোথায়? মধুর পূর্ব আকারের এখন অনেকটা বিকৃতি ঘটিয়াছে।" (ভূদেববাবুর লিখিত স্মৃতি)

নিজের নৈতিক চরিত্র বিষয়ে মধুসূদন ডকুমেণ্টস্‌ বা দলিল কমই

রাখিয়াছেন। তবে, তাঁহার কথায় পূর্ব যুগের ছবির সূচনা পাওয়া যায় :—

"From an anchorite & monk I am becoming a decided rake"*

('জীবন-চরিত', পৃঃ ৭৪ ও 'মধুস্মৃতি', পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫৭৬)

বিশ্‌পস্‌ কলেজে দেখাশোনার লোক ছিল না, তিনি নিজেই নিজের অভিভাবক। অর্থ প্রচুর আসিতেছে, ইঙ্গসমাজের মোহ ও প্রলোভন আছে। সুতরাং "দুঃখের বিষয় বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতাও সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল।" ('জীবন চরিত', পৃঃ ১৩৬)

মনোনীতাকে না পাওয়ায় ব্যথা, ইংলণ্ড গমনের বাধা, স্বজন স্নেহচ্যুতি কবির মনে অশান্তি, অতৃপ্তি আনে। প্রবল frustration বা ব্যর্থতার বৃদ্ধি হয়। ভাবপ্রবণ প্রেমিক বিস্মরণী গরলের আশ্রয় নিলেন। মধুসূদনের অধঃপতন হয়তো দেবকীর প্রেমে ঘটিত না।

উচ্ছৃঙ্খলতা কবিতারচনার অনুপ্রেরণার মূলে আঘাত দিল। মধু বিশ্‌পস্‌ কলেজের চার বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা কণা দিয়া যান নাই। অসমাপ্ত দীর্ঘ কবিতার ইতস্তত পংক্তি আমরা ক্রমাগত পাই। কবির বিক্ষিপ্ত মানসের চিহ্ন। বিলাত হইতে ফিরিয়া অবসিত হইবার পূর্বে মধুর প্রতিভার এমনি বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা দেখি।

যে নবীন প্রেম মধুসূদনকে স্বতঃ উৎসারিত কবিতায় প্লাবিত করিয়াছিল; তাহার বিদায়ে কবির অশান্ত, অসুখী মন বন্ধনহীন অসংযমের মধ্যে শান্তি ও বিলয় খুঁজিয়াছিল। আবার অনুপ্রেরণার আকাশে মানসহংসকে যে প্রেম আহ্বান করিল সে প্রেম "সাবিত্রী সমা" আঁরিয়েৎ নয়, পরিত্যক্তা রেবেকা।

* এই চিঠিখানি ধর্মান্তর গ্রহণের পূর্বে তমলুক হইতে লিখিত (3rd Kartik, 1249)। মধু বিশ্‌পস্‌ কলেজে পদার্পণ করেন নাই তখনও।

উচ্ছৃঙ্খলতার গান কণ্ঠে নিয়া কবি মান্দ্রাজে গিয়াছিলেন সেখানে অবতরণের পরের লঘু কবিতা ঃ—

"When I was a young 'nd gay recruit
Just landed at Madras ;
I thought to lead a sober life
With a superfine black shining lass
I roved from place to place
untill I found my Mathonia ;
Oh ! what a charming girl she was
with her 'Thannania'"

(২০শে জুলাই, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে* কিশোরীচাঁদকে প্রদত্ত)

* কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতার জুনিয়র পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রিক্তহস্ত মধুসূদন কলিকাতায় আসিয়া ইঁহার অধীনে প্রথমে কেরানী পরে, দোভাষীরূপে কাজ করেন। কিশোরীচাঁদ মধুসূদনকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও কখনও অধীন কর্মচারীর মত দেখিতেন না। পাইকপাড়ার ১নং দমদম রোডে উদ্যানবাটী ছিল কিশোরীচাঁদের। সেখানে মধুসূদন কিছুদিন সম্মানিত অতিথিরূপে বাস করেন। কিশোরীচাঁদের বাগানবাড়ী সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র ছিল, নানাদিক হইতে সেখানে সুহৃৎসম্মেলন হইত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে রমণীয় এই বাগানবাড়ীতে সাহিত্যচর্চা ও বিদ্বজ্জন সমাগমের মধ্যে মধুসূদনের কবিত্বশক্তি পুনর্জীবন লাভ করে ও মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাভাষায় রচনার ইচ্ছা মনে অঙ্কুরিত হয়। মধুসূদন অল্পদিন কেরানীরূপে ছিলেন। অবিলম্বে তিনি সেই কোর্টেরই দ্বিভাষীর, Court Interpretor-এর পদে উন্নীত হন ও লালবাজার পুলিস কোর্টের পূর্বপারে ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের দোতলা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করেন। এখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা রচিত হয়, এবং এখানেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির পূর্ণ বিকাশ। দোকান পশরায় কলঙ্কিত ভগ্নপ্রায় এই বাড়ী এখনও আছে। কখনও সাহিত্যিকবৃন্দ সেখানে মধুসূদন-স্মৃতির তর্পণ করিয়া থাকে।

এই কবিতাই পরে—Timothy Pen-Poem এর 'Captive Ladie' রূপে জন্মগ্রহণ করিল। মহাকবি হইবার প্রাথমিক শপথের জন্য কবিকে আলবিয়ন সাগরপারে যাইতে হইল না। স্বদেশের সমুদ্রতীরে স্কচ্ সুন্দরী রেবেকার বঙ্কিম নয়নের প্রেরণা তাঁহার প্রতিভাকে স্থৈর্য ও রূপ দিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মধু কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ গমন করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি গৌরদাসকে লেখেন—

"Your information with regard to my matrimonial doings is quite correct. Mrs. D. is of English parentage"

মধুর তাঁহাকে বহু কষ্ট করিয়া পাইতে হইয়াছিল, এ কথারও উল্লেখ পত্রে আছে। আর আছে ঃ—

"—though beset by all manner of troubles. I have managed to prepare a volume for the press. This will be my first regular effort as an author"

'ক্যাপটিভ্ লেডি'র জন্ম ইতিহাস।

দ্বিতীয়বার কবির জীবনে কবিতার নূতন জন্মলাভ ঘটিল। যে ভাষারই রচিত হোক, মহাকাব্যের প্রথম সূচনা রেবেকার প্রেমে। মধু উচ্ছৃঙ্খল জীবন বেশীদিন যাপন করেন নাই। একবৎসরের মধ্যে ব্ল্যাকটাউনের মান্দ্রাজ মেল অরফ্যান অ্যাসাইলামে ইংরেজি শিক্ষক মধু সংশ্লিষ্ট বালিকাবিভাগের ছাত্রী রেবেকাকে ভালবাসেন। দেশীয় খৃষ্টানকন্যা দেবকীকে তিনি পান নাই। প্রেমের শুকতারার অস্তগমনে নোঙ্গরছেঁড়া নৌকা নূতন বন্দরে আশ্রয় পাইল।* গৌরদাসকে

* মধুর প্রেমিক সত্তার প্রশংসাজনক পরিস্ফুটন মধুবোস পরিচালিত 'মাইকেল মধুসূদন' শীর্ষক ছায়াচিত্রে দেখা যায়। ছবিটি ডকুমেণ্টারি ছবি, অতএব ঐতিহাসিক তথ্য বজায় রাখিবার চেষ্টা আছে।

লেখা ১৪ই ফেব্রুয়ারীর পত্রখানি গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে মধু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন—

"I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful e."

এই বন্দর বিদেশিনী রেবেকা। নীলকর দুহিতার নীল নয়নের মাদকতা পূর্ব বিফল প্রেমের সমাধিতে নূতন ফুল বিকশিত করিয়া তুলিল। মধুসূদনের বাঞ্ছিত প্রেম, তাঁহার আজন্মের আশা ইংরেজ মহিলার পাণিপাত্রে আশ্রয় পাইল। মুহূর্তের মধ্যে মধু সমস্ত দুঃখ অভাব বিস্মৃত হইলেন। অতি গভীর প্রেমে কবি রেবেকাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—

"Talking of my good lady puts me in mind of the intorduction of the 'Captive' addressed to her."—

"Oh ! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast, her fairy shrine—
Woo'd by melodious worship. Welcome then,
Tho' ours be home of want, I ne'er repine.
Art thou not there, e'en thou—a priceless gem and mine ?

Life hath its dreams to beautify its scene ;
And sun-light for its desert : but there be
Home softer in its store—of brighter sheen—
Than love—than gentle love and thou to me
Art that sweet dream, mine own, in glad reality".

(গৌরকে পত্র, মান্দ্রাজ, ১৯শে মার্চ, ১৮৪৯)

মধুসূদন মহাকবি, কিন্তু তিনি প্রেমিক। প্রথমযুগের ব্যক্তিগত

কবিতাগুলিতে আমরা কবির "প্রেমপিপাসা" পাই। তিনি সৌন্দর্যপ্রিয়, নারী সৌন্দর্য তাঁহার কাব্যের বর্ণনীয় বিশেষ বিষয়। প্রেমপাত্রী দেবকী এবং দুই পত্নী রূপসী ছিলেন। গৌরদাস স্মৃতি কথায় লেখেন—

"He was an ardent admirer of beauty, nor was beauty, less prone to reciprocate his feelings."

বহু সুন্দরী কালো কবির প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছিলেন। ফরাসী দেশেও ফরাসী সুন্দরীর মনোযোগ তিনি পান।* প্রেম ভালবাসায় অভিজ্ঞ মধুসূদনের জীবনে প্রেম একটি প্রধান শক্তি। প্রেম বাদ দিয়া মধুর জীবনের বিচার চলে না।

শিল্পীর সহানুভূতিশীল কোমল মন প্রেমধর্মী। মধুসূদন জাত কবি ও জাত শিল্পী। তাঁহার বন্ধু স্বজন ও জীবনীকারদিগের মতে তিনি 'প্রেমপিপাসু' ছিলেন। ভালবাসা তাঁহার স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি। আমরা শৈশব হইতে তাঁহার এই অদম্য ভালবাসার ইচ্ছা দেখি। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, নারী, প্রত্যেক পাত্রেই তিনি হৃদয় আবেগ লইয়া ধাবমান। মন তাঁহার কাছে বড় বস্তু। গৌরদাস 'স্মৃতিকথায়' লিখিয়াছেন—

"His heart always brimmed with love……repelling to a distance the prosaic and the Callous, who could not appreciate such love."

সুতরাং মধুর জীবন বিচারে প্রেম কাহিনীর গুরুত্ব আরোপ না করিলে তাঁহার অশান্ত জীবনের ব্যর্থতার সম্যক উপলব্ধি হইবে না।

* "You will be pleased to hear that I have been saved the disgrace of a French jail by a young, beautiful and gracious French lady, whose aquaintance I made in a Railway carriage"—

(বিদ্যাসাগরকে পত্র)

ভের্সাই, ফ্রান্স, রুদে শান্তিয়ে, ৯ই জুন, ১৮৬৪।

এই রাজসিক স্বভাবের, বন্ধনবিহীন, প্রবল কবিত্বসম্পন্ন, পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত কবির জীবনে একটি ধ্রুবতারা ছিল কবিতা। দুঃখে কষ্টে, বিপদে অভাবে এই লক্ষ্যভ্রষ্ট তিনি কখনও হন নাই। তাই তাঁহার সাধনা সার্থক হয়। তিনি শিল্পী জীবনে ধন্য।

কিন্তু জীবনশিল্পী মধু হইতে পারেন নাই। তাঁহার শ্রীহীন, বিক্ষিপ্ত দিনযাত্রার চিত্রে কোথাও সৌন্দর্য নাই। তাঁহার পরিণতি মনে বিভীষিকা জাগায়। হয়তো কাব্যশিল্পীর মত তিনি জীবনের শিল্পেও সাধনা লাভ করিতে পারিতেন, যদি তাঁহার শিল্পজীবনের মত লক্ষ্যের ধ্রুবতারা সম্মুখে থাকিত। সে ধ্রুবতারা প্রেম।

আঁরিয়েৎ সাবিত্রী, মধু তাঁহাকে ভালবাসিতেন। রেবেকাকে ত্যাগ করিয়া মধু আঁয়িরেৎকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সারাজীবন তাঁহাকে পত্নীত্বে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, এই ভালবাসার মধ্যে প্রীতি ও স্নেহই কি অধিক ছিল না? এবং স্থায়ী বন্ধনের মধ্যে কতটা মধুর গুণ, কতটা পত্নীর গুণ?

আঁরিয়েৎ রূপবতী, গুণবতী। সেই মহীয়সীকে আমরা শ্রদ্ধা করি, যিনি অনাহারেও স্বামীর প্রতি বিরূপ হন নাই। বিদেশে, স্বদেশে প্রতিক্ষণ ছায়ার মত স্বামীর অনুগামিনী এই নারীর রক্তধারায় ভারতবর্ষীয় স্বামীভক্তির বীজ কি করিয়া প্রোথিত হইল? যুগান্ত-সঞ্চিত তপস্যার বলে এমন সহিষ্ণুতা লাভ করা যায়। বাংলার তথা ভারতের মাটি জল ভিন্ন এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্ম হয় বলিয়া আমরা জানিতাম না।

"মধুসূদনের সূর্যসম প্রচণ্ড তেজবহ্নির নিকট সাধ্বী হেনরিয়েটা ক্ষীণাঙ্গী আইবি (Ivy) লতার ন্যায় ম্রিয়মান ছিলেন। মধুসূদনের অসংযত চিত্তের উচ্ছৃঙ্খল আবেগপ্রপাত তিনি কিছুতেই রোধ বা প্রশমিত করিতে পারেন নাই। মধুসূদনও হেনরিয়েটাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, কিন্তু পুরুষসিংহ রমণীর হস্তচালিত ক্রীড়নক হইবার পাত্র ছিলেন না। ('মধুস্মৃতি', নগেন্দ্রনাথ সোম। ১২শ

অধ্যায়, পৃঃ ২৩) বিভিন্ন ব্যক্তির রচনায় দম্পতীর একই বর্ণনা পাওয়া যায়।

সিংহকে সংযত রাখিবার মত সিংহী মৃদুস্বভাবা আঁরিয়েৎ ছিলেন না। জীবনে মধুসূদনকে সর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আজীবন সহিষ্ণু ভালবাসায় সহ্য করিয়া ছিলেন তিনটি ব্যক্তি, মাতা জাহ্নবী দাসী, বন্ধু গৌরদাস বসাক ও দ্বিতীয়া পত্নী আঁরিয়েৎ। ইঁহাদের ভালবাসায় সমালোচনা ছিল না। মধুর প্রখর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ইঁহাদের সংঘর্ষ বাধে নাই, কারণ ইঁহারা মধু অপেক্ষা অনেক দুর্বল ব্যক্তিত্বশালী। পিতার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মধুর সংঘর্ষ বাধে। কৃষ্ণমোহন ও কন্যা দেবকী তাঁহাকে সহ্য করিতে পারেন নাই। * রেবেকাও পারেন নাই।

প্রধানতঃ দেবকীকে ভালবাসিয়া রোমান্টিক মধু ধর্মত্যাগ করেন। তিনি বহু প্রয়াসে রেবেকাকে লাভ করেন। রূপাকাঙ্ক্ষীযুবকের 'আত্মবিলাপে' বহুবৎসর পরে রেবেকোর উদ্দেশ পাওয়া যায়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রচিত কাব্যে এত হতাশা কেন? তখন মধুর নাম যশ, কর্ম, বিষয়, অনুরাগিনী প্রেয়সী, বন্ধুসুখ, সবই ছিল। কিন্তু, রেবেকাকে তিনি ভুলিতে পারিলে হয়তো তিক্ততার স্বাদ কবিতায় পাইতাম না।

রেবেকার উদ্দেশে মধু যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছেন—'দি ক্যাপটিভ লেডির' মুখপত্রে, সে কবিতার গভীর অনুরাগ স্বীকার্য। রেবেকা আবার তাঁহার জীবনে অনুপ্রেরণা আনিয়াছিলেন। মধুসূদন রেবেকাকে ভালবাসিয়া জীবনকে ভালবাসিলেন। সাংবাদিক মধুর কলমে মান্দ্রাজপ্রবাসে বিনা পরিশ্রমে স্বতঃ অনুপম কাব্যকুসুম

* দেবকী যতই অল্পবয়স্কা হন, হয়তো মধুসূদনের পানাসক্তি সত্ত্বেও গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পিতা দ্বিতীয়বার চিন্তা করিতেন। সেকালে বালিকারা কখনও কখনও বাঞ্ছনীয় পুরুষকে মনে মনে স্বামীরূপে প্রার্থনা করিয়া একনিষ্ঠা থাকিত।

বিকশিত হইল। রেবেকাকে ভালবাসিয়া অনেক প্রয়াসের পরে মধু তাঁহাকে বিবাহ করেন। তখনই 'ক্যাপটিভ লেডির' সৃষ্টি। পরবর্তী জীবনে মহাকাব্যের সুর এখানেই।

এই সময়ে মধুর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। যথা :—

"I send this letter bearing—My bank is just dry."

(মাদ্রাজ, ২৭শে মে, ১৮৪৯)

"I am badly off and have hardly anything in my pocket. My wants are of such a nature as philosophy can not justify."

(ভূদেবকে পত্র, ১৮ই আগস্ট, ১৮৪০)

"—he has scarcely the necessaries of life to bless himself with"

(গৌরকে পত্র, মাদ্রাজ, ৬ই জুলাই, ১৮৪৯)

ইতিপূর্বে 'Home of want' এ তিনি প্রেয়সীকে আহ্বান করিয়া সমস্ত দুঃখ বিস্মরণ হইয়াছেন। পত্রেও অভাববোধে শান্ত স্বীকারোক্তি আছে, পরবর্তী জীবনের পত্রগুলির মত ট্রাজেডির বেদনা নাই। আনন্দের চিহ্নও পাওয়া যায়। সুতরাং, প্রেম তখন তাঁহার জীবনে ছিল। পরবর্তী জীবনে এই উদ্দাম প্রেম শান্ত স্নেহে শান্তস্বভাবা আঁরিয়েৎকে ধরা দিয়াছে।

তবে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ অসুখী হইয়া কেন বিচ্ছেদ আসিল? মধুসূদন প্রথমা পত্নীকে অল্পদিনের মধ্যে বিবাহ করেন। বিস্ময় নাই, ভাবপ্রবণ কবি প্রথম দর্শনে প্রেমে বিশ্বাস করিতেন। মনের আদান প্রদানের অবকাশ হয়তো কমই ছিল। রেবেকা আঁরিয়েৎ নয়, মধুর কার্যের সমালোচনা তিনি করিতেন :—

"My wife is annoyed with me for calling you a 'Heathen rascal.' I know you better then she of course."

(ভূদেবকে পত্র, মাদ্রাজ, ২৭শে মে, ১৮৪৯)

রেবেকার মন একতারে বাঁধা ছিল না। মধুর রহস্য ও হাস্যরস তিনি অনুধাবন করিতেন না। জীবনের পটভূমিকায় সেবাপরায়ণা ছায়া রেবেকা ছিলেন না, তিনি প্রখর রূপে আবির্ভূতা। প্রত্যেকটি চিঠিপত্রে তাঁহার উল্লেখ, মধুসূদন তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে তৎপর :—

"I dress both on account of my good lady and the situation" (গৌরকে পত্র, মান্দ্রাজ, ১৯শে মার্চ, ১৮৪৯)

প্রীতির সহিত বারম্বার মধু উল্লেখ করিয়াছেন 'fine girl'. রেবেকাকে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে কবিতার উদ্ধৃতি, বন্ধুদের লেখা পত্রও রেবেকার অজানা নয়, বন্ধুদের চিঠি তাঁহার হাতে। তাঁহার রূপ মধুকে পাগল করিয়াছে। অন্য কোন প্রেমের কবিতায় এত আবেগ দেখা দেয় নাই।

মনে হয়, রেবেকা কিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্বশালিনী ছিলেন। দেবকীর প্রতি মধুর মানসিক প্রেমের সঙ্গে এই প্রেমের মিল পাওয়া যায়। কবির ভাবচেতনায় ভ্রূকুটিপরায়ণা দেবকী, (frowns) বিরক্ত রেবেকা, (annoyed)। মধুর পানাসক্তির সমালোচনায় দেবকী নিশ্চয় বিরূপ, মধুর ব্যবহারের সমালোচনা রেবেকা করেন। দেবকীর জন্য মধু ধর্মত্যাগ-তৎপর, রেবেকার জন্য মধু 'ট্যাশ ফিরিঙ্গি' বনিয়া গিয়াছেন। দেবকীর ধর্মে আস্থাশীল মধু খৃষ্টের উদ্দেশে ধর্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। রেবেকার ধর্মে আস্থাশীল মধু 'খৃষ্টধর্ম' বিষয়ে 'The Visions of the Past' নামে অসম্পূর্ণ খণ্ডকাব্য রচনায় মনোযোগী হইয়াছেন। মধু আর কোন উল্লেখযোগ্য খৃষ্টধর্ম-সম্পর্কীয় কবিতা রচনা করেন নাই।

দেবকীর প্রেমে মধুর কাব্যস্রোত উৎসারিত, রেবেকার প্রেমেও সেই স্বতঃ উচ্ছ্বাস। দেবকী ও রেবেকার প্রেমিক মধু জীবনে তখন উত্থান পতন গ্রাহ্য করেন নাই—চিঠিতে আনন্দের সুর বাজে। মধুর জীবনের দুই পরম বিপত্তির সময়ে দুইটি নারী তাঁহাকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রচ্যুতি হইতে রক্ষা করেন। উত্তরজীবনে কবির জীবনের ভ্রষ্ট তারা

তাঁহারা, কিন্তু একদিন তাঁহারাই ধ্রুবতারা ছিলেন। দেবকী অস্পষ্ট হইলেও অলীক নন।

অতঃপর আঁরিয়েতের স্বামী অন্য লোক। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নিজের দেশে পৈত্রিক বিষয়ের উত্তরাধিকারী, সর্বজনসমাদৃত মধু আর ধর্মত্যাগী কিশোর এবং মান্দ্রাজের 'poor usher' এক ব্যক্তি নয়। মধুর জীবনের পরবর্তী প্রধান কাব্যলোক বন্ধুবান্ধবের উদ্দীপনায় ও প্রেরণায় উদ্ভূত। আঁরিয়েৎ পাশেই ছিলেন, মধুর সঙ্গে তাঁহার মতান্তর হয় নাই, তাঁর প্রেম বিচ্ছেদ জানে নাই। কিন্তু, প্রেরণা তিনি কতটুকু দেন ?

বন্ধুসংসর্গে নিত্য নূতন যশোপ্রাপ্তির পুলকে মধুসূদন অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রতিভা তখন পূর্ণ বিকশিত, প্রেমের প্রেরণা সেখানে নিষ্প্রয়োজন।

তাঁহাকে মান্দ্রাজে রাখিয়া মধু এখানে আসিলেন ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে। তারপর ধীরে সুস্থে বাসা ভাড়া করিয়া প্রায় দুই বছর পরে তাঁহাকে আনেন। তারপরেই দুইটি পুত্রকন্যা সমেত তাঁহাকে রাখিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দেই ইংলণ্ড যান। এধারে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য আঁরিয়েৎ পুত্র কন্যা সঙ্গে স্বামীর কাছে চলিয়া যান আশ্রয়ার্থে। তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছিলেন না। বিদেশিনী স্বাধীনা নারী অথচ স্বামীর টাকাকড়ির বা সংসারের ভার লইবার ক্ষমতা নাই। যে নাবালিকা হিন্দু রমণীর বিদ্রূপে পঞ্চমুখ মধু ইংরেজ ও ফরাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বস্তিলাভ করিয়াছিলেন; সেই ফরাসী মহিলাকে নাবালিকার মত হাস্যকর ভাবে মধুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইয়াছে। পত্তনীদারের দ্বারা বিব্রত আঁরিয়েৎ, ("absolutely fled from Calcutta") দশমাসের মধ্যে, (২রা মে, ১৮৬৩) পড়ুয়া স্বামীর নিকট সহসা বিনা নোটিসে দুইটি শিশু সহ উপস্থিত হইলেন। ফলে কবিকে লেখাপড়া ও লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ব্যয় সংক্ষেপার্থে ফ্রান্সে আসিতে হয়। সেখানেও স্বভাষাভাষীর দেশে

আঁরিয়েৎ 'ম্রিয়মানা আইভি লতা'। উপমাটির জন্য নগেন্দ্র সোমকে ধন্যবাদ। লতার ন্যায় সহকারকে আলিঙ্গন এবং তৎসহ মরণ ভিন্ন কবিপত্নীর কবিকে কোনরকম সহায়তা করিতে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বাঙ্গালীর ঘরেও এমন আইভিলতা সহজে দেখা যায় না।

কবি আবার পত্নীকে সন্তানসহ বিদেশ ফ্রান্সে রাখিয়া কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করিতে চলিয়া আসিলেন। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে ৫ই জানুয়ারী মধু স্বদেশে যাত্রা করিলেন ও ফেব্রুয়ারী মাসে স্পেনসেস্* হোটেলে রাজকীয় জাঁকজমকে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। স্ত্রীপুত্রকে তিনি রাখিয়া আসিবার কারণ বিদ্যাসাগরকে লেখেন যে ঃ—আমি পরিবার সহ কলিকাতায় এখন যাইব না—কারণ আর্থিক অসুবিধা। আমি সামান্যভাবে ঘর লইয়া বাস করিব।

("it is better for me to leave my family here till I am well settled in Callcutta. I hope to hire a few rooms"-

(ফ্রান্স, ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৬৬)

কিন্তু অনেক পূর্বেই আমরা জানি (গৌরকে পত্র—ভের্সাই, বুধবার, ২৬শে অক্টোবর ১৮৬৪) তিনি স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে ওখানেই রাখিবেন—আমি শিক্ষার জন্য পরিবারকে এখানে রাখিয়া যাইব।

("I am going to leave my family behind, in Europe for the education of my children."

হাতে প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফ্রান্সে পরিবারবর্গ রাখিয়া লণ্ডনে পড়িতে আসেন, মিসেস ডি. এর স্বাস্থ্যের জন্য শুধু নয়। পত্নী ও সন্তানের বন্ধন তাঁহার সব সময় রুচিকর হইত না।

* Spences Hotel গবর্নমেণ্ট হাউসের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, অতি সম্ভ্রান্ত হোটেল ছিল।

বিদ্যাসাগর বিদেশী শিক্ষার মূল্য দেন না। বিদ্যাসাগরকে সন্তুষ্ট রাখা মধুর ঈপ্সিত, বিদ্যাসাগরের সহানুভূতি তাঁহার বাঁচিবার উপায়* বন্ধু গৌরকে তিনি আশ্রয়যোগ্য মনে করেন নাই, নির্ভর করেন নাই, তবু বন্ধুকে মধু সত্য বলেন। বিদ্যাসাগরকে স্ত্রীপুত্রের বিষয়ে সত্য কথা মধু লেখেন নাই, প্রমাণ বিদ্যাসাগর চিঠির কথামত† বাড়ী ভাড়ার পরে সাজাইয়া রাখা সত্ত্বেও মধু কর্ণপাত না করিয়া Spences Hotel-এ ওঠেন। একা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনখানি ঘরের স্যুইট লইয়া বাসের সময়ে স্ত্রীপুত্রকন্যার কথা মধুর মনে ছিল না। তাহাদের টাকা পাঠাইতে তিনি পারিতেন না। বিদেশে একাকিনী বিরহিনীর চিন্তাও তাঁহাকে অমিত ব্যয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। যথামত টাকা না পাওয়াতে আঁরিয়েৎ সন্তানসহ ১৮৬৯ এর মে মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। আঁরিয়েতের বসন্ত প্রিয়সঙ্গবিহীন হইলে অসহ্য। লণ্ডন ও কলিকাতায় আঁরিয়েৎ বসন্তকালেই উপস্থিত হন।

বিদ্যাসাগরের পত্রে ও বন্ধুদিগের পত্রে মধু বারবার পারিবারিক গুরুভার ও স্ত্রীপুত্রকন্যার দায়িত্ব অসহন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদনের সন্তানস্নেহ অতিরিক্ত নয়, স্বাভাবিক মাত্র। শর্মিষ্ঠা সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। সন্তানের চিন্তায় বিব্রত হইলে মধুর দিনযাত্রার চিত্রে হয়তো একটু সংযমের রং লাগিত।

মহাকবি পুত্রকন্যাদিগের বিষয়ে একটি কবিতা রাখেন নাই, মৃত্যুশোকে বিচলিত হন নাই। প্রথম চারটি পুত্রকন্যাকে নির্বিকার চিত্তে প্রথমা পত্নীর সহিত ত্যাগ করেন। কখনও তাহাদের জন্য

---

* বিদ্যাসাগর বাণীচিত্রে মধুসূদনকে সাহায্যদান চিত্রিত হইয়াছে। বনফুলের 'বিদ্যাসাগর' নাটিকায়ও এই চিত্র দেখা যায়।

† সুকীয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট বাড়ির বহির্ভাগের দোতলার ঘরগুলি মধুর জন্য বিদ্যাসাগর ইংরেজি ফ্যাসানে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। ('মধুস্মৃতি', ১৬শ অধ্যায়, পৃঃ ৩১৪)

তিনি উন্মনা বোধ করিয়াছেন বলিয়া কোন দলিল নাই। কখনও তিনি তাঁহাদের স্মরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহারাও দত্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া 'ডাটন' নাম গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদনের বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ জানেন না বা স্মৃতি তাঁহাদের যথেষ্ট প্রীতিপ্রদ নয়, তাহা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি। কিন্তু, রক্তের ক্রিয়াও দেখিয়াছি। জাঁকজমক ও বড় হোটেলে একা স্যুইট লইয়া থাকাও আমরা লক্ষ্য করি। পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার অনুশীলন, গুণগ্রাহিতা ইত্যাদিও লক্ষণীয়। সযত্নে রক্ষিত দুই একখানি পত্র দেখিয়া মধুসূদনের প্রতি মূল্যবোধ বোঝা যায়।

মধু সত্যই সংসারযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। প্রেমিক হইলেও পিতৃত্ব অথবা সংসারীভাব তাঁহার কিয়ৎপরিমাণে শিশুস্বভাবের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে নাই। সন্তানদের শিক্ষায় ব্যস্ত মধু তাঁহাদের হয়তো নিজের নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিতেন না দীর্ঘদিনের মত, যদি তাঁহার বাৎসল্যরস তীব্র হইত। তাছাড়া, অত চিন্তাশীল পিতা তিনি ছিলেন না। সংসার তাঁহার কাছে অপ্রীতিকর সঙ্কট। তাই বারবার সংসারের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কাব্যজগতে আশ্রয় লইলেন। বিবাহ ও সংসারের পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন নিঃসন্দেহে।

মান্দ্রাজে নবপরিণীতা আঁরিয়েৎকে রাখিয়া (১৮৫৬) দীর্ঘদিন কলিকাতা প্রবাসের পর মধু তাঁহাকে আনেন। তারপর আবার তাঁহাকে কলিকাতায় রাখিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড যান। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আঁরিয়েৎ লণ্ডনে পৌঁছান। বাধ্য হইয়া খরচ সাপেক্ষে মধু ফ্রান্সে আসেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে জানা যায় মধু লণ্ডনে আসিতেছেন, আঁরিয়েৎ ফ্রান্সে থাকিবেন। কিন্তু অর্থাভাবে তখন তাহা ঘটে নাই। তারপরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন লণ্ডনে আসেন। আঁরিয়েৎ সঙ্গে আছেন, জানা যায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মধু আঁরিয়েৎকে ফ্রান্সে রাখিয়া কলিকাতায় আসেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের

মেতে আঁরিয়েৎ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ব্যারিষ্টারী কাজে মধু প্রায়ই মফঃস্বলে গমন করিতেন, যথা ঢাকা, পুরুলিয়া প্রভৃতি। সেখানে তিনি একাই যাইতেন আমরা দেখিয়াছি। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মধু পঞ্চকোট রাজ্যের আইন উপদেষ্টা অবস্থায় সেখানে আট মাস থাকেন। তখনও আঁরিয়েৎ সঙ্গে ছিলেন না।

জীবনচরিতকারের বর্ণনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুধাবন করিলে মধুর পত্নীপ্রেমের বিশেষ দৃষ্টান্ত পাই না। মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে যত্নসহ রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন কোন উন্মাদ ব্যাকুলতা, দৃঢ় আকর্ষণ, অসহ্য বিরহ প্রভৃতি মনোভাবের আমরা পরিচয় পাই না। যদিও স্বামীজনোচিত ভালবাসার অভাব ছিল না আঁরিয়েৎ মধুর জীবনে মাদকতা বা অপার্থিব প্রেরণার প্রেম আনেন নাই, এ কথা সত্য। মধুর মত রোমান্টিক প্রেমিক প্রেমিকাকে দুরে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহাকে কাছে রাখিবার ব্যগ্রতা তাঁহার নাই। অথচ মধু যুবক, আঁরিয়েৎ সুন্দরী তরুণী এবং স্বামীগতপ্রাণা।

আঁরিয়েতের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তিনি সর্ব জলবায়ুর প্রকোপ সহ্য করিতে পারিতেন না। মধুকে বারবার তাঁহার জন্য চিন্তিত দেখি।* তবে কি এই প্রেম 'নিকষিত হেম'? সান্নিধির উর্ধ্বে তাহার গতি? আঁরিয়েতের ক্ষীণস্বাস্থ্য তো তাঁহার ন্যূনাধিক চারবার সূতিকাগারে যাওয়া রোধ করিতে পারে নাই। দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে বিদেশেও তিনি সন্তানের জন্ম দিয়াছেন। অথচ মধু আধুনিক পাশ্চাত্যপন্থী। আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবারসংস্থানের পটভূমিকায় বিচারে তিনি অপরাধী। তাঁহার ভালবাসায় সম্ভ্রমবোধ কম।

* "—But I have suffered a great deal of mental anxiety of late on account of my wife's ill health. I have been a wanderer on water and land. I took her on the river and then to Burdwan." রাজনারায়ণকে পত্র, ১৮৬২ অথবা ১৮৬১।

মধুসূদন দাম্পত্য জীবনে শান্তি পাইয়াছিলেন আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বিদেশিনী পত্নী 'শ্বেতহস্তীর' (White Elephant) সঙ্গে তুলনীয়া। অথচ নির্বিবাদে অভাব সহ্য করিয়া স্বামীকে ভালবাসিতেছেন, কলহবিবাদে স্বামীর অভাবঅনটনসঙ্কুল দিনযাত্রা মুখর করিয়া তোলেন নাই। নিস্তরঙ্গ আত্মসমর্পণের গভীর সমুদ্রে মজ্জমানা এই আইভিলতা মধুর স্মৃতির পাশাপাশি স্বর্ণসীতার মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠা। মধু নানা অশান্তির মধ্যেও সহাস্যআনন ছিলেন, হয়তো স্ত্রী এত নিরীহ বলিয়া তাঁহার শান্তি ছিল গৃহে। তিনি আঁরিয়েতকে ভালবাসিতেন। শক্তিমান পুরুষ এমন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিতা স্ত্রী, যিনি নিজের দেশ সমাজ প্রেমে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে বিসর্জন দিতে পারেন না। লতার সহকারকে আলিঙ্গনের সর্বগ্রাসী বন্ধনে বাঁধিবার ক্ষমতা যে অপরিসীম, ভারাক্রান্ত তরু-ভূমিসাৎ না হইলে মুক্তি নাই।

আঁরিয়েৎ অভাবে সহ্যশীলা হইলেও, 'নেটিভ' হিন্দু মহিলার মত নেহাৎ আটপৌরে ঘরনী নন, যিনি অভাবের সংসারেও শোভমানা। তিনি ব্যয়সাপেক্ষ বিলাস, স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া স্বামীকে পরিচালিত করা, দুর্যোগে সংসারের হাল ধরার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে আমরা দেখি নাই। মনোহারিণী ফরাসিনী সুকোমল প্রেমের যোগ্যপাত্রী নিসংশয়ে, কিন্তু 'প্রতিভার' উপযুক্ত সহধর্মিনী কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী, যাঁহার প্রেম কবির সমস্ত প্রাপ্তির শিরোভূষণ, যাঁহার নির্দেশে কবির জীবন ফুলের মত বিকশিত হইয়া উঠিত, সেই নারী কবির জীবনে পদক্ষেপ করেন নাই। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ববিহীনা আঁরিয়েৎ হয়তো মধুকে সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু মধুকে বোঝা বা মধুকে পরিবর্তিত করা তাঁহার সাধ্য ছিল না।

আঁরিয়েৎ পত্নী হিসাবে অন্য ইউরোপীয় রমণীর মতই ব্যয়সাপেক্ষ বিলাস। মধুর তাঁহাকে যথাযোগ্য ভাবে প্রতিপালন করার গুরুভার

সত্যই দুঃসাধ্য। যে স্ত্রী স্বামীর বিপদের মুহূর্তে অশ্রুচোখে স্বামীর নিকটে পুত্রকন্যার তুচ্ছ আবদারের কাহিনী জানান, তাঁহাকে বুদ্ধিমতী বলা চলে না। ২রা সেপ্টেম্বর (১৮৬৪) মধু বিদ্যাসাগরকে লেখেন—আমার অসহায় পত্নী অশ্রুচোখে আসিয়া জানাইলেন, 'বাছারা মেলা দেখিতে চায়, আমার কাছে মাত্র ৩ ফ্রাঁ আছে।'

"My poor wife came to me with tears in her eyes and said, 'The children want to go to the fare, and I have only 3 Francs."

('মধুস্মৃতি'-পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৪৭-৪৮)

ভিক্ষার্থীর পর্যায়ে তাঁহাদের সকলকে নামিতে হয়। অথচ পরে ফ্রান্সে একা বাসের সময়ে আঁরিয়েৎ ব্যয়সংক্ষেপের চেষ্টা করেন নাই। 'মধুস্মৃতি'তে মুদ্রিত একটি বিল আমরা হাতে পাইয়াছি। আঁরিয়েৎ প্রায়ই স্বাস্থ্যের জন্য সমুদ্রতীরে ভ্রমণে যাইতেন।

"I have let out to Mme Dutt (Mrs. Henrietta Dutt) one room from 21st August to 30th September at the rate of 640 francs for board and lodging and two bottles of wine per day. 29 francs per month for a piano and 9 francs for sea-water."

Hotel Victoria, Dieppe, For my mother
23rd August, 1867 A. Grubrey*

এই সময়ে মধু ঋণভারে বিপন্ন, ব্যয়সংক্ষেপ হেতু (Vide 'মধুস্মৃতি', ১৫শ অধ্যায়, পৃঃ ৩৭, বিদ্যাসাগরকে পত্র) পরিবার ফ্রান্সে রাখিয়া আসিয়াছেন। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় জমাইতে সময় চাই। আঁরিয়েৎ শিক্ষিতা, স্বামীর কোন কিছু তাঁহার কাছে গোপন

* বর্তমান শতাব্দীতে এক ফ্রাঁ-এর যা মূল্য, মধুসূদনের সময়ে ফরাসীদেশে মোটামুটিভাবে প্রায় তাহার ছয়গুণ বেশী ছিল।

নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি স্বামীর মতই অমিতব্যয়ের পথালম্বী। স্বামী দ্রাক্ষা-আসবে মগ্নচিত্ত, পত্নীও প্রত্যহ তুই বোতল মদ্যাভিলাষিনী। কলিকাতায় মধু ফরাসী চন্দননগরে ভিলা ভাড়া করিয়া হোটেল হইতে অবকাশ যাপন করিতেছেন পত্নীও প্রবাসে সমুদ্রতীরে মধুর ঋণ বর্ধিত করিতেছে। সুতরাং স্বামী স্ত্রী উভয়েরই রাজযোটকে মিলন। মধুর ভাষায় "অশিক্ষিতা, হীনচেতা হিন্দুমহিলা" হইলে হয়তো ঋণসাগরে মধুর নৌকা বানচাল হইত না।

এই মধুর ভাষায় "শিক্ষিতা, স্বাধীনবিহারিণী, উন্নতমনা খৃষ্টীয় মহিলার" ক্রমাগত স্বামীর পশ্চাতে ধাবমানা রূপ দেখি। মধু অর্থ পাঠাইতেন, তাহা পরিবারের পক্ষে হয়তো যথেষ্টই ছিল। অযথা আমরা তাঁহাকে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য বলিয়া ভৎর্সনা করি। পত্নীর বিলাসের ও ভরণপোষণের উচ্চ মাশুল তিনি হয়তো সবসময় যোগাইতে পারেন নাই। দোষ পতিপ্রাণা আঁরিয়েতের নয়, ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মত তিনি দিন কাটাইতেন একজন অমিতব্যয়ী সাধারণ মধ্যবিত্তের কণ্ঠলগ্না হইয়া। বাংলায় তিনি অসহায় আবার স্বভাষাভাষী ফরাসী রাজ্যে পাঁচবৎসর বাসের পরেও তিনি অসহায়। মমতার সহিত মধু তাঁহাকে বারবার 'poor wife' বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। কখনও স্বামীকে আর্থিক সাহায্য দিবার তিলমাত্র প্রয়াস তাঁহার মধ্যে দেখি না। অথচ সেই সময়ে বাঙ্গালী শিক্ষিতা মহিলারাও অর্থকরী কর্মে লিপ্ত আছেন, এমন উদাহরণ বিরল নয়। মধু তাঁহার ভ্রমণের জন্য মূল্যবান শকট, গৃহকর্মের জন্য উচ্চ বেতনের পাচক, ভৃত্য, ছেলেদের জন্য টাট্টুঘোড়া, বহুমূল্য পোষাক প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখেন। সেই পোষাক অবশ্য অম্লানচিত্তে আঁরিয়েৎ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নাই। "রাজনারায়ণের পুত্র" স্বীয় পরিজনকে পিতার মত স্বীয় ঐশ্বর্যের তথমাধারী সম্পত্তিরূপে দেখিতে ভালবাসিতেন।

আঁরিয়েৎ অবশ্যই মধুর অমিতব্যয়তার জন্য বন্ধুদের কাছে তুঃখ

করিয়া গিয়াছেন। দিনযাত্রার উচ্চ মানের জন্য অমিতব্যয় তিনি কতদূর অপছন্দ করিয়াছেন, জানা যায় না। তবে দানের অমিতব্যয়ের জন্য তাঁহার বিক্ষোভের পরিচয় আমরা পাই। মধুসূদনের "অশীতিপর, স্থবির, গুরু বিপন্ন অবস্থায় কলিকাতা আসিয়া" সাহায্য চাহিলে মধু পঞ্চাশ টাকা দেন। পত্নী ঐ দানকে "বাহুল্য" বলেন ('মধুস্মৃতি', ১৮শ অধ্যায়, পৃঃ ৩৭৬)। অন্যের দুঃখকষ্ট মোচনের জন্য ব্যয়কে আঁরিয়েৎ অতিরিক্ত মনে করায় আপত্তি নাই, কারণ অনাহারে থাকিয়া পৃথিবী দান করিবার বিলাস সহজে বোধগম্য হয় না। কিন্তু, আঁরিয়েৎ নিজেও শঙ্খবলয়ভূষিতা, কখনও পাচিকা, কখনও পরিচারিকা হিন্দু গৃহিণী নন। তিনি সকৌতুকে কোনসময়ে সিন্দূর ধারণ করিলেও শাড়ীপরা বা অন্য বাঙ্গালীজনোচিত আচরণ তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

আঁরিয়েৎ হিন্দু আদর্শের পতিব্রতা আইভিলতা। মধুর জীবনে যেটুকু শান্তি, তাই রচনার জন্য বাংলা কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল আঁরিয়েৎকে শ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মহীয়সী মাতা, যাঁহার চরিত্র রাণীর চরিত্র বলিয়া মধু মনে করেন, অথবা প্রকৃত মহীয়সী নারী মধুর জীবনে নামিয়া আসেন নাই। আঁরিয়েৎ মধুর "সতত সঙ্গিনী মম সংসার মাঝারে", কিন্তু মধু নারীত্বের আদর্শের চিত্রে যে তেজ, যে দীপ্তি 'প্রমীলা' 'জনা', ইত্যাদিতে দেখা যায়, আঁরিয়েতে তাহা নাই।

আঁরিয়েতের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ঐকান্তিক পতিপ্রেম। মধু তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেও তিনি পারেন না। অবশ্য মধুর পশ্চাতে ধাবমানার চিত্তে প্রেম ভিন্ন হয়তো আশঙ্কাও ছিল। চার সন্তান সহ পত্নীত্যাগীর ঐতিহ্য আঁরিয়েতের চক্ষের সম্মুখেই, আঁরিয়েতের জন্য কিয়ৎপরিমাণে ঘটিয়াছিল।

আঁরিয়েতের চরিত্রের দুর্বলতম দিক এখানেই। মধু চারটি সন্তানের পিতা; কোর্টশিপের দ্বারা প্রাপ্তা, প্রেমিকা পত্নীর সহিত

যে ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। "সুতরাং ২১শে ডিসেম্বর ১৮৫৫ হইতে পরবর্তী জানুয়ারী মাসের শেষভাগের মধ্যে কোন সময়ে মধুসূদন হেনরি আঁরিয়েৎকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু, এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও নূতন বিবাহ কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ঠিক বুঝা যায় না ('মধুসূদন দত্ত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯)। মধু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষভাগে 'বেন্টিক' জাহাজে কলিকাতা যাত্রা করেন।

মান্দ্রাজে মধুর জীবন রহস্যজালে অর্ধাবৃত। জীবনীকার সম্যক জানার গৌরব করিতে পারেন না। মান্দ্রাজে গমন করিয়া মধুর দ্বিতীয় বিবাহ কতটা বৈধ তাহার সন্ধানের প্রয়োজন দেখি না। মহাপুরুষের ব্যক্তিগত জীবন সর্বদা মহৎ হয় না।

পূর্বেই আঁরিয়েতের সহিত প্রণয় ঘটিয়াছিল, যোগেন্দ্র বসু বলেন, (পৃঃ ১৪৯)। সুতরাং, আঁরিয়েৎ বিবাহিত ও সন্তানের পিতার প্রেমের প্রতিদান দিয়াছিলেন। সাধারণ মতে, আঁরিয়েৎ একটি সংসারের বন্ধন ভাঙ্গিয়াছিলেন নিজের প্রেমকে সার্থক করিতে। যে কোন নারীর পক্ষে এই কাজ আমরা অপরাধ মনে করি ("পত্নীভাবে গ্রহণ", যোগেন্দ্র বসু, পৃঃ ১৯)। পূর্ণ বৈধ বিবাহ কিনা, আমরা জানিতে চাই না। রেবেকার নিঃসঙ্গ উত্তরজীবন ও শিশুদের অনাথ অবস্থা আমাদের পীড়া দেয়।* খৃষ্টান মধুর সম্ভবপর বিবাহবিচ্ছেদ খৃষ্টানগণ কতটা সমর্থন করেন আমরা জানি না, কিন্তু আঁরিয়েতের শেষ জীবনের দুঃখ যেন রেবেকার অভিসম্পাত।

---

*রেবেকা সুন্দরী, তরুণী। স্বদেশে আত্মীয় স্বজনের গণ্ডির মধ্যে থাকিতেন। মধুসূদন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়াকে গ্রহণ করিবার পরে রেবেকা নিঃসঙ্গ রহিলেন কেন? মধুর প্রতি প্রেমে, কিংবা চারটি পুত্রকন্যা সহ জীবনের ধিক্কারে অথবা সম্পূর্ণ বৈধ বিবাহবিচ্ছেদের অভাবে পূর্ব বিবাহে শৃঙ্খলিত থাকিবার জন্য?

কিশোর মধুর রেবেকার সহিত মনের আদানপ্রদান হইবার পূর্বেই বিবাহ হয়। রেবেকা স্বতন্ত্রপ্রকৃতি, ধনীকন্যা, কারণ নীলকর সে যুগে অর্থশালী হইতেন অবশ্য। রেবেকা পরমা সুন্দরী, রেবেকার আত্মীয়স্বজন মধুকে উপযুক্ত মনে করেন নাই। রেবেকা খাঁটি ইংরেজ দুহিতা। সুতরাং নমনীয়া আইভি লতা তিনি নন। আঁরিয়েৎ স্বচ্ছলতার মধ্যে বেশীভাগ সময় কাটাইতে পারিয়াছিলেন, স্বজাতীয় স্বামীও তাঁহাকে অধিকতর আয়াস দিতে পারিতেন না। তিনি দরিদ্র শিক্ষকদুহিতা। তিনি ফরাসী, কিন্তু স্বামীর নিকটে তাঁহাকে ফরাসী শিক্ষা করিতে দেখিয়া তাঁহার রক্তের আভিজাত্য সম্পর্কে স্বতঃই সংশয় আসে।

নানা গোলযোগের মধ্যেও নির্বিবাদে মধুর সহিত মিলন, অনন্তর কয়েক বৎসর নিশ্চিন্তে মান্দ্রাজবাস দেখিয়া মনে হয় আঁরিয়েৎ স্বজন-বিহীনা অথবা হীন অবস্থার মধ্যে ছিলেন। তাঁহার প্রেমে বাধা দিবার মত সহায় কেউ তাঁহার ছিল না। তিনি যথেচ্ছাচার করিয়া ছিলেন হয়তো বেপরোয়া হইয়া।

রেবেকা মধুর মনে নূতন কবিতার জন্মদাত্রী। মান্দ্রাজে সাংবাদিক জীবনের শাখায় তাই ফুল ফুটিল। মধু তাঁহাকে হয়তো পরবর্তী জীবনে ভোলেন নাই। নীলকরদুহিতার প্রতি রোষেই মধু যে 'নীলদর্পণে'র অনুবাদপ্রবৃত্ত হন নাই, তাহা বলা শক্ত। তবু রেবেকার সহিত অশান্তি কেন?

আগাগোড়া রেবেকা নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হন। ইতিপূর্বে কয়েকখানি পত্র হইতে মান্দ্রাজে মধুর দারিদ্র্যের নিদারুণ রূপ আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। ধনীর কন্যা রেবেকা আঁরিয়েতের ন্যায় মধুর কাছে ক্ষণকালীন স্বাচ্ছন্দ্যের মুখও দেখেন নাই। তাছাড়া, সাতবৎসরে তাঁহার চারটি পুত্রকন্যা হয়। তাহাও শরীরিক ও মানসিক শান্তিসূচক নয়। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের হেতু রাজনারায়ণ তিন চারটি নারীর জীবন নষ্ট করিলেন, ভাগ্যের উপহাসে বিনায়াসে মধু

আটটি সন্তানের জনক হইলেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে উল্লেখ্য যে পিতার বিরুদ্ধে তিনি ইংলণ্ড যাইবার জন্য বিদ্রোহী হইয়া অবশেষে ত্যজ্যপুত্র হন, সেই পিতার সম্পত্তির অর্থেই অবশেষে তিনি সমুদ্রপার হইলেন। অদৃষ্টের প্রকাণ্ড পরিহাস।

অভাবক্লিষ্টা রেবেকা ও অসংযতচরিত্র মধুর মধ্যে অবশ্যই কলহ বিবাদ হইত। আমরা অনুমান করি, গৌরদাসের বর্ণিতচরিত্র মধু রেবেকাকে 'ক্যালাস' বুঝিয়া সুদূর হইলেন ও কোমলস্বভাবা আঁরিয়েতের সহানুভূতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল ক্রমে ক্রমে। আঁরিয়েতের সঙ্গে সংযোগ হয়তো রেবেকাকে আরও উতপ্ত করিয়া তোলে এবং অনিবার্য ট্রাজিডির উদ্ভব ঘটে।

রেবেকার আত্মীয়স্বজন মান্দ্রাজবাসী, তিনি মান্দ্রাজ ত্যাগ করেন নাই। সহসা বিচ্ছেদের কারণ হয়তো মধুর বাংলাদেশে পিতৃসম্পদ গ্রহণে যাত্রা ও সেখানে বসবাসের পরিকল্পনা। বিদেশে অর্থাভাবে মধুর কবিসত্তা শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল।

হয়তো স্বামী-স্ত্রীর অসন্তোষ এই নূতন সূত্র ধরিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আত্মাভিমানিনী রেবেকা হয়তো দেশত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ক্রুদ্ধ মধু চিরদিনের খেয়ালী। হয়তো অনুরাগিনী আঁরিয়েৎকে গ্রহণ করিয়া অপ্রিয় বিবাহের দায় তিনি তৎক্ষণাৎ অতিক্রম করিলেন। এই অনুমান ভিন্ন এত শীঘ্র ও সহসা পত্নীত্যাগের হেতু পাওয়া যায় না। কারণ কয়েকদিন পূর্বের পত্রেই মধু 'Fine English Wife' সম্পর্কে কোন বিকার প্রকাশ করেন নাই।

রোষ ও কলহের মধ্যে বিসর্জিতা রেবেকার প্রভাব স্বামীর উপর অনেক অধিক, আমরা দেখিয়াছি। প্রেরণা দিবার ক্ষমতাও তাঁহার অপরিমিত। আঁরিয়েতের প্রতি উন্মাদ আকর্ষণ ও রোমান্টিক প্রেম থাকিলে মধু কতকগুলি কাজ করিতেন না ঃ—

১। 'আত্মবিলাপে' প্রেমের প্রতি আক্ষেপ। অন্যান্য কবিতায় হতাশার ছন্নছাড়া সুরযোজনা।

২। পত্নীসঙ্গবিরহিত অবস্থায় অতকাল অতিবাহিত করা। অথচ বিলাস ও ভোগে ভাসমান অবস্থা।

৩। উচ্ছৃঙ্খল অসংযত জীবন ও অমিত ব্যয়। ফ্রান্সে বসিয়া ফরাসী সুন্দরীর প্রতি প্রীতি। বিদেশিনীকে প্রেমগীতি যথা, 'আত্মপরিচয়' সনেট।

৪। সর্বদা বন্ধুসঙ্গে পানভোজন ও বহির্ভ্রমণ। আঁরিয়েতের সঙ্গে সুখভ্রমণের ইতিহাস বড় একটা দেখা যায় না। হিন্দু গৃহিণীর মতই আঁরিয়েতের পৃথক অবস্থিতি।

৫। যত ঋণ হোক, প্রিয়ার সাহচর্যে নূতন আশা ও উদ্যম দেখা যাইত। আঁরিয়েতের মুখ চাহিয়া নিজের দুঃখ ভোলা সম্ভব ছিল। মধুর জীবনীকার লেখেন যে দ্বিপ্রহর বেলা বাটীর বদ্ধ ঘরে বসিয়া একাকী মধু নির্জলা মদ্য পান করিতেছেন। মনোমোহন ঘোষের অনুযোগে মধু বলিলেন,—"অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা ক্লেশ কম বলিয়াই আমি অস্ত্রের পরিবর্তে সুরা ব্যবহার করিতেছি (This is a process equally sure but less painful)।"

('জীবনচরিত'—৬০৩ পৃঃ)

তাঁহার আত্মঘাতী হইবার বাসনায় বাধা দিবার পক্ষে কোন তীব্র আকর্ষণ তাঁহার জীবনে ছিল কি ?

গৃহিণী যদি মানসী হন, সন্তানের জননী যদি প্রেয়সী হন, তবেই কবিমন সান্ত্বনার ক্ষেত্র পায়। প্রেম যদি জীবনে ধ্রুব তারকা হইত, মধুর প্রেমিক হৃদয় তবেই পথ পাইত। আঁরিয়েতকে সহস্র প্রণাম। তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া, কিন্তু মধুর যোগ্য সহধর্মিনী তিনি নন। মধুর নিকটে হয়তো রেবেকা অধিকতর আকর্ষণীয়া ছিলেন।

রেবেকাকে ও চারটি নিরপরাধ শিশুকে বিসর্জনের মধ্যে কোমল হৃদয়, পরদুঃখকাতর, প্রেমিক কবির পৈত্রিক নিষ্ঠুরতার উত্তরাধিকার হঠাৎ প্রকাশিত দেখি।

মধুর কোমল হৃদয়ের একটি প্রবাদ জীবনীকারগণ বিগলিত চিত্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধু নাকি ভাই-এর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অতিপ্রিয় পোষা পাখীর ছানাটি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই প্রবাদে আমরা মধুর ভালবাসার প্রমাণ পাই না, নিষ্ঠুরতার প্রমাণই পাই। এক ভালবাসার জন্য অন্য ভালবাসার কণ্ঠে অস্ত্রাঘাত তিনি করিতে পারেন। তাঁহার পিতাও তাই করিয়া গিয়াছেন।

মধু মাতাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। উত্তর জীবনে বারবার মাতার স্মরণে তিনি বিহ্বলচিত্ত। কিন্তু দেবকীকে ভালবাসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ভালবাসার কাছে মাতৃভক্তি তুচ্ছ। পিতা বারবার বিবাহ দ্বারা মাতার অবমাননা করিতেছেন, মাতা শোকে জীবন্মৃতা, মধুর তাহাতে কি আসে যায়? মান্দ্রাজ হইতে রেবেকার স্বামী মধু গৌরকে লিখিতেছেন ঃ—

"How can ycu then expect a fellow to be in his mother's apron ?"

মান্দ্রাজের পত্রগুলি অভাবের মধ্যেও নিজের সুখ ও আশার কথায় পরিপূর্ণ। মাতার অপমানে মধু ক্ষুব্ধ হন না, আবার মাতার প্রেরিত দ্রব্যগ্রহণে তাঁহার আগ্রহ। পিতাকে অমান্য করিয়া তিনি বিদ্রোহী, কিন্তু পিতার অর্থে বিলাসিতায় তাঁর অভিরুচি প্রবল। পিতার অর্থে খৃষ্টান ধর্মত্যাগী পুত্র বিশ্‌পস্‌ কলেজে মদ্যপান করিতেছেন, গোপনে মাতার নিকট হইতে উচ্ছৃঙ্খলতার পাথেয় গ্রহণ করিতেছেন— মধুসূদনের এই চিত্র দীন।

বিদ্রোহী, আত্মাভিমানী, 'পুরুষসিংহ' মধুর এই দীনতার সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে পরিশোধের চিন্তাবিরহিত ঋণগ্রহণ ও ঋণের অর্থে বিলাসিতার অমিতব্যয়। দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, নিষ্ঠুরতা এখানে তাঁহার চরিত্রে এই দীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করে। একজনকে বা এক আদর্শকে ভালবাসিয়া অন্য পাত্র বা আদর্শ ত্যাগ মধুর জীবনে পরিচিত নিষ্ঠুরতার ঐতিহ্য। প্রতিভাশালী ব্যক্তি নৈর্ব্যক্তিক শিল্পী

হইবার উর্দ্ধ সোপানে নিষ্ঠুর হন নিসংশয়ে। পৃথিবীর অন্য অন্য প্রতিভার মত মধুও নিষ্ঠুর। পরদুঃখকাতর কোমলহৃদয়, বন্ধুবৎসল কবি মধুর এই নিষ্ঠুরতার বাহন শিল্পীর প্রতিভা। মধুর চরিত্রের নানা অসঙ্গতি আমরা এই সূত্রে সমাধান করিতে পারিব। বেপরোয়া বিদ্রোহী মধুসূদন নিজের প্রতিত্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। তাই তাঁহার সারাজীবন অযত্নে ছন্নছাড়া।

গতানুগতিকের প্রতি বিতৃষ্ণাও মধুর বারবার দেশত্যাগ ও অন্যান্য খেয়ালের কারণ। "প্রতিভা তাঁহাকে সুস্থির থাকিতে দিল না। গতানুগতিকের চিরপ্রাপ্ত বিথীকা তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রকৃতি নূতন ক্ষেত্র, নূতন কাজ ও নূতন উত্তেজনার জন্য লালায়িত হইতে লাগিল।" (পৃঃ ২৩৪, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ')

অনুক্ত চ্যালঞ্জ গ্রহণ করিয়া মধু ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন। কিন্তু "মধুর অস্থিমজ্জা ব্যারিষ্টারীর বিপক্ষে ছিল। আইন আদালতের নথীরাখা, মক্কেলের কাছে বাঁধা থাকা, নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কাজকরা তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না।" (পৃঃ ১৩৮, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ')

উচ্চাকাঙ্ক্ষা মধুকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঠিক নয়, দুরাকাঙ্ক্ষা। বিদেশগমনের জন্য ঋণ, বিলাসিতার জন্য ঋণ তজ্জন্য মনকষ্টে শরীরমন ভগ্ন—কবির শেষ জীবনে হতাশা। মহাকবি হইবার উদ্দেশে তিনি ইংলণ্ড যাইতে চান জীবনের প্রথমভাগে। এই ইচ্ছা দুরাকাঙ্ক্ষা নয়, কারণ তিনি মহাকবি হইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেশের মাটিতে বসিয়াই 'মহাকবি' হইয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট হইতে নীলদর্পণের অনুবাদকার চাকুরিয়া মধু লাঞ্ছিত হইবার পরে স্বাধীন ব্যবসায়ে বদ্ধমনা হইলেন। সেই কোর্টে তিনি চাকুরি না করিয়া প্রথম দিশী ব্যারিষ্টার হইয়া দেখাইয়া দিবেন। অতএব অর্থ উপার্জনের জন্য কবি বিদেশগমন করিলেন

টাকা আনা পাইএর অঙ্ক বাড়াইবার উদ্দেশে, কবিত্বের উৎকর্ষের জন্য নয়। এখানে তিনি পথভ্রষ্ট ও দুরাকাঙ্ক্ষা। বাণীর সেবক কমলার কৃপাপ্রার্থী। মধুর জীবন পাঠ করিলে দেখা যায় তিনি ঐশ্বর্যে অনুরক্ত। তাঁহার কাব্যে ঐশ্বর্যের জয়গীতি ; শব্দ ঝঙ্কারে ও কল্পনার অপরূপ চিত্রসম্ভার রচনায় তাঁহার প্রবণতা রাজসিক। শৈশব ও কিশোর জীবনে তিনি বিলাসিতার মধ্যে বর্ধিত পিতার প্রশ্রয়ে। তরুণজীবনে তিনি কিছুদিন অভাব সহ্য করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐশ্বর্যের তৃষ্ণা তাঁহার নিবৃত্ত হয় নাই। তারপর কাব্যজীবনের মুখবন্ধে বাংলার শ্রেষ্ঠ ধনীকুলের সঙ্গে অহরহ সাহচর্যে মধুর ভোগ-লিপ্সু মনে আরও অর্থের প্রাপ্তি ঈপ্সিত হওয়া স্বাভাবিক। বাঁধা কাজে প্রাচুর্য নাই। অতএব স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থ অর্জন আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্যবহারজীবী হইলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে বাণীর দেউল হইতে বিদায় লইতে হইল। তিনি নিজের পূর্ব পরিবেশ ভুলিতে চাহিলেন। সারাজীবন তিনি সকলকে দেখাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। বাণীর বরপুত্র হইয়া যে বন্ধুদের তিনি একবার "দেখাইয়া" দিয়াছিলেন, কমলার সেবকরূপে আবার তাহাদের দৃষ্টিতে ঝলক দিবার ইচ্ছা বালস্বভাব কবির পক্ষে সহজ ইচ্ছা মাত্র। অমিত্রচ্ছন্দের মহাকাব্যে যিনি বাংলার মনোহরণ করিয়াছিলেন, তিনিই বাড়ী গাড়ী আসবাবের ময়ূরপুচ্ছ প্রসারণ করিলেন আবার মনোহরণের আশায়। হায় মধুসূদন!

য়ুরোপে প্রবাসের একখানি পত্র হইতে তাঁহার মানসিকতা ধরা যায় :—

"I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour to be got in our country without money. If you have money you are a বড়মানুষ if not, nobody cares for you. We are still a degraded people. Who are the বড়মানুষ among us?

The nobodies of Chorebagan and Barrabazar. Make money my boy, make money ?"

(গৌরকে পত্র ফ্রান্স, ২০শে জানুয়ারি, ১৮৬৫)

ঐশ্বর্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষা মধুকে পথভ্রষ্ট করিল। তাঁহার জন্মসত্ত্ব ছিল সাহিত্যের পথ। Macbeth-এর পতন দুরাকাঙ্ক্ষায়। ডাকিনী (witches) তাঁহাকে দুরাকাঙ্ক্ষার পথে ডাকিয়া আনে। "মধুর নিয়তি সেই ডাকিনীর কাজ করিয়াছিল"। তাই আঁরিয়েতের মৃত্যু সংবাদশ্রবণে মধুর মনে 'ম্যাকবেথের' পংক্তি স্বতঃই উদিত হয়। তিনি ম্যাকবেথের সঙ্গে মুহূর্তে একাত্মা হইলেন। মধুর মুখে শোনা গেল লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুতে ম্যাকবেথের উক্তি—

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow
Creeps in this petty pace from day to day"—

'দেখাইয়া' দিবার আকাঙ্ক্ষা মধুকে বহু বার ভুল পথে চালায়। ইতিপূর্বে আমরা সে সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। দেবকীকে পাওয়া গেল না নেটিভ খৃষ্টান হইয়া, মধু খাঁটী ইংরেজ দুহিতা রেবেকাকে বিবাহ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

আবার ইংরেজ দুহিতার সঙ্গে মনান্তর হইল। অতএব ফরাসিনীকে গ্রহণ করিয়া রেবেকাকেও দেখাইয়া দিলেন। সমাজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া কবির বাহুপাশে যে নারী আশ্রয় লইলেন, তাঁহার অনন্যগতি স্বামী। সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহাকে অন্য কোন পরিজন সাহচর্যে দেখি নাই। মধুসূদন ভিন্ন এই স্বকুল-ত্যাগিনী রাধিকার ভিন্ন আশ্রয় ছিল না।

"জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে,—
আমি কেন না কাটিব সরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে,
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?"

('ব্রজাঙ্গনা')

ধর্ম

মধুসূদনের বিচিত্র এবং অসঙ্গতিপূর্ণ জীবনে আর একটি বিতর্ক-মূলক প্রশ্ন ঃ তিনি কি মনেপ্রাণে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে সক্ষম হইয়াছিলেন? উনিশ বৎসর গোঁড়া হিন্দু আবহাওয়ায় বর্ধিত হিন্দু কলেজের ছাত্র মধু সহসা খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেন কি ধর্মোন্মাদে?

ইতিপূর্বে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আমরা মধুর ধর্মান্তরগ্রহণের কারণ সম্যক আলোচনা করিয়াছি। আর একবার সেই কারণগুলির গুরুত্ব দেখানো যাক।

১। দেবকীকে বিবাহের ইচ্ছা, অমনোনীতার সঙ্গে জোর করিয়া বিবাহ দেওয়ার বিপক্ষাচারণ।

২। বিদেশগমন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূরণ। ইংরেজি ভাষায় কবি-যশের কামনা।

৩। মাতাপিতার বিরুদ্ধে অভিমান ও বিদ্রোহীর জিদ বজায় রাখা।

ধর্ম মধুর জীবনে বৃহৎ শক্তি নয়। মধুর মনোনীতার পিতা ও নির্বাচিত সাক্ষী, ধর্মান্তরগ্রহণের প্রধান হোতা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "His desire of becoming a Christian, was, scarcely greater than his desire of a voyage to England."

ইংলণ্ডগমনের ইচ্ছা অপেক্ষা তাহার খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা তীব্রতর ছিল না।*

* শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, মধুর নাবালিকা বিবাহের ভয়ই পলায়নের কারণ। পলায়ন বিলাতে তার জন্য টাকা—টাকার জন্য সাহায্য—

মধুর আজন্ম বান্ধব বাবু গৌরদাস বসাক বলেন—

আমি কখনও তাহার মনে খৃষ্টধর্মের প্রতি প্রবল উৎসাহ দেখি নাই।

"I never found in him any great enthusiasm for Christianity."

খৃষ্টধর্মের বিষয়ে মধু উল্লেখযোগ্য কিছু লেখেন নাই। দেবকী-ভিলাষী মধু দীক্ষার সময়ে একটি ধর্মগীতি লিখিয়াছিলেন। রেবেকা-পতি মধু অন্য একটি ধর্মকাব্যের পত্তন করিয়াছিলেন। কারণ, ধর্মানুরাগ নয়—অনুরাগ।

মধুর কলেজীয় শিক্ষা খৃষ্টধর্মের অনুকূল ছিল না। ছাত্রদের হিন্দুধর্মে অবিশ্বাস জন্মলাভ করিয়াছিল, কিন্তু কোন ধর্মেই আস্থা ছিল না ('জীবন চরিত', পৃঃ ১১৬-১৯), মধু রামায়ণ মহাভারতে দীক্ষা পান সাগরদাঁড়ি গ্রামে। মাতা হিন্দুরমণী। মধুর রক্তে সত্যই যে হিন্দুত্ব মিশিয়া গিয়াছিল আমরা তাহা দেখিয়াছি। মধুর সমাজ ও

খৃষ্টানদের সাহায্য, সুতরাং খৃষ্টান হওয়া দরকার। ধর্মানুরাগ নয়, কারণ নিতান্ত স্থূল জাগতিক কারণ।

"By embracing Christianity he was enabled to realise his idea of courtship before marriage". Reminiscences by Gourdas Bysak.

"কবি হওয়ার বাসনা মধুর জীবনের সর্বপ্রধান পরিচালনা শক্তি বলিয়াই স্থির করিতে হয়। বিলাতগমনের আকাঙ্ক্ষা উহার ইন্ধন রূপেই বর্তমান ছিল। (পৃঃ ৩২, 'অন্তর্জীবন', শশাঙ্ক মোহন সেন)।

খৃষ্টানদিগের প্রবল প্রচেষ্টা মধুর ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারে পরিলক্ষিত হয়।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে মধুর খৃষ্টান হইবার বাসনা দেখিয়া তিনি কচিৎ ভদ্রব্যক্তির সহিত মধুর পরিচয় করাইয়া দিলেন :—

"That gentleman received him very cordially and gave him every encourgement in his views and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal."

বন্ধুরা হিন্দু। কলিকাতায় যে মহাকবির সাক্ষাৎ আমরা পাই, তিনি সর্বদা হিন্দু বন্ধুদের সাহচর্যে দিনযাপন করিতেছেন। নিজে পছন্দ করিয়া হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গ গ্রহণ করিতেছেন। পুনর্বার তাঁহার দিনযাত্রার চিত্রে অনুসন্ধান করিয়া এই সূত্রে গ্রথিত চিত্রগুলি আবার দেখি। তিনি সখিসম্বাদ শুনিতেছেন, শারদীয়া মণ্ডপে অশ্রুপাত করিতেছেন। 'রুটিঘণ্ট' মুগের ডাল ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেছেন সাগ্রহে। ধুতিচাদর পরিয়া গঙ্গাস্নানে উৎসুক ও গঙ্গাশ্লোক আবৃত্তি সহ গঙ্গাস্নান। পিঁড়ি পাতিয়া আহারে প্রবৃত্ত ('মধুস্মৃতি', ১৭শ অধ্যায়)। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের রচনাব্যস্ত। তিনি নিজেকে কখনও বা নারায়ণের অবতার বলিয়া পরিহাস করিতেছেন।* 'জীবনচরিত' এবং 'মধুস্মৃতি'র ছত্রে ছত্রে মধুর হিন্দুপ্রীতির প্রমাণ আছে। বাহুল্য ভয়ে এই তুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি বিরত হইলাম। রাজনারায়ণ বসু বলেন ঃ—"আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের পর বলিলাম যে, 'আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে, যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরেজের মত হইলেও তোমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপ হিন্দু।' তিনি বলিলেন, তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু, কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁষিয়া না থাকিলে চলেনা, এই জন্য খৃষ্টীয় সমাজ ঘেঁষিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, তখন ঐ সমাজ ঘেঁষিয়া থাকা কর্তব্য।" ('জীবনচরিত'-পরিশিষ্ট)।

মধু যখন ধর্ম ত্যাগ করেন, তখন তিনি কিশোর। ধনীর একমাত্র সন্তান তিনি, সুতরাং জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তিনি বর্ধিত হন নাই পূর্ণাঙ্গ মানুষ রূপে। যে ছায়া বিশবৎসর, অথবা

---

* "ভবিষ্যবংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে, নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া, মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।"

('মধুস্মৃতি', ৯ম অধ্যায়, পৃঃ ১৪৮)

উনবিংশ বৎসরের ধনীপুত্রের মনে প্রভাব ফেলে, সে সাময়িক। মনে হয়, মধুর মনে নানাবিধ ছাপ বা ইম্প্রেসন পড়িতেছিল। সাগরদাঁড়িতে তিনি রামায়ণ মহাভারতের ভক্ত, মাতার প্রভাব এবং পরিবেশের প্রভাব। ছাত্রজীবনে তিনি ইংরেজির একনিষ্ঠ ভক্ত; সদ্য-বিগত অধ্যাপক ডিরেজিও, প্রিয় অধ্যাপক কাপ্টেন রিচার্ডসন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তির বহুবিধ প্রভাব। বাড়ীতে তিনি বিলাসিতায় 'রাজনারায়ণের পুত্র'। বন্ধু মহলে তিনি কবি ও প্রেমিক। কোন্ ছাপ তাঁহার ভাবপ্রবণ মনে চিরস্থায়ী হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হইবার পূর্বেই সাময়িক মোহে তিনি ধর্মত্যাগ করিয়া ফেলিলেন, ('চরিত্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

'বিদ্রোহ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা মধুসূদনের ধর্মজীবনের বিদ্রোহ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর তাঁহাকে গোঁড়া খৃষ্টান বলা অসম্ভব। অবশ্য স্বধর্মত্যাগী জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বার বার মধুর খৃষ্টধর্মে নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মধুস্মৃতিকার উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ('মধুস্মৃতি, ২০শ অধ্যায়, পৃঃ ৪১৯)। উক্তিগুলি প্রায়ই মধুর চরিত্রলক্ষণ বিচারপূর্বক লিখিত, তথ্য ভিত্তির উপর গঠিত প্রামাণিক মত নয়। একটি প্রমাণ যে মধু "সর্বদা গ্রীক ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট পড়িতেন।" কিন্তু অপরিসীম পঠনশীল কবির পক্ষে ইহা আশ্চর্য নয়। তিনি নিউ টেষ্টামেণ্ট যতটা পড়িতেন তাহার সহস্রগুণ অধিককাল রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেন।

জীবনের শেষদৃশ্যে খৃষ্টধর্মে আস্থাজ্ঞাপন মধুর একমাত্র খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসের পরিচয়। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিব, তখন তাঁহার কি উপায় ছিল? হিন্দুধর্মের দ্বার রুদ্ধ! অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া লইয়া গোলমাল চলিতেছে। বিদেশিনী পত্নীর স্বামীর শিয়রে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন উপবিষ্ট। সাহেবীভাবাপন্ন মধুর বিভ্রান্ত আত্মা শেষ মুহূর্তে কোন ধর্মমতের ক্রোড়ে অসহায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

তিনি দৃঢ়চেতা ছিলেন, যে ধর্মের আনুগত্য একবার যে কোন কারণেই করিয়াছেন সে ধর্ম ত্যাগ করিয়া আবার হাস্যাস্পদ হইবার লোক তিনি নন। চণ্ডীমণ্ডপে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার দিকে চাহিয়া নয়নাশ্রু মোচন করিলেও মাইকেল আবার মধুসূদন হইবার ভুল করেন নাই। যাহা করিয়াছেন, বিনা অনুযোগ-অভিযোগে তাহা সহ্য করিবার অপরিসীম শক্তি তাঁহার ছিল। উপমা ধার করিয়া বলা চলে যে তিনি যে শয্যা রচনা করিতেন, সেই শয্যায় শয়নের সাহস তাঁহার ছিল।*

খৃষ্টধর্মে মধু বিশ্বাসী ছিলেন কিনা বর্তমান শতাব্দীতে সেটি কোন বড় প্রশ্ন নয়। আমরাও খৃষ্টের ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল, খৃষ্টের সরল ধর্মমতে বিশ্বাসী। কিন্তু সেজন্য নিজ ধর্মে আস্থা হারাইয়া আমরা ধর্মত্যাগ করি না। খৃষ্টকে মহাপুরুষরূপে স্বীকার করার মধ্যে বর্তমান হিন্দুধর্ম নিজের মহত্ত্ব প্রচার করে। অন্যের ধর্মে বিশ্বাস করায় আজ আর দীনতা নাই।

মধুসূদন অবশ্যই খৃষ্টধর্মের মত মহৎ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু হিন্দুধর্মে তাঁহার যে অনুরাগ অধিকতর, তাহার আমরা ক্রমাগত প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহার মানসিক গঠন ছিল হিন্দু।

পুঙ্খানুপুঙ্খ জাগতিক প্রমাণ দ্বারা মধুর হিন্দুভাব প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন দেখি না। আমরা কবির মানসিক গঠনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ একটিই দিব। তাঁহার সমগ্র রচনাবলী আমরা প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত করিলাম। সাহিত্যই তাঁহার ধর্ম ছিল এ কথা সত্য;

---

* "মনুষ্য যে ধর্মাবলম্বী হউন না কেন, সেই ধর্মেই তাঁহার পরিত্রাণ ও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মধুসূদন যখন খৃষ্টধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় আচার ব্যবহারে অনুরক্ত হইয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে অন্তিম সময়ে খৃষ্টধর্মানুমোদিত ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধান ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও প্রশস্ত।" ('মধুস্মৃতি', ২০শ অধ্যায়, পৃঃ ৪২২)।

তবু তাঁহার চিত্তলীন ধর্মের নিগূঢ় দিকটি এখানে উদ্‌ঘাটিত— তাঁহার সাহিত্যদর্পণে। এই ধর্ম প্রত্যয় নয়—শৈশবের সঞ্চয়। অজ্ঞাতসারে তিনি সেখানে বন্দী।

'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রমুখ মধুর গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে সমগ্র বাংলাসাহিত্য ও ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের আদিকাহিনী পাঠ করা হয়। এমন মনে প্রাণে হিন্দু, এমন অন্তরে ভারতীয় কবি বিরল, ('স্বাদেশিকতা' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যে কোন ভাবে বা ভাষায় রচনা হোক না কেন, মধুর রচনার প্রতিটি পংক্তি বাঙ্গালীর ধর্মজীবনের কোন না কোন অনুস্মৃতি অবলম্বন করিয়াছে—পটভূমিকা, উদাহরণ, উপমা, উপমেয় সবকিছুই স্বদেশ এবং স্বধর্মপোষক। হিন্দুধর্মের প্রধানতঃ চিত্রসৌন্দর্য ও ভাবালুতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেও তাঁহার ধর্মবিচারের ক্ষেত্রে, অন্যান্য দিককেও সাহিত্য হইতে উদাহরণ উজ্জ্বল করিবে। সমগ্র 'মেঘনাদ বধ' কাব্যখানির অন্তরে গাঁথা বাংলার ধর্ম। বাংলার নারীর পুণ্য আদর্শে অনুপ্রেরিত কাব্য মধুর স্বধর্ম-প্রীতির সাক্ষ্য দেয়।

চতুর্দশপদী কবিতাগুলি সামান্য কয়েকটি ব্যতীত বাংলাদেশের ধর্মবিশ্বাসে পূর্ণ। নগেন্দ্র সোম সত্যই বলিয়াছেন, "তাঁহার নির্বাচিত কবিতগুলি পাঠ করিলে মনে হয় না কবি খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন" (১৪শ অধ্যায়, পৃঃ ২৮৩)। সাহিত্য তাঁহাকে নিজের জন্মার্জিত সংস্কার-ক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। কোন মতেই তাঁহাকে যে অভারতীয় বা অবাঙ্গালী বলা যায় না ('স্বাদেশিকতা' দ্রষ্টব্য)।

আঙ্গিক বা আদর্শ কখনও বা বিদেশ হইতে গ্রহণ করিলেও বঙ্গভাষার সেবা মধুর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি তাঁহার সাহিত্য সাধনার সাঙ্কেতিক চিত্র ও শ্লোকার্ধ প্রতিটি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেন। একদিকে প্রাচ্যনির্দেশক হস্তী ও অন্যদিকে প্রতীচ্যনির্দেশক সিংহ এবং এই দুয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া ভাস্কর কাব্যপ্রতিভা সহস্র-রশ্মি দ্বারা সাহিত্যশতদলকে প্রস্ফুট করিতেছে। তাঁহার কাব্য ও

রচনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন। বাংলার জাগৃতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হোতা মধুসূদন।

প্রাত্যহিক জীবনে মধুসূদন নিজের বংশমর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন—"আর আমি 'দত্ত' কারো ভৃত্য নয়," ('মধুস্মৃতি'-পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪৭০)।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর একদা বিদেশে মাইকেলকে বলেন যে মাইকেল আর্যবংশসম্ভূত নন। মাইকেল ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দেন, "আমার পিতৃপুরুষগণ বর্ণাশ্রমবিহিত কার্য করিয়া সম্মান পুরঃসর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বধর্মত্যাগী ছিলেন না" ('মধুস্মৃতি'-পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪৭২)। বর্ণাশ্রম সম্পর্কে মধুর মত এখানে পাওয়া যায়।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকে প্রাচীন সংস্কৃতনাটকের বিশেষত বর্ণাশ্রম আদর্শের 'ব্রাহ্মণ্য' আবহাওয়া দেখা যায়। চন্দ্রবংশ ও দৈত্যরাজের পরাক্রম এবং ঐশ্বর্যের উর্ধ্বে "ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ" ('শর্মিষ্ঠা', প্রথম গর্ভাঙ্ক) শুক্রাচার্য বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা অনিচ্ছায় সমগ্র শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত। শুক্রাচার্যের অস্ত্র "ব্রহ্মাগ্নি"।

'মধুস্মৃতি'তে পাই মধুর বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন—

"ধর্মসম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম······আপনার কি ধর্ম? তাহাতে মাইকেল উত্তর দেন—ধর্ম সম্বন্ধে আমি কোন কথা কহিতে ইচ্ছুক নহি, তবে তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য এই মাত্র বলিতে পারি যে, Do to others as you wish they should do to you" ('মধুস্মৃতি'-পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪৭২)

হরিমোহন বলেন: "অস্মৎদেশে প্রচলিত হনুমানচরিত্র, কাক-চরিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে মধু অনুকূলতা প্রদর্শন করিতেন।"

('মধুস্মৃতি'-পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪৭২)

মান্দ্রাজে থাকিতে মধু "Hindu Chronicle" নামে একখানি

ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। নাম দেখিয়া মনে হয় হিন্দুত্ব মধুর অপ্রিয় ছিল না। হয়তো তখনই তাঁহার মনে লুপ্ত হিন্দুভাবের উন্মেষ হইয়াছিল।

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীতে তাঁহার তন্ময়তা ও অনুরাগ বিভিন্ন জীবনীকার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দিনযাত্রার চিত্রে দেশীয় উপাদানের চিত্রগুলি আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। সমস্ত কিছুই তাঁহার নিগৃহীত আত্মার স্বধর্ম প্রেম বোঝায়।

খ্রীষ্টীয় 'বঙ্গমিহির' মাসিকপত্রের খৃষ্টান সম্পাদক লিখিয়াছেন ঃ—
"ঢাকা নগরে মাইকেলের অভ্যর্থনার্থ এক সভা হয়, তাহাতে মাইকেল বলেন, 'আমি যদিও ইংরাজি পোষাক পরি, তথাপি আমি বাঙ্গালী, আবার শুধু বাঙ্গালী নই, আমি বাঙ্গাল, আমার বাসস্থান যশোহর'।" ('মধুস্মৃতি', পৃঃ ৩৩৮)

"হিন্দু সমাজের চূড়ামণি ব্রাহ্মণকেও বলিতে শুনিয়াছি, খ্রীষ্টধর্মের আবরণে মধুসূদন একজন 'পূর্ণ' হিন্দু ছিলেন।"

('মধুস্মৃতি', ২০শ অধ্যায়, পৃঃ ৪১৯)

"ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কি মত, তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "ধর্ম সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া মাথাটা ঝামা করিয়া ফেলিয়াছি, তত্রাচ ইহার প্রকৃত রহস্য যে কি, তাহা আজও বুঝিতে পারিলাম না। তিনি নিজে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রবণতা হিন্দুসমাজের দিকেই ছিল। ধর্ম বিষয়ে তাঁহার মতামত কখনও ঠিক বুঝা যায় নাই।"

('মধুস্মৃতি', ২০শ অধ্যায়, পৃঃ ৪১৯)

ধর্মসম্বন্ধে মধুর উক্তি যোগীন্দ্র বসুর 'জীবন চরিত' (উপসংহার, পৃঃ ৬৩২) হইতে উদ্ধৃত করা যাক—

"Christianity is a civilising ageney. I would fight like a crusader if anyone would speak against it, but my real feeling is Hindu."

অতএব মধুসূদনের হিন্দুত্ব মানিয়া লইলে কোন ঐতিহাসিক ভুল হয় না। এখন দেখা যাক এই হিন্দুত্বের কোন কোন ধারা মধুর রচনায় প্রভাব রাখিয়াছিল।

মধুসূদনকে বিজাতীয় ভাবাপন্ন বলিয়া সমালোচনা করা পল্লবগ্রাহী সমালোচকের পক্ষে একপাত্র জল পান করিবার মত সহজ কার্য ছিল। এবং এই সহজ কার্যটি করিতে কেহ কুণ্ঠিত হন নাই। বাল্যাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতী পত্রিকায় এই অপরাধ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের বিশেষত্ব তাহার বিভিন্নমুখী শ্রেণী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন, "যত মত, তত পথ।"

বেদ ও উপনিষদের ধর্ম ভিন্ন ভারতবর্ষে আরও ধর্মমত আছে। ভারতের সন্ন্যাসী-দিক মধু দেখেন নাই। গীতা বা উপনিষদ হয়তো তিনি অনুশীলন করিতেন না। তবে মেঘনাদবধ কাব্য হইতে জানা যায় চণ্ডী তাঁহার বিশেষ ভালভাবে পড়া ছিল। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের একটি দিক দেখিয়াছিলেন, মধুসূদন দেখিয়াছিলেন অন্য দিক। ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বৈরাগ্য ও ত্যাগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক পথে আত্মার সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের তপোবন-জীবন ভিন্ন আরও একটি জীবন ছিল। সেই জীবন রাজসিক। ঐশ্বর্য, বীর্য, ভোগবাহুল্যে ইতিহাস রচনা করিয়া ভারতবর্ষের সেই প্রচুর ঐশ্বর্যশালী, ভোগরাগময় জীবন চন্দ্রবংশের রাজাদের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। কালিদাস ভারতবর্ষের সেই জীবনের চিত্র বার বার অঙ্কিত করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকে সেই রাজসিকতার বর্ণনা, মৌর্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে আসমুদ্রহিমাচলবিস্তৃত সম্রাট ভারতবর্ষের কাহিনী। কাষায় বসন ভারতের একমাত্র প্রকৃত সত্তা নয়। বৌদ্ধ প্রভাবে যে ভারতবর্ষ মুকুট ও দণ্ড পরিহার করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতবর্ষের জয়গান গাহিয়াছেন। কিন্তু, রাজসিক ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও মহিমা ভারতীয় চারণদের বিমুগ্ধ করিয়াছে বহুবার। মধু সেই ভারতবর্ষের

চিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহাকে বিজাতীয় বলা ভ্রমাত্মক। সুবর্ণলঙ্কা সেই ঐশ্বর্যের প্রতিরূপ, রাবণ সেই ঐশ্বর্যের রাজা।

মধুসূদন কি রাম লক্ষ্মণ চরিত্র বিকৃত করিয়াছেন?

মধুসূদন রামচরিত্রের ধর্মীয় রূপটি বিকৃত করিয়া নিজের বিজাতীয় ভাব কোথাও প্রকট করেন নাই। আবহমান বিশ্বাসীর মনে শ্রীরামচন্দ্রের যে রূপ, লক্ষণের যে রূপ, তাহাই 'মেঘনাদে' আমরা পাই। মধুসূদনের হিন্দুত্বের প্রমাণ রামচরিত্রের ধর্মগত সাদৃশ্য।

রামকে মধু নিঃসন্দেহে কোমলচিত্ত, করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, মধু রামকে কৃত্তিবাসের বর্ণসম্পাতে চিত্রিত করিয়াছেন ঃ—

"কমঠ কঠোর ধনু শ্রীরাম কোমল তনু
কেমনে তুলিবে শরাসন?"

বাল্মীকির বীর্যবান রাম কৃত্তিবাসের সুকোমল ভক্তির ঠাকুর নয়। মধুসূদন শৈশব হইতে রামায়ণে অনুরক্ত। কবির কোমল মনে যে রামায়ণবীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহা কৃত্তিবাসের রচনা—বাল্মীকির নয়। অতএব রামের মধ্যে মধুসূদন 'ভক্তির ঠাকুরের' রূপ পান। তিনি হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যে অবিশ্বাসী কলমে রামচরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, বরঞ্চ নিজের দেশের মৃত্তিকায় বিগ্রহ নির্মাণ করিয়াছেন। 'মেঘনাদে'র প্রথম সর্গে রামের যুদ্ধবর্ণনা এবং বীরবাহুবধ ভগ্নদূতের মুখে শোনা যায়। বর্ণনায় রামের বীরত্ব ও শৌর্যের অভিব্যক্তি প্রকট।

"অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ, সরোষে—
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে!"

(ভগ্নদূতের উক্তি—প্রথম সর্গ)

রবিকুলরবি রাঘবের সংগ্রামের পরে যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য ঃ

"—হায়রে, যেমতি
স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষীদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে।"

(প্রথম সর্গ)

কুম্ভকর্ণের নিধনও রামচন্দ্রের হস্তে ঃ—

"প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর পরে,
(— হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?)
কাটিলা তাহার শিরঃ !"—

(সীতার উক্তি—চতুর্থ সর্গ)

"দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী,"—(মন্দোদরীর উক্তি—পঞ্চম সর্গ)

"—পশিলা রণে দিব্যরথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা—
বজ্রধর !"— (সপ্তম সর্গ)

সপ্তম সর্গে দেখা যায় পুত্রহত্যায় ক্ষিপ্ত রাবণের সম্মুখে কার্তিকেয় ও ইন্দ্র গরুড়ের দ্বারা তেজোহীন হইলে—

"হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্যরথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।" (সপ্তম সর্গ)

কিন্তু রাবণ তাঁহাকে বিমুখ করিয়া লক্ষ্মণের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। দাশরথির এই চিত্র শৌর্যমণ্ডিত।

নবম সর্গে চির শত্রু রাবণের উক্তি সারণের মুখে রঘুনাথ-সকাশে শোনা গেল—

"তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য-বীরকুলে
তুমি ! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি।"

(নবম সর্গ)

এই কীর্তিকীর্তন কেবল উদারতা নয়। রাবণচরিত্রে মধু কিঞ্চিৎ উদারতা আরোপ করিয়াছেন, স্বর্ণলঙ্কার প্রবলপ্রতাপ রাজাকে গরিমা দিয়াছেন। অবশ্য রাবণের আত্মন্ত বিশিষ্ট চরিত্র মধু নির্দেশ করিয়াছেন বলিলে সত্য হয় না। চতুর্থ সর্গে রাবণের পূর্ব কাহিনী অবশ্যই উজ্জ্বল নয়। মিথ্যা ছলনায় কুলবধূঅপহরণকারী রাবণ কেবলমাত্র ভগ্নীর দুঃখে দুঃখী হইয়া এ কাজ করেন নাই, যথা তাঁহার আত্মপক্ষসমর্থন, "কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)" ইত্যাদি (প্রথম সর্গ)।

কারণ পরে চতুর্থ সর্গে কবি রাবণচরিত্রে তিলমাত্র আস্থার অবকাশ রাখেন নাই—

"—চিনি তোরে
চোর তুই লঙ্কার রাবণ।
—এই, তোর নিত্যকর্ম, জানি
—নির্লজ্জ পামর
আছে কিরে তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে ?"

(জটায়ুর উক্তি—চতুর্থ সর্গ)

বিভীষণের প্রতি রাবণের ব্যবহার অকথ্য। ধরিত্রী নিজে বলিতেছেন—

"তোর হেতু সবংশে মজিবে—
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,"—

(বসুন্ধরার উক্তি—চতুর্থ সর্গ)।

প্রথম সর্গে লঙ্কাপুরবাসিনী কমলা বার বার রাবণের দুর্মতির কাহিনী বলিয়া তাঁহার সবংশে নিধন চান। আবার শুনি—

"পরম অধর্মচারী নিশাচর-পতি—
—ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ তৃণজ্ঞান করে দেবগণে !
পরধন, পরদার লোভে সদা লোভী
পামর !" (বাসবের উক্তি—দ্বিতীয় সর্গ)

উমা এবং স্বয়ং ত্রিশূলী রাবণের অধর্মাচরণ এবং পাপের হেতু নিধন বলিয়াছেন। রাবণের এই চিত্র মহৎ নয়।

কুলবধূকে অশোককাননে বন্দিনী এবং নির্যাতিতা করা রাবণের পক্ষে গৌরব নয়।

"বিকটা ত্রিজটা—
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে"।—
(সীতার উক্তি—নবম সর্গ)

রাবণ হরণকালে সীতার প্রতি সুরুচিসঙ্গত ব্যবহার দেখান নাই, যথা—

"কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, সরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা।"
(সীতার উক্তি—চতুর্থ সর্গ)

কাব্যটি 'সীতাউদ্ধার' নয় 'মেঘনাদবধ'। অতএব পাদপ্রদীপের আলো পড়ে লঙ্কায়। ধ্বংসোন্মুখ জনের প্রতি পাঠকের করুণা স্বাভাবিক। 'ইলিয়াডে'ও অপরাধী প্রায়াম-কুলের প্রতি করুণায় পাঠক বিচলিত হন। হোমার ইচ্ছাকৃত ভাবে সে করুণার ক্ষেত্র সৃজন করেন নাই। কর্মফলে অধর্মের নিধন, কিন্তু অধার্মিকের সর্বনাশ দেখিয়া করুণা—'ইলিয়াড' ও 'মেঘনাদে' সমরূপ।

রাম কৃত্তিবাসের অবতার, দয়ার প্রতীক রাম। তিনি মৃগয়ায়ও পশুবধে বিরত, তিনি শত্রুর দুঃখে দুঃখী, নরকে পাপীর বেদনায় কাতর।

সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,
দয়ার সাগর নাথ বিদিত জগতে।"
(সীতার উক্তি—চতুর্থ সর্গ)

কিন্তু 'কাকোদর নম্রশির' হইলেও আততায়ীর অব্যাহতি নাই। পত্নীহরণকারীকে ক্ষমা করা ক্ষাত্র্য ধর্ম নয়।

শত্রু মেঘনাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা, প্রমীলার প্রতি আশীর্বাদসহ লঙ্কার দ্বার ছাড়িয়া দেওয়া, মেঘনাদের শেষকৃত্যে সম্মানপ্রদর্শন—সর্বত্রই রামের মহত্ত্ব রাবণ অপেক্ষা অধিক। কোন সমালোচক প্রমীলাকে দ্বার ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে হাস্যকর ভাবে রামচন্দ্রের ভীরুতা দেখিয়াছেন, মহত্ত্ব নয়—

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর, যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে।"

(রামের উক্তি—তৃতীয় সর্গ)

সমালোচক তারপরেই লক্ষ্য করেন নাই হয়তো—"হাসিয়া কহিল মিত্র বিভীষণ" ইত্যাদি।

রামচন্দ্র মিত্রের সহিত পরিহাস মাত্র করিয়াছেন। 'মেঘনাদের' সর্বত্র রামচন্দ্রের শৌর্যকীর্তি উল্লেখিত—হরধনুভঙ্গ, পরশুরামকে পরাস্ত করা প্রভৃতি। লঙ্কাযুদ্ধে তাঁহার বীরত্ব আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। অতএব কুলনারীকে দেখিয়া ভীতি তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। 'মেঘনাদবধে' মধ্যে মধ্যে পরিহাস বা রসিকতা আছে। সুগ্রীবকে—

"······হাসিয়া কহিলা—
লঙ্কানাথ······
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে,
······বিধবাদশা কেন ঘটাইবি—
আবার তাহার মূঢ়? দেবর কে আছে—
আর তার?"

(রাবণের উক্তি—সপ্তম সর্গ)

সুতরাং রামচন্দ্রের রসিকতা কাব্যে বিসদৃশ ঘটনা নয়।

লক্ষণের প্রতি রামচন্দ্রের ভালবাসার সহিত দায়িত্ববোধ আছে—'সুমিত্রা জননী' রামচন্দ্রের হাতে স্বেচ্ছাবনগামী লক্ষ্মণকে গচ্ছিত রাখিয়াছেন। এই দায়িত্ববোধ রামচরিত্রের বিশেষত্ব—নিজের জীবনাধিকাকে তিনি উত্তরকালে প্রজার প্রতি দায়িত্ববোধে বিসর্জন দিয়াছিলেন।

"পূড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে।"

(দশরথের উক্তি—অষ্টম সর্গ)

নিজের সুখে উদাসীন রামচন্দ্র তাই লক্ষ্মণকে সীতাউদ্ধারের ঊর্ধ্বে সাময়িক ভাবে স্থান দিয়াছিলেন (রামচন্দ্রের উক্তি—ষষ্ঠ সর্গ ও অষ্টম সর্গ)। রামচন্দ্র রাবণকে ভয় করিয়াছিলেন নিজের জন্য নয়, লক্ষ্মণের জন্য। কিশোর কুমার লক্ষ্মণ বধূ উর্মিলাকে, মাতা সুমিত্রাকে, রাজ্যসুখকে ত্যাগ করিয়া ছায়ার ন্যায় জ্যেষ্ঠের অনুগামী ; এমন ভাইকে নিজ পত্নীর জন্য বিসর্জন দেওয়া রামচরিত্রের ধর্ম নয়। কোমলচিত্ত রামের তাই চোখে জল। মধু রামকে 'করুণাসাগর' করিলেও দুর্বল বা ভীরু কখনই করেন নাই। "ভিখারী রাঘবের" প্রতি আমাদের মমতাবোধ থাকে—অভিষেকের দিনে অন্যায় ভাবে রাজ্যচ্যুত রঘুবংশতিলককে আমরা ভালবাসি।

নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা সমগ্র পুস্তকটির মধ্যে একমাত্র রঘুবংশের কৃষ্ণতিলক। কিন্তু মেঘনাদকে কি ভাবে হত্যা করা হইবে লক্ষ্মণের নিকটে মায়া তাহা পূর্বে স্বপ্নে প্রকাশ করেন নাই। চণ্ডীর দেউলে লক্ষ্মণ আরাধনা করিলে তবে প্রসন্না চণ্ডী মেঘনাদকে হত্যার প্রণালী বলিয়া দিবেন—এইটুকু রাম বা লক্ষ্মণ প্রথমে জানিতেন। রামচন্দ্র মেঘনাদের হত্যাপ্রণালী অবগত হইলেন যখন লক্ষ্মণকে দেবী এইরূপ বধের আদেশ করিলেন। সমগ্র পুস্তকটির পটভূমিকা দৈবনির্দেশ। ধর্মভীরু নায়ক নায়িকা ধর্মের আদেশে চলিতেছেন। মেঘনাদের

নিধন ব্যাপারে একটু ছলনা ছিল বলিয়া প্রথমেই হয়তো রাম লক্ষ্মণকে দেবদূত বা মায়া স্বপ্নদেবীর দ্বারা তাহা খুলিয়া বলেন নাই। মেঘনাদের মৃত্যুর কলঙ্কজনক ষড়যন্ত্রের জন্য দৈবশক্তি দায়ী, মানুষ নয়। অজেয় যোদ্ধা মেঘনাদের বিনাশ ভিন্ন রাবণের কর্মফল ভোগ হয় না। অথচ সহজপথে মেঘনাদের বিনাশ সম্ভবপর নয়। তাই এত ষড়যন্ত্র আবশ্যক হইল।

মেঘনাদকে দৈববলে বলী লক্ষ্মণ নিধন করিলে সমালোচক অন্যায় দেখিয়া বিচলিত হইলেন। সত্যই ন্যায়বোধ পাঠকের ব্যথিত হয়। কিন্তু, সপ্তমসর্গে লক্ষ্মণকে সম্মুখ যুদ্ধে রাবণ নিধন করিলেও সেখানে প্রচুর দৈব ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। ত্রিশূলী নিজের তেজে রাবণকে পরিপূর্ণ করিলেন। তাহার উপর সহযোগী অমর-বৃন্দের তেজ বিষ্ণুর আদেশে গরুড় হরণ করিল। ফলে লক্ষ্মণের শক্তি গেল। সহায়হীন, রাজ্যহীন, বনবাসী 'ভিখারী রাঘব' আরণ্যক সৈন্য সহকারে প্রবলপ্রতাপ লঙ্কার দ্বারে প্রেয়সীর উদ্ধারে ব্রতী। তাঁহার বিলাপ লক্ষ্মণের মৃত্যুকে অপরূপ কারুণ্যমণ্ডিত করিয়াছে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—"বাল্মীকির রামায়ণে রামের বীরমূর্তি ঠিক কৃত্তিবাসে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস রামকে অন্য রূপ দিয়াছেন—ভক্তবৎসল, তুলসীচন্দনে লিপ্ত বিগ্রহ। ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে প্রেমাশ্রু বহে—কোমলপাণি, বংশীধারীর ভ্রাতা। মূল রামায়ণে রাম বিরাটপুরুষ—দেবতা করালমূর্তি রামভদ্র—শৌর্য রামের গুণ। কৃত্তিবাসে রামের গুণ কমনীয়তা, রাম দেবোপম, দেবতা নহেন। কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর মাধুরিমা দিয়া মূলের অনুবাদ করিয়াছেন—বাঙ্গালীর ঘরের সম্পদ, সৌভ্রাত্য, সীতার ব্রীড়া, কৌশল্যার শোক মূলের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।"

আমাদের মতে মধুর স্বাদেশিকতা ও হিন্দুত্ব তাঁহাকে রামচরিত্রের গঠনে সাহায্য করিয়াছে। রাবণ রাজসিক, রাম সাত্ত্বিক। রাবণ দম্ভের, রাম বিনয়ের প্রতীক। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী চরিত্রে

মধু বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়া সাহিত্যিক উৎকর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাম রঘুকুলশিরোমণি রাজপুত্র ছিলেন—অভিষেকের দিনে সিংহাসনচ্যুত। প্রতি মুহূর্তে কাতর বেদনায় তিনি নিজেকে "ভিখারী রাঘব" বলিতেছেন। তাহাতে দীনতা নাই। বিরাট লঙ্কাপুরীর সম্মুখে বনবাসী, রাজ্যহারা রাজপুত্র নিঃসহায়। তাঁহার ভীতি, তাঁহার দৈবানুগ্রহে সংগ্রাম স্বাভাবিক। রাবণও নিত্য দৈবানুগ্রহ পাইতেন। অধর্মের পথে চলায় তাঁহার ধর্মচ্যুতি ঘটিয়াছিল। রাবণ মায়াবলে সীতাকে অপহরণ করিয়াছিলেন। প্রতিশোধের উদ্দেশে মায়ার সাহায্য নেওয়া রামের পক্ষে ঘৃণ্য অপরাধ নয়। রাবণ শিবের সাহায্য সর্বদা পাইতেন। লক্ষ্মণ দেবতার আদেশেই নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণ করেন। তৎপূর্বে চণ্ডীর দেউলের রক্ষী ত্রিশূলীকে যুদ্ধে আহ্বান করায় তাঁহার বীরত্ব প্রমাণিত। নিজে রাবণ শত্রু লক্ষ্মণের বীরত্ব ব্যাখ্যান করিয়াছেন।

চণ্ডীর প্রসাদ লক্ষ্মণকে অনেক বীরত্বপ্রদর্শন ও প্রলোভনদমনের পরে পাইতে হইয়াছিল।

"শুভক্ষণে গর্ভে তোরে, লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর।—কহিলা আকাশে
আকাশসম্ভবা বাণী··· ··· ···
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলি, সৌমিত্রি—"

(পঞ্চম সর্গ)

লক্ষ্মণ— "বিরূপাক্ষ, দেহ রণ, বিলম্ব না সহে!
... ...
সত্য যদি ধর্ম, তবে অবশ্য জিনিব।"

(পঞ্চম সর্গ)

সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরী।"

(সপ্তম সর্গ)

অতএব লক্ষ্মণচরিত্র বিকৃত নয়। চতুর্থ সর্গে সীতার মুখে লক্ষ্মণের চরিত্রের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে লক্ষ্মণের মহিমা মধু খর্ব করেন নাই ('স্বাদেশিকতা' দ্রষ্টব্য)।

দুঃখের আঘাতে বিপর্যস্ত রাবণ দয়ার পাত্র 'মেঘনাদে'। রাজো-চিত গাম্ভীর্যে তিনি একের পর এক পুত্রশোক বহন করিতেছেন—রাবণের এই চিত্র পাঠককে আকর্ষণ করে। কিন্তু সমালোচকবৃন্দ রাবণকে লইয়া অযথা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন।

"এই দৈবরোষে মহাপুরুষ, মহাবলী পরাক্রান্ত রাবণ, বিনা দোষে নর-বানরের হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।...সীতা লঙ্কাপুরীতে আসিয়াই স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণ সেই অদৃষ্টের বিপাকে সর্বংসহা হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সহ্য করিতে লাগিলেন।"

('বাণী মন্দির', শশাঙ্কমোহন সেন, পৃঃ ২১৩-১৫)

যে কাব্যের প্রায় প্রত্যেক সর্গে রাবণের পাপের উল্লেখ, কর্মফলে ধ্বংস, রাবণরূপ ভারসহনাক্ষমা বসুন্ধরার মুক্তিদানে দেবকুলের মন্ত্রণা, সেই রাবণের যতটা সহানুভূতি প্রাপ্য এবং যতটা সহানুভূতির ক্ষেত্র কবি রাখিয়াছেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী সহানুভূতি এতদিন পর্যন্ত সমালোচক তাঁহাকে দিয়া আসিয়াছেন। রাম লক্ষ্মণকে কবি যতখানি নিষ্প্রভ না করিয়াছেন, সমালোচক তাহা অপেক্ষা অনেক প্রভাহীনতা দেখিয়াছেন। রামের বিনয় 'দুর্বলতা', ও 'সাত্ত্বিকতা' 'ভীরুতা' অপবাদলাঞ্ছিত হইয়াছে। মধুর প্রতি উষ্মা প্রকাশ হইয়াছে যে, দেশের ধর্মগ্রন্থের চরিত্র কেন তিনি বিকৃত করিয়া ধর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? কিন্তু, আমরা দেখিলাম তিনি রাম লক্ষ্মণের চরিত্র-বিকৃতি ঘটান নাই, মানবীয় অনুভূতি শুধু চরিত্রে আরোপ করিয়াছেন। ভবভূতির মহাপুরুষ রামচরিত্রে মধু দেখাইয়াছেন—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি।"

আর আমাদের সমগ্র বেদনাবোধে কি শুধু অধর্মচারী রাবণের উদ্দেশে সঞ্চিত থাকিবে? মধুসূদন কি বৃথা 'অশোকবনং' নামে

চতুর্থ সর্গ রচনা করিয়াছিলেন? মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণোৎসব-মুখরা, আনন্দময়ী লঙ্কাপুরে স্বামীসঙ্গচ্যুতা যে বিষাদময়ী প্রতিমার বেদনায় বৃক্ষলতা বিষণ্ণ, প্রবাহিনী বিলাপিনী, সেই "শোকাকুলা রাঘববাঞ্ছার" জন্য পাঠকের কি কোন অনুভূতি নাই? দুরন্ত চেড়ী 'নিপীড়িতা', 'ঘোর বিপিন' অন্ধকার অশোককাননে অবরুদ্ধা শত্রুগ্রাসে কবলিতা, কুসুম-কোমলা নারীমূর্ত্তি কি লঙ্কাপতি অপেক্ষা অধিক সহানুভূতি-যোগ্যা নন? সরলা স্বামীর সহিত রাজ্যপাট ছাড়িয়া বনগমন করিয়াছিলেন—পাতিব্রত্যের নিদর্শন তাঁহার দুঃখবরণ। হেলেনের মত তিনি স্বেচ্ছায় স্বামী ত্যাগ করিয়া প্রেমিক প্যারিসের বাহুপাশে ট্রয়ের রাজসুখ ভোগ করেন নাই। অন্যায় ছলনায় কুলবধূ হৃতা একথা মধুসূদন সর্বত্র বলিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ মাধুর্য-করুণা দিয়া সীতা চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। শত্রুর দুঃখে দুঃখিনী—

"ভবতলে মূর্তিমতী দয়া

—সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত—।" (নবম সর্গ)

মধুসৃষ্ট জনকনন্দিনীর পুণ্য চরিত্র রাবণের রাজমহিমাকে ম্লান করিয়া দেয়। চিরদুঃখিনী সীতার দুঃখে রাবণকে ক্ষমা করিবার পথ কবি রাখেন নাই। সীতাচরিত্র 'মেঘনাদে' সর্বাপেক্ষা মহৎ। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ এই দেশেরই ধর্মপ্রতীক্।

দেবদেবীগণ লঙ্কার যুদ্ধে সর্বদা পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন এবং নিজেদের মধ্যে কলহ করিতেছেন। হোমারের 'ইলিয়াডে' আমরা অনুরূপ ঘটনা পাই। মধুসূদন এখানে হোমারপন্থী। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তুলনার পরিধি দেখিব। তবে কি মধু পাশ্চাত্য আদর্শে সত্যই আমাদের দেবদেবীর অঙ্গহানি করিয়াছিলেন? কি ভাবে তিনি ভারতীয় দেবত্বকে রক্ষা করেন। তিনি রূপকল্পের মধ্যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছিলেন। আর্য এবং অনার্য বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে দুইটি স্তর। আর্যগণ উপনিবেশ স্থাপনা করিবার পরে সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি স্তরের জন্ম হয়। শ্রীসুকুমার সেন 'বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাসে' বলেন, (পৃঃ ৬০) "আর্যেরা ছিল মনোধর্মী অর্থাৎ চিন্তাশীল, আদর্শবাদী, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, সংযমনিষ্ঠ ও অধ্যাত্ম-পরায়ণ, আর অনার্যেরা ছিল প্রাণধর্মী অর্থাৎ ক্রিয়াশীল, বাস্তববাদী, অজিজ্ঞাসু ভোগলিপ্সু ও দৈবনিষ্ঠ।"

"এক দেবতায়ও পৃথক ছাপ পড়িয়াছে—"শিব যখন মনোধর্মী আর্যের দেবতা তখন তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ সতীপতি উমাধর, আর যখন তিনি প্রাণধর্মী অনার্যের দেবতা তখন তিনি ভোলানাথ, গঞ্জিকা-ধুস্তুরসেবী, নীচ, পরনারীর রূপে আসক্ত হইয়া হীন কর্মে নিযুক্ত।" এইরূপ কৃষ্ণ, চণ্ডী প্রভৃতি দেবতাও ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেন।

আমাদের মতে মধুর দেবতা আর্য, হোমারের দেবতা অনার্য। এখানে মধু ভারতের সন্তান, এখানে তাঁহার নিজস্ব অবদান। তিনি মনোধর্মী আর্য। ধর্ম হইতে সাহিত্যে, ভাষা ও সমাজের উদ্ভব হয়। তাঁহার ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্য হইতে পাই।

> "অধীর হইলা শূলী কৈলাস আলয়ে।
> কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব, সভয়ে অভয়া
> কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে—
> "কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে ?
> মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
> নহে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ
> অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
> আমায়।" চরণযুগ ধরিলা জননী।
> সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জটী,
> "বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে
> রক্ষোদুঃখে ! জান তুমি কত ভালবাসি
> নৈকষেয় শূরে আমি। তব অনুরোধে
> ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে।"

('মেঘনাদবধ'—নবম সর্গ)

ঠিক এইরূপ পরিস্থিতিতে হোমারের জিউস ও জুনোর আচরণ দেখা যাক—

"—And all her passions kindled into flame.
"Say artful manager of heaven (she cries),
Who now partakes the secret of the Skies ?"

(Tran. by Pope. p. 20)

জিউস উল্লিখিত কথা শ্রবণের পরে বলিতেছেন—

"Moon struck ! thou art ever trowing—never I escape
Thy ken······Hold thy peace—my word obey,
Lest, if I come near, and on thee these unconquering hands I lay.
All the gods that hold Olympus nought avail thee here,—to-day"

(Tran. by Collins.)

সমগ্র দেবমণ্ডলীর সম্মুখে জিউসের আচরণ ইতর ও অমার্জিত। দেবদম্পতীর মধ্যে প্রেম নাই। মধুর শিবদুর্গা কত পৃথক ! বিদেশীর মহাকাব্যের মহত্ত্ব মধু অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র, অন্ধ অনুকরণ করেন নাই। তাই আমাদের দেবদেবীকে তিনি হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া চিত্র করিয়াছেন। অনার্যের দেবদেবী গড়েন নাই।

ধর্ম ও পুরাণের কাহিনীগুলি বিভিন্ন দেশে বহু সময়ে প্রায় একরকম উপাদানে গঠিত হয়। অধ্যয়ন-ব্রত মধু গ্রীক দেশের সংগ্রাম-কাহিনী এবং ভারতবর্ষের সংগ্রামকাহিনীর মধ্যে ঐক্য দেখিয়াছিলেন। হয়তো আশ্চর্য ভাবে 'ইলিয়াড', 'রামায়ণ'কে তাঁহার একাত্মা মনে হইয়াছিল। 'মেঘনাদবধ' হয়তো অনুসরণ নয়, আবিষ্কার মাত্র।*

* পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগরের সম্পাদিত রামায়ণে ইলিয়াডের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে রামায়ণের পাত্রপাত্রীর তুলনামূলক নাম তালিকা আছে।

নারীচরিত্র অঙ্কনে মধু হিন্দুত্বের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। শশাঙ্কমোহন সেন 'অন্তর্জীবন ও প্রতিভায়' লিখিয়াছেন—

"প্রমীলার সহমরণ দেখাইয়া খ্রীষ্টান মধু নিজের হিন্দুত্ব প্রমাণ করিলেন।" (পৃঃ ১৩৭)

"রমণীর স্বয়ংশক্তি বা বীরাঙ্গনাতত্ত্বও মধু উপস্থাপিত করেন।"
(পৃঃ ১৪১)

নারীকে শক্তিরূপিণীরূপে বন্দনা ভারতবর্ষ করিয়াছে। চণ্ডীর তন্ত্রে আমরা শুনি ভারতবর্ষের নারীর রূপ শুধু মোহিনী নয়—অসুরদলনী।

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"*

তাই বাংলার কন্যা বিবাহদিনে চণ্ডীর পুঁথি কোলে লইয়া নিজেকে প্রস্তুত করে শক্তি সঞ্চয়ে। মধু চণ্ডী ভালভাবে পড়িয়াছিলেন তাহার বহুল প্রমাণ আমরা পাই। কেবল 'মেঘনাদ' কাব্যেই নয়টি সর্গের মধ্যে আদ্যন্ত চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌনঃপুনিক উল্লেখ কবির প্রীতির সাক্ষ্য।

"সাজিলা দানববালা, হৈমবতী যথা—
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিংবা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর মদে।" (তৃতীয় সর্গ)

"ভীমারূপা, বীর্যবতী চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজ-কুল-অরি—" (তৃতীয় সর্গ)

---

* চণ্ডীর 'যা দেবী সর্বভূতেষু' শ্লোকের উল্লেখ 'মায়াকাননে' আছে।
"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।"
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

পঞ্চম সর্গে 'চণ্ডীর দেউল'-এর প্রোজ্জ্বল বর্ণনা কবির চণ্ডিকার প্রতি প্রীতির সাক্ষ্য। মধু তন্ত্র সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন। শিবদুর্গা বিষয়ক সাধনার বিশেষ মার্গ তিনি শৈশব হইতে গৃহে দেখিয়া আসিতেছিলেন। মধুসূদনের মনে কতকগুলি বস্তু চিরস্থায়িত্ব গ্রহণ করিত আমরা জানি এবং তাঁহার সমগ্র জীবন 'তৎভাবে ভাবিত' হইত। এই সমস্ত 'ফিক্সেসন' তাঁহার মনে আমরণ কাজ করিত। তাইতো খৃষ্টান মধুসূদনের মনে শৈশবের শিক্ষার প্রাধান্য দেখি। চণ্ডী ইত্যাদি তন্ত্রের প্রতি অনুরুক্তি মধুর রচনায় অজস্র পাওয়া যায়। প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব', সুন্দউপসুন্দের ধ্বংস রমণী-রূপলাবণ্য হেতু, চণ্ডীর অনুরণন। 'ক্যাপটিভ লেডি' মধুর প্রথম কাব্য, সেখানেও দেবীপুরাণের কাহিনী বর্ণিত।

বৈদিক ধর্মের কঠোর মূলের প্রতি শৈথিল্যে তন্ত্রের জন্ম হয়।* বিদ্রোহী বাংলা বুদ্ধযুগ হইতে তন্ত্রের মধ্য দিয়া ধর্মবিদ্রোহ

---

* বেদের বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড বা কর্মকাণ্ডকে তন্ত্র বলা হয়। তন্ত্রসাধনা বাহ্যিক, কিন্তু নিয়মগত অভ্যাসে আন্তরিকতা আপনি আসে। বাহ্যিক সাধনার মধ্যে পঞ্চ 'ম'—কার সাধনা। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা প্রধান। গুহ্য অর্থে এই শব্দগুলির মর্মগত অন্য অর্থ আছে। তন্ত্রশাস্ত্র গীতার মত অপৌরুষেয় ভগবানের মুখনিসৃত বেদের বাণী। 'আগম' তন্ত্রে মহাদেবের মুখনিসৃত ও 'নিগম' তন্ত্র উমার মুখনিসৃত বাণী। দক্ষিণাচারীদের শাস্ত্র 'আগম', বামাচারীদের শাস্ত্র 'নিগম'। মোট ১৯২ খানা তন্ত্র আছে। তন্ত্র শাস্ত্র বেদাঙ্গ। "তন্ত্র ছাড়া গতি নাই।" বেদে শূদ্রের অধিকার নাই, তন্ত্রে সকলের সমান অধিকার।

শৈব মন্ত্র, বিষ্ণু মন্ত্র, শক্তি মন্ত্রের দীক্ষা তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত। ভোগ ও যোগ একসঙ্গে তন্ত্রোক্ত ধর্মে হয়। বেদ হইতে জাত কিন্তু বেদ-বিদ্রোহী তন্ত্র বিচিত্র সাধনা মার্গ।

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন চ মৈথুনে
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফল।" ('তন্ত্রসার')

করিয়াছে। এই ধর্মবিদ্রোহের সঙ্গে বিদ্রোহী মধুর স্বভাবজ বিদ্রোহীভাবের সাদৃশ্য দেখা যায় নিঃসন্দেহে। বর্ণাশ্রম ধর্মের উচ্ছেদ সাধন জন্য বৌদ্ধধর্মী রাজা বেন চার্বাকমতবাদী হইয়াছিলেন।

মধু কখনও বেদান্ত বা উপনিষদ প্রভৃতি ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে সচেতন ছিলেন কি না জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ ও আত্মার সাধনা মধুসূদনের ছিল না। ('স্বাদেশিকতা' দ্রষ্টব্য।) রাজসিকতা, মধুর উপজীব্য, বিজাতীয় ভাব নয়। ঐশ্বর্য মধুকে মুগ্ধ করিত, পিতার শিক্ষা ছিল তাই। অতএব সুবর্ণলঙ্কার বর্ণনায়, ও 'ক্যাপটিভ লেডি'তে ঐশ্বর্য বর্ণনায়, কবি বিহ্বল। অথচ রামায়ণ ও মহাভারতে শৈশবের যে জীবন আরম্ভ, তাহার সহজ পরিণতি ছিল বেদ এবং উপনিষদে। শৈশবের শিক্ষা ঠিকই সমাজ ও ধর্মসঙ্গত ছিল। কিন্তু ছাত্রজীবনে হিন্দু কলেজ ও বিজাতীয় ভাব আসিয়া গেল। অতএব অনুশীলনের অভাবে যথাযথ পরিখায় মধুসূদনের ধর্মমত বা হিন্দুধর্ম পরিচালিত হইল না। পিতার এবং সমাজের প্রতি বিদ্রোহ বিদ্রোহী কবিকে ধর্ম-বিদ্রোহে আনিয়া দিল। কবি শালীন বিশুদ্ধ ধর্মের বিপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা-সমর্থন-মূলক তন্ত্র-বাদের পথে চলিয়া গেলেন মানসিকভাবে। বাহ্যতঃ তিনি খৃষ্টান হইলেন। পুরাণ এবং তন্ত্র পর্যন্ত শৈশবের গতি—সেখানেই আবদ্ধ রহিল।

লোকায়ত দর্শনের মধ্যে তাঁহার জীবনবেদে আমরা চার্বাকদর্শনের সাক্ষাৎ পাই। ক্ষণস্থায়ী জীবন উপভোগ কর। উমর খ্যায়ামের মত কবি মধুসূদন সুরার পাত্র হস্তে জগতকে ভোলেন*।

"Money which he said he had never cared to make, meant to him but as an effective means of enjoying

* চার্বাক বেদবাক্যে অবিশ্বাসী, পরলোকে অবিশ্বাসী, দেহাতিরিক্ত আত্মায় অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, সুতরাং তিনি নাস্তিকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য।

বৌদ্ধ ও আর্হৎরা জন্মান্তর স্বীকার করিয়াও বেদবাক্যে অবিশ্বাসী বলিয়া নাস্তিক আখ্যায় আখ্যাত।

life, than which he thought, there was no other use of it. He was a dutiful follower of Charbaka and Epicurus."

(Reminiscence of Michael Modhusudan Dutta by Babu Rashbehari Mukherji)

চার্বাকবাদ 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ'। ভোগ এবং ইন্দ্রিয়সুখের উপভোগ চার্বাকবাদের স্থূল মত। চার্বাকবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে, এবং চার্বাকবাদের মধ্যে ধূর্ত এবং সুশিক্ষিত চার্বাক শ্রেণীভেদ আছে। এই সকল সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসার মধ্যে না যাইয়া আমরা সহজভাবে বলিতে পারি, বৈদিক ধর্ম-বিরুদ্ধ মূলতঃ জড়বাদী, নাস্তিক, বৌদ্ধযুগের যুক্তি-বাদে শক্তিশালী এই অসামান্য চার্বাকদর্শন ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্তার পথপ্রদর্শক।

মধু ভারতের এই দর্শনের অনুগামী। বৈদিক ধর্মে তাঁহার আশ্রয় ছিল না আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু, পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বারে তিনি যাযাবর ভ্রান্ত ভ্রমণশীল ছিলেন না। ভারতেরই বিদ্রোহী চার্বাকদর্শন যুগের প্রতিফলন তাঁহার দিনযাত্রায়। সুখ ত্যাগে নয়, ভোগে। অনাচারও ধর্মের নামে চালানো যায়। জীবন সুখের জন্য। এই মতাবলম্বী মধু তাঁহার ধর্ম পাইয়াছিলেন সুখসাধনায়। এধারে মধু তান্ত্রিকও বটে। বেদান্ত বলেন জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য। তন্ত্র এই দৃশ্যমান জগতকে উপেক্ষা করেন না। তবে, বাৎসায়ন বলিয়াছেন, "ধর্ম্মার্থাকামাঃসমমেব সেব্যাঃ"।

ইন্দ্রিয়সুখের জন্যও প্রস্তুতি আবশ্যক। সেই রকম সর্ব ভোগের জন্যই প্রস্তুতি চাই। মধুসূদন সুখের সাধনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই প্রস্তুতি সাধনা করেন নাই। অতএব চার্বাকদর্শনের জলধিবক্ষে তাঁহার ভরাডুবি।

ধর্মকে স্বাধীন চিন্তায় নূতন রূপ জীবনে দিয়াছিলেন কবি, বিদ্রোহ তাঁহাকে ধর্মবিদ্রোহে আনিলেও জীবনে ভারতীয় দর্শনেরই রূপকল্প

আনিয়াছিল। চার্বাকের মতই তিনি ঈশ্বরকে লইয়া বিব্রত হন নাই। গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের মত জীবন সুখের জন্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পান, আহার, বিলাস এবং ভোগ মধুর জীবনে এই শিক্ষা পিতা রাজনারায়ণ প্রোথিত করিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের জড়বাদী পাশ্চাত্যদর্শনের গুপ্ত প্রভাব তাঁহাকে বৈদিক ও সাত্ত্বিক ধর্ম হইতে একেবারে বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। বাহিরে নিরাসক্ত খৃষ্টান, অন্তরে তান্ত্রিক-প্রবণতা মধুকে বিচিত্র করিল। কিন্তু এপিকিউরাসও বলিয়াছিলেন সুখের জন্যই সৎবৃত্তির অনুশীলন আবশ্যক। অবশ্যই তাঁহার কোন কোন শিষ্যদল ভুল অর্থ আরোপ করিয়া তাঁহার মতে সুখের জন্য শান্তি প্রধান না করিয়া ভোগকে প্রধান করিয়াছিলেন। মধুসূদন এপিকিউরাসের শিষ্য ছিলেন ভুল পথে।

খৃষ্টান ধর্মাগারে মধু কখনও গিয়াছেন কিনা তাহা জানা যায় না। কিন্তু, তান্ত্রিক পূজা, যথা, দূর্গা, জগদ্ধাত্রী, চণ্ডী, কালিকা প্রভৃতির পূজা-মণ্ডপে তিনি ভক্তিভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, জীবনচরিতগুলির পৃষ্ঠায় এমন সাক্ষ্য অনেক আছে। ('বিপ্লব, 'স্বাদেশিকতা' পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য)

মধুর সমগ্র জীবন আমরা উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করিয়াছি। ধর্ম অধ্যায়ে সেই সকল উদ্ধৃতি বাহুল্যবোধে উল্লেখ না করিয়া আমরা স্থূলভাবে তাঁহার জীবনদর্শন সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি। প্রমাণস্বরূপ কবির সমগ্র কাব্য-জীবন পূর্বেই আমাদের নিকটে উপস্থাপিত আছে।

মধু কবি, সেহেতু তিনি বালস্বভাবসম্পন্ন। শৈশব হইতে তিনি জাঁকজমক দেখাইতে অভ্যস্ত। কখনও বা বাহাদুরি লইবার ভাব, তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত পরিলক্ষিত হইত। প্রমথনাথ বিশী কৃত 'মাইকেল মধুসূদন' গ্রন্থে মধুসূদনের চিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে।

"ঐশ্বর্যের পেখম কি করিয়া বিস্তার করিয়া দিতে হয়, তাহা যেন মধুর সহজাত বিদ্যা।" (পৃঃ ৫)

বাহাদুরির জন্য মধু স্বাতন্ত্র্য-অর্জনে উৎসুক ছিলেন বহু সময়। তিনি হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গবিলাসী হইলেও সাহেবিয়ানার স্বাতন্ত্র্যে গর্বিত থাকিতেন এবং সেই স্বাতন্ত্র্য অর্জনে উৎসুক ছিলেন। আহার, বিহার, পোষাক সমস্ত কিছুই এমন স্বাতন্ত্র্যের অভিলাষী। শেষ পর্যন্ত এই বিচিত্র ও ভ্রমাত্মক নকল আভিজাত্য কবি ধরিয়া ছিলেন অঙ্গাঙ্গীভাবে—তৎসহ বন্ধুদের কাছে স্বাতন্ত্র্যের দাবী দ্বারা বাহাদুরি তাঁহার কাম্য ছিল। প্রাণে তাঁহার ফিরিঙ্গিয়ানা মিশিয়াছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

মধু গ্রীক আদর্শে অদৃষ্টবাদকে (ফেট) ভারতীয় সাহিত্যে প্রাধান্য দিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত আছে।

"অদৃষ্টবাদকে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে অবতারিত করিলেন"—

('অন্তর্জীবন ও প্রতিভা', শশাঙ্কমোহন সেন, পৃঃ ৭১)

"কবির পক্ষে জীবনতন্ত্রের এই তত্ত্ব ছিল ফেট অদৃষ্ট—গ্রীক অদৃষ্ট (Fate)।" ('বাণী মন্দির', শশাঙ্কমোহন সেন, পৃঃ ২১৩)

কিন্তু কর্মবাদ ভারতবর্ষে অতিপ্রচলিত মতবাদ। কর্মহেতু ফলভোগ ভারতীয় পরকালতত্ত্বের বিশেষত্ব। জন্ম পর্যন্ত কর্মফল। যেখানে প্রাচ্যের আদর্শ এত ব্যাপ্ত, সেখানে অদৃষ্টবাদের জন্য মধু গ্রীক নাটকের নায়ক বা শেক্সপীয়রের নাটকের শরণাপন্ন অবশ্যই হন নাই। 'প্রাক্তনকে' বিদেশী নাট্যকার বড় করেন নাই, মধু করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে তিনি দেবী রমার মুখে উচ্চারিত করিতেছেন—

"প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে—" (প্রথম সর্গ)

চিত্রাঙ্গদা বলিতেছেন—

"হায় নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।" (প্রথম সর্গ)

স্বয়ং দেবাদিদেব বলিতেছেন—

"পরম ভকত মম নিকষানন্দন,
কিন্তু নিজ কর্মফলে মজে দুষ্টমতি।

—হায় দেবি, দেবে কি মানবে—

কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?" (দ্বিতীয় সর্গ)

সমগ্র গ্রন্থে প্রাক্তনের গতি এবং অধর্মের ফল সম্পর্কে গবেষণা আছে। অতএব ভারতীয় দর্শনকেই মধু ভিত্তি করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবতন্ত্রসার 'গীতায়' শ্রীভগবান জাতির উৎপত্তিকেও পূর্ব জন্ম কর্মফলার্থ বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥"

(অষ্টাদশ অধ্যায়)

প্রাক্তন ফেট নয়—ফেট নিয়তি মাত্র। প্রাক্তন হিন্দুশাস্ত্রে আরও গভীরে। পূর্বজন্মাশ্রিত কর্মফল প্রাক্তন। পরমপণ্ডিত মধু কিন্তু এখানে প্রাক্তনের যথাযথ নিগূঢ় অর্থ ব্যবহার করেন নাই। "কর্মফল" হিসাবেই তিনি 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে প্রাক্তন কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে রাবণের কর্ম পরদার হরণরূপ অধর্ম সেই কর্মফলে রাবণ সবংশে নিধন হইল। রাবণের কলঙ্কময় পূর্ব জন্মের ইতিহাসও সূক্ষ্মভাবে অনুপ্রবিষ্ট আছে কবির মনে, এই সূত্রে চিন্তা করা অসঙ্গত নয়।

বৈষ্ণবীয় তন্ত্রের প্রতি কবির রুচি প্রচুর। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' কিছু ভক্তিসম্পদ বা প্রেমের দীপ্তি ভিন্ন লেখা যায় না। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম বিরহ, প্রেমের ঐতিহ্য সমস্তর মধ্যে মধু প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণপ্রেমের করুণ-মধুর গান তিনি গাহিয়াছিলেন, সেই প্রেম কি তিনি একেবারে অনুভব করেন নাই ?

"মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙ্গা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন।
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।"

('বংশীধ্বনি'—ব্রজাঙ্গনা)

মধুর 'ব্রজাঙ্গনা' বৈষ্ণব কবির ঢংএ রচিত। প্রত্যেকটি কবিতার শেষে ভণিতা লক্ষণীয়। 'ব্রজাঙ্গনা'য় মধুর নিজের নামকে অমর করিবার প্রয়াস উপভোগ্য।

বৈষ্ণবীয় আবেশ 'ব্রজাঙ্গনা'তে পরিলক্ষিত, অভিরাম প্রেমের রঙে শাশ্বত প্রেমিকযুগলের বিরহ মিলন কথা। কিন্তু গভীরতার বিত্ত নাই। অপরূপ কবিকৃতিত্বের বাণীমূর্তি গীতিকবিতাগুলি সাধারণ নরনারীর প্রেমের ও বিচ্ছেদের কাব্য। ললিত মাধুর্যে কান্ত-কোমল শব্দ-চয়ন। কিন্তু, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কোথায়? বৈষ্ণব কাব্যে বিরহের পদাবলীর গুঞ্জন শ্রবণমাত্রে অশ্রু আনে,—

"এই না মাধবী তলে হামারি লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সতত ধেয়ায়,
পিয়া বিনু হিয়া মম ফাটিয়া না যায় কেনে,
নিলজ পরাণ নাহি যায়।"

অথবা

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া,
হামারি বঁধুয়া আনবাড়ী যায়
হামারি আঙ্গিনা দিয়া।"

এতদূর উচ্চগ্রামে মধু উঠিতে পারেন নাই। সুললিত লঘু কবিতার পাখনায় রাধিকার অনন্ত বেদনায় তিনি মানসতীরচারী কবিহংস, তিনি* বিরহ-জলধির উত্তাল তরঙ্গযাত্রী নন।

* "মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের মত সাধক কবি ছিলেন না, সেই জন্য তাঁহার ব্রজাঙ্গনায় বৈষ্ণব কাব্যের আধ্যাত্মিকতার অভাব।"

('কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন', কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১০)

"একালে কেহ কেহ বৈষ্ণব কবির রচনাকে উহার তত্ত্বাংশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে, কেবল মানুষ মানুষীর 'পিরীত কথা' রূপেই বুঝিতে চাহিতেছেন। নব্য বঙ্গের খৃষ্টান কবি মধু উহার পথ প্রদর্শক।"

('বঙ্গবাণী', শশাঙ্কমোহন সেন, পৃঃ ৮২)

কারণ, ভক্তির অভাব নয় যেহেতু মধু খ্রীষ্টান সেহেতু তিনি বৈষ্ণবীয় রসানুভূতিবঞ্চিত, তাহা নয়। তিনি ভক্তিহীন বা হিন্দুধর্ম-বর্জিত নয়। তাঁহার ধর্মের রূপটি ভিন্ন এইমাত্র।*

বিস্ময় জনক এই যে মধুসূদনের রচনায় কোন মিস্‌টিক (Mystic) বা রহস্যবাদের সাক্ষাৎ পাই না। রবীন্দ্রনাথের পরে বিংশ শতাব্দীর আমরা রহস্যময় অধ্যাত্মবাদের সন্ধানে বৃথা মহাকাব্যকারের দ্বারে উপনীত হই। তন্ত্রের ধর্ম এবং বেদের ধর্ম যে সম্পূর্ণ পৃথক।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের এবং ধর্মের সুকঠিন তথ্যকে সহজ গানের মধ্য দিয়া জনগণের প্রাণে গাঁথিয়া দিলেন। বাউল-আউল-দরবেশের পথে তাঁহার যাত্রা উপনিষদের সঞ্চয় হাতে।

"আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
যে জন রহে আমার মনে"—

মধুসূদন বেদান্তদর্শনের পথে গেলেন না, লৌকিক ধর্মের পথে ভ্রমণ করিলেন। মনের মানুষকে বাহির বিশ্বে তিনি দর্শন করিলেন না, মন্দিরে প্রতিমার মধ্যে পাইলেন। বাংলার ব্রতপার্বন, বাংলার দেবদেবীকে কবিতার মধ্যে তিনি রূপ দিলেন।

"সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনী রূপে ভকতের ঘরে,
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী,"

('আশ্বিন মাস', 'চতুর্দশপদী পদাবলী'।

* "মধুর হৃদয়ে তাঁহার রক্তের প্রচণ্ডতাধর্মের মধ্যে স্থিরতা এবং শান্তি বলিয়া বা শম-দম বলিয়া কোন পদার্থ যে ছিল না।"

('অন্তর্জীবন ও প্রতিভা', পৃঃ ৩৫)

তিনি নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির দেখিলেন, শ্রীপঞ্চমীর উৎসবে উল্লাস প্রকাশ করিলেন। 'কমলে কামিনী', 'দেবদোল' ইত্যাদির বর্ণনামুখর হইলেন। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সংস্কার-বর্জিত বাংলার তন্ত্রোক্ত ধর্মের চিত্র অঙ্কন করিয়া মধু বাঙ্গালীর মন্দির-দেউলের বন্দনা গাহিলেন। তিনি দার্শনিক ছিলেন না, ধার্মিক ছিলেন। তাই গভীরতার স্বাদ না পাইয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হই, আমাদের বিক্ষোভের ফল মধুকে বিজাতীয়ভাবসম্পন্ন প্রতিপন্ন করা।

পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে পূজা অর্চনা মধু চোখ মেলিয়া শৈশবে দেখিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাৎগত তাৎপর্য অনুধাবন তিনি করিতে পারেন নাই। যৌবনে তিনি ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই। তবু মাতার শিক্ষা ও রামায়ণ মহাভারত তাঁহার অবচেতন শিশুমনে বাসা বাঁধিয়াছিল, ফিক্সেশন। পৌরাণিক ধর্মকেই তিনি বড় করিলেন, কারণ তিনি প্রধানতঃ পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন। বাংলার নিজস্ব ধর্মের এমন কবি কমই আছে।

উত্তরপাড়ার রাসবিহারি মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন মধু তাঁহাকে শেষ অবস্থায় কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন—

"As your elder, I beg of you never to drink, never to eat ham or beef—these have been my ruin."

(Reminiscences of Michael Modhusudan Dutta)

তিনটি বস্তু হিন্দু ধর্ম-বিগর্হিত বলিয়াই অথবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলিয়াই মধু ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন কি না আমরা জানি না।

ধূর্ত চার্বাকের মত চার্বাকদর্শনের অতিরিক্ত অনুসরণকারী মধু অসংযমের ফলে শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে বিগত হইলেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে ধর্মভাববর্জিত বলিয়াছেন ('জীবন চরিত', উপসংহার)। আমরা তাঁহাকে চার্বাকদর্শনের এবং তান্ত্রিক ধর্মের অতিরিক্ত উৎসাহী

হোতা বলিতে চাই। তাঁহার ধর্ম "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ"। সেইখানেই তাঁহার পতন।

মধুসূদনকে হিন্দুভাবাপন্ন বলিয়া অস্বীকার করিলে, তাঁহাকে খৃষ্টানভাবাপন্ন বলা চলে না। শশাঙ্কমোহন সেন চমৎকাররূপে মধুকে বর্ণিত করিয়াছেন—

"জন্মতঃ ভারতীয় হিন্দু ও শাক্ত এবং স্বীকারোক্ত খ্রীষ্টান হইয়াও মধুসূদন তত্ত্বতঃ গ্রীক এবং প্যাগান।" ('অন্তর্জীবন ও প্রতিভা', পৃঃ ১৯৩)।

কিন্তু, সাহিত্যসৃজনে রুচিবোধের সূক্ষ্মতার পরিচয় দিলেও জীবনে মধু স্থূলভাব বর্জন করেন নাই। গ্রীক অনুসৃতি রচনায় শেষ হইয়াছিল। শালীন বৈদিক ধর্মের সাত্ত্বিক অঙ্গীকারের বিপক্ষে বাংলার বিদ্রোহী সত্তার প্রতিক্রিয়া মধুর রক্তে ছিল।

মধুসূদনের মন পৌরাণিক। পুবাণে উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বেদোক্ত ধর্মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমাদের পুরাণ বেদোক্ত ধর্মের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। কঠিন অথবা জটিল তত্ত্ব সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত এইরকম ব্যাখ্যা সরল পন্থা। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'-তে আমাদের ধর্মাধর্মের উৎপত্তি-বিজ্ঞান পাওয়া যায়। দেবাসুরের যুদ্ধ চণ্ডীর মূলতত্ত্ব। ব্রহ্মশক্তি দেবী চণ্ডী দেবতাদের অধিকার স্থাপনাহেতু অসুরদিগকে ধ্বংস করেন। দেবতাগণ সাত্ত্বিকতা, অসুরগণ তামসিকতা; দৈবী প্রকৃতি ও আসুরিক প্রবৃত্তি। পরমপুরুষ ভগবান বিষ্ণু এবং পরমাপ্রকৃতি হৈমবতী উমা, পরাবিদ্যারূপিনী। দেবীর নেতৃত্বে দেবাসুরের সংগ্রামে দেবতাকুল বিজয়ী হন।

'কেনোপনিষদে' ইঙ্গিত আছে যে, কেবল দেবীর অনুগ্রহেও দেবাসুরসংগ্রামে দেবের জয় হয়।

'চণ্ডীপুরাণে' মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ ও শুম্ভনিশুম্ভবধ তিনটি আখ্যায়িকায় দেবতার অসুরবিজয় বর্ণিত আছে। দেবাসুরের যুদ্ধ অতি প্রাচীন তত্ত্ব সমস্ত দেশের ধর্মগ্রন্থেই উল্লিখিত। বাইবেলে

সয়তানদের সঙ্গে দেবদূতদের যুদ্ধ ও সয়তানের নির্বাসন পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সহিত মারের যুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মে পাওয়া যায়। পারসিক ধর্মগ্রন্থ ও কোরাণেও অনুরূপ যুদ্ধের উল্লেখ স্বীকৃত।

মানুষের দেবত্ববিকাশে বাধার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের রূপকল্প মধু 'মেঘনাদবধকাব্যের' উপজীব্য করেন, 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের মূল স্বরূপ রাখেন। কিন্তু নিজের জীবনে তামসিকবৃত্তি তিনি বিজয় করেন নাই। তাঁহার মধ্যে পৌরাণিক সেই আসুরিক প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ পথে তাঁহাকে চালাইত। পুরাণের কাহিনীর মহত্ব হৃদয়ে গ্রহণ করিলেও তিনি বেদোক্তধর্মের হোতা ছিলেন না। চণ্ডীর ঐশ্বর্যময়ী শক্তিরূপিণী রূপ তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে উন্মোচিত হইয়াছিল। 'পরাবিদ্যার' তিনি অনুশীলন করেন নাই। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা জানিতেন না। কারণ বাহ্যিক ক্রিয়া 'পঞ্চ-ম-কারের' আরাধনা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পন্থা পর্যন্ত যায় নাই।

বেদশাস্ত্রশাসিত ভারতবর্ষে মধু বেদশাস্ত্র পর্যন্ত অবলোকন করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতের সেই লুপ্ত বেদগানের চারণ। কিন্তু পুরাণ বা তন্ত্রাশ্রিত মধুর সাহিত্য অধার্মিকের সৃজন নয়। তিনিও ভারতের প্রকৃত সন্তান।

"কথিত আছে, তন্ত্রোক্ত সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধ হয়েন, তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে সকলই করিতে পারেন। মধুসূদন যে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ইহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তাঁহার মন্ত্রপূত লেখনীস্পর্শে কতই না অভূতপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।"

('কর্মক্ষেত্র', শশিভূষণ সেন,পৃঃ ১৮২)

গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রত্যেক মানুষের মনে অদম্য ইচ্ছাশক্তি আছে। কোন মহৎ কার্যের সংকল্প করিয়া সেই শক্তি অবলম্বনে সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে।*

* "তাঁহার কবিচিত্ত এক দুর্যোগের মধ্যে যোগাসনে সুস্থির—" 'মাইকেল ও বিদ্যাসাগর'—রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, 'দেশ', ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৫৬।

মধুর ধর্ম ছিল সাহিত্য। জীবনের কোন অবস্থাতেই তিনি সে ধর্মচ্যুত হন নাই। সর্বপ্রকার ভোগ বাসনা এই সময়ে তিনি ত্যাগ করিতে পারিতেন। আহার, মদ্যপান, কর্ম, বন্ধুসঙ্গ কোন কিছুই তাঁহাকে এ সময়ে বাধা দিতে পারিত না। তাই তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র ধর্ম সাহিত্য। তান্ত্রিক মধুর জীবনের সফল তন্ত্র-সাধনা এখানেই। সাহিত্য মধুর জীবনবেদ। তিনি সাহিত্যে সফল তান্ত্রিক, জীবনে বিফল তান্ত্রিক। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও তিনি শাস্ত্র-পাঠে বিদ্যার নিয়োগ করেন নাই, সাহিত্য-পাঠেই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম তাঁহার উপজীব্য ছিল না, অধ্যাত্মবোধে তাঁহার জীবনে জাগ্রত হয় নাই। শৈশবে পাওয়া পৌরাণিক যুগের ঊর্ধ্বে বৃহৎ দিগন্ত সীমায় এই কবির বন্দী আত্মা মুক্তি পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ সেই ঊর্ধ্বলোকের যাত্রী। ধর্ম তাঁহার জীবনে বাল্য হইতে অনুশীলনের মধ্য দিয়া দেখা দেয়, উপনিষদের বিরাট ধর্ম। ভারতবর্ষের দর্শনকে তিনি গানের মধ্য দিয়া বাংলার মাঠে ঘাটে ছড়াইয়া দিলেন। বাউল-আউলের মত সহজ প্রাণের ভাষা তাঁহার অবলম্বন হইল। হৃদয়ের ক্ষেত্রে তিনি মহারাজ, মধুসূদন ভূম্যধিকারী। পৌত্তলিকধর্মের দেবদেবীর মধ্যে সীমায়িত মধুর সাহিত্য। কপোতাক্ষ তীরের ধর্মবিশ্বাস অনুশাসিত অবচেতনের প্রকাশ। অধ্যাত্মবাদের দার্শনিক রূপের নির্লিপ্ত উপাসক তিনি নন।

মধুসূদনের সাহিত্যযোগীরূপটি বিংশ শতাব্দীর অনেকের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে সাধকের মত তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন আত্মার সাধনায় নয়, কবিতার সাধনায়।—

> "মনের মন্দিরে তুমি পূজ্য নিরন্তর,
> ভগীরথ সম তুমি নির্ভীক চারণ।"

'মাইকেল মধুসূদন দত্ত'—'কথাশিল্প' মাঘ, ১৩৬২।

উত্তর খণ্ড

১৩৬১

সাহিত্য সৃষ্টির মুখবন্ধ

"এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসমসাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমার, মিলটনরচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেন নি। —ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে সাবধানে ঘটল না, শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বাহন করে নিয়ে এলেন, এক মুহূর্তে ঝড়ের পীঠে—প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙ্গে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়," "স্বদেশী কাব্যের মনোহরণের শক্তি নিঃশেষ", "জাগ্রত রসপিপাসা" নিজ অসম্পূর্ণ মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই "সাহিত্য সঙ্কটের" সময়ে মধু অসাধ্য সাধন করিলেন।" মধু ইউরোপীয় সাহিত্যকলার মূল আদর্শটি···তাহার সেই রসমাধুর্য, কল্পনাভঙ্গি এমন কি সুরটি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ও ছন্দে মিলাইয়া দিলেন। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (পৃঃ ২৬৪-২৬৫, মোহিতলাল মজুমদার)।

"বাল্মীকি হোমর সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী,
অকাল কোকিল মরুতল তরু
অনীর দেশের বারি।"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"I have finished the First Book of Meghnad··· It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in this present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done······"

(রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্র)

সাহিত্য সৃষ্টির নামায়ন

এখানে আমরা বিভাগীয় ভাবে মধুসূদনের রচনাবলীর উল্লেখ করিব। 'জন্মমৃত্যু' সূত্রে আবদ্ধ তাঁহার বাস্তব জীবন। সাহিত্যজীবন গ্রন্থের তালিকা-সূত্রে আবদ্ধ।

ইংরেজি রচনা—(প্রথম অধ্যায়)

হিন্দু কলেজ এবং বিশ্‌প্‌স্ কলেজে অধ্যয়নের সময়ে মধুসূদন কবি হইয়া ওঠেন। বন্ধু-বান্ধবকে লেখা চিঠিপত্রেও এই সমস্ত কবিতার প্রাচুর্ভাব দেখা যাইত। তিনি ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখিতেন এবং ইংরেজি ভাষায় মহাকবি হইবার আশা রাখিতেন। তখন অধ্যাপক রিচার্ডসন, স্বর্গীয় ডিরোজিও হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজি গীতিকারদের আদর্শে মধু ছোট ছোট কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ কবিতা প্রেমের কবিতা। বিদেশী কবির অনুকরণ ভিন্ন বিশেষ কোন সারবস্তু কবিতাগুচ্ছে পাওয়া যায় না। 'নীল নয়না', দুগ্ধফেননিভা যে কোন ললনার উদ্দেশে উৎসারিত বিরহমিলনগাথার মধ্যে ভবিষ্যৎ মহাকবির চিহ্নও মেলে না।

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি সতেরো আঠারো বৎসর বয়সে মধু জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleaner, Literary Gazette, Literary Blossoms, Commet প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরেজি কবিতা লিখিতেন। বিদেশী পত্রিকায়ও তিনি মধ্যে মধ্যে কবিতা পাঠাইতেন।

এই সমস্ত কবিতা 'Extemporary Songs', 'Sonnets', 'Verses', 'Epistles in verses', 'Songs', 'Stanzas', 'Extemporary sonnets', 'Lines', ইত্যাদি শিরোনামার নীচে প্রকাশিত হইত। 'To' শব্দটি শীর্ষে রক্ষিত বহু কবিতা অনামিকার

উদ্দেশে পাওয়া যায়। 'To Banee Madhab Bose', 'To G. D. B.' (এ সকল কবিতা বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা), 'To A Lady' ইত্যাদিকে সোজাসুজি উদ্দেশ করিয়া অনেক কবিতার স্বাক্ষর আছে। 'Acrostic'ও দেখা যায় (১৮৪১—১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) কোন বিলাসী, লঘুচিত্ত ধনী তনয়ের এই বিদেশী ভাষার রচনাগুলি বাঙ্গালী কিশোরের পক্ষে অবশ্যই গৌরবজনক। কিশোরের ভাষা ও ছন্দোজ্ঞান মনে প্রশংসা জাগায়। কবি বার্ণস বায়রণ, শেলী, কীটস্, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, ড্রাইডেন, টেনিসন, কুপার প্রভৃতি ইংরেজি গীতিকারদের প্রকট প্রভাব এই অধ্যায়ের কবিতায় লক্ষণীয়।

কবিতাগুলি সংগ্রহ সম্ভবপর নয়। 'মধুস্মৃতি' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোম গৌর বসাকের পুত্র লালবিহারী বসাকের নিকট হইতে কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি এবং স্বয়ং প্রকাশিত রচনা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে মধুসূদনের ইংরেজি কবিতা অতি প্রচুর ভাবে উদ্ধৃত আছে। তখনকার একমাত্র বাংলা কবিতা 'বর্ষাকাল' ও 'হিমঋতু' (acrostic) বন্ধুপ্রবর গৌরের অনুরোধে লিখিত। দীক্ষার সময়ে গীত Hymnটি প্রসিদ্ধ।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে 'Literary Gleaner' পত্রিকায় মধুর অসমাপ্ত খণ্ড কাব্য, 'King Porus—A Legend of Old' ডিরোজিওর 'Fakir of Jangeera' এর প্রভাবান্বিত রচনা প্রকাশিত হয়।

মধুর অসমাপ্ত 'অপ্সরী' খণ্ডকাব্য গৌরবাবুর সংগ্রহে ছিল। মুরের 'Peri'-এর অপ্সরী হওয়া আশ্চর্য নয়।

মধুর ইংরেজি রচনার প্রথম অধ্যায় বাংলাদেশে শেষ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হইল মাদ্রাজে।

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

মাদ্রাজে প্রথম অধ্যায়ে সাংবাদিকতার লেখা দেখা যায়। অর্থের জন্য মধু বিভিন্ন পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতেন (Madras

Circulator & General Chronicle, Madras Spectator, The Hindu Chronicle, Athenaeum তন্মধ্যে প্রধান) সুলেখক ইংরেজের ন্যায় সুলিখিত ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার সহিত মধু সাংবাদিক প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন।

Athenaeum-এর প্রধান সম্পাদক তিনি কিছুদিন ছিলেন এবং Hindu Chronicle-এর প্রকাশ ও সম্পাদনা করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজে মধুর প্রতিভার জাগরণ প্রথম দেখা যায়। ইংরেজি ভাষায় হইলেও ভবিষ্যৎ মহাকাব্য রচনার আভাস তাঁহার ইংরেজি 'Captive Ladie'-তে পাওয়া গেল। Timothy Pen poem, Esq. ছদ্মনামে মধুর ছোট বড় ইংরেজি কবিতা বিভিন্ন পত্রিকার 'Poets Corner'-এ প্রকাশিত হইত। Circulator পত্রিকায় অধিকসংখ্যক কবিতা স্থান পায়। মান্দ্রাজের কবিতাগুলি ১৮৪৮-১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কবির সেখানে স্থিতিকালে প্রকাশিত।

প্রেম-বিরহ-উৎসারিত ছোট কবিতা রচনার অবকাশে মধু তাঁহার প্রথম কাব্য 'The Captive Ladie', (Madras Advertisers' Press-1849) প্রকাশিত করেন। সংযুক্তা এবং পৃথ্বীরাজের কাহিনী ইংরেজি কাব্যখানির বিষয়বস্তু। বায়রণ, মূর ও স্কটের কাব্য-সৌরভে সৌরভাকীর্ণ। এই সঙ্গে 'Circulator' পত্রে প্রকাশিত চারভাগ কিন্তু অসমাপ্ত ক্ষুদ্র খণ্ড কাব্য 'Visions of the Past' গ্রথিত হয় পুস্তকাকারে। Calcutta Review 'Captive Ladie'-কে 'A Metrical Tale' বলিয়াছেন। বায়রণের Dream কবিতার সঙ্গে 'Visions of the Past'-এর মিল সমালোচক দেখিয়াছেন উভয় কবির আধ্যাত্মিক স্বপ্ন-দেখার মধ্যে।

ক্যাপটিভ লেডি, অধুনা দুর্লভ এই কাব্যখানির একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ অতুলচন্দ্র ঘোষ 'অবরুদ্ধা' নামে করিয়াছেন। সচিত্র শিশিরের ২য় বর্ষে শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৩২) এই অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল। ছন্দ এবং ভাব অনুবাদকার যথাযথ রাখিতে চেষ্টা

করিয়াছেন, বলিয়াছেন। আমরা এক মত নই। বারোশত লাইনে দুই সর্গের কাব্যখানি মধুসূদনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসাবে আদৃত। কাব্যখানি মেঘনাদবধ কাব্য ব্রজঙ্গনা কাব্যের কবির প্রথম উন্মেষ দেখায়। বারো বৎসর পরে প্রকাশিত মেঘনাদ কাব্যে ক্যাপটিভের ভাবধারা কোন কোন স্থানে অবিকল যুক্ত হইয়াছে।

সাদির পারসীক ওডসের অনুবাদ এবং 'Sonnets', 'Disjecta Membra Poetae' ইত্যাদি শিরোনামার নীচে 'Timothy' নামের অন্তরালে মধুর গীতিকবিতা আত্মপ্রকাশ করিত। মধুর মাদ্রাজে ইংরেজি রচনার কিছু উল্লেখ 'স্বাদেশিকতা' পরিচ্ছেদেও আলোচিত হইয়াছে।

'Anglo-Saxon and the Hindus' নামে একটি খণ্ড কাব্য এবং আরও দুই তিনখানি ক্ষুদ্র খণ্ড কাব্য তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। কিন্তু পৃথক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া তাহারা লুপ্ত। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মধু ইংরেজি অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'রিজিয়া' নামে একখানি ইংরেজি নাটক লেখেন। 'রিজিয়া' ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই।

ইহার পরে মধু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তাঁহার প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টা কলিকাতায় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। এই উজ্জ্বল মুহূর্ত কবির সাহিত্য জগতে নিঃশঙ্ক পদক্ষেপের সূচনা (১৮৫৮)।

ইংরেজি রচনার পরিসরে বিদায় লইয়া মধু বঙ্গভাষার সেবক হইলেন। এতদিনে তিনি আপন পথে পদচারী হইলেন।

আবার মধুর ইংরেজি রচনার আভাস দেখা যায় 'শর্মিষ্ঠার' অনুবাদ ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অনুবাদের মধ্যে। স্বরচিত 'তিলোত্তমা'ও তিনি অনুবাদ করিতেছিলেন। এক অনুবাদের সঙ্গে মধু ('রত্নাবলী') বাংলা সাহিত্যে পদক্ষেপ করিলেন।

করিলেন স্বাধীন ব্যবহারজীবী হইবার আশায়। বাংলা সাহিত্য হইতে বিদায় তখনই। পরে কোনদিন প্রথম পর্যায়ের সমকক্ষ রচনায় মধু সার্থক হন নাই।

উত্তর জীবনে ইংরেজি ভাষায় কাব্য লিখিবার ইচ্ছা মধুসূদন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে প্রচারের নিমিত্ত ভারতের গৌরব সীতা চরিত্র অবলম্বনে একখানি ইংরেজি কাব্য তিনি রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সীতার বনবাসে কাব্যের সূচনা হইয়াছিল। দুই তিন শত পংক্তি রচনার পর তিনি রচনাকার্য পরিত্যাগ করেন। এই কাব্য 'কুইন সীতা' নামে য়ুরোপ প্রবাস কালে সূচিত হয়। এই সঙ্গে অন্যান্য দুই একটি ইংরেজি কাব্যও তিনি আরম্ভ করেন।

'রিজিয়া' নাটককাব্য ইংরেজিতে মধু লিখিয়া বিলাইয়া দিয়াছেন। জীবনের শেষদিকে রিজিয়া কাব্যের পদক্ষেপ হইলেও রিজিয়ার গল্প কবিকে আরও কয়েকবার উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

পত্র সাহিত্য—মধু অজ্ঞাতসারে আরও একটি সাহিত্যের সৃজন করিয়াছিলেন। অসংখ্য পত্র তিনি বন্ধুদের লিখিয়াছিলেন। পত্র-গুলির ভাষা ইংরেজি (একটি কি দুইটি ব্যতীত) অতি প্রাঞ্জল, ইডিয়ামঘেঁষা ভাষায় পত্রগুলি লিখিত। সহজ মনের অনাবৃত সরস প্রকাশ। যে রঙ্গ ব্যঙ্গ প্রহসন মধুর রচনাবলীর মধ্যে প্রচুর দৃষ্ট হয় না, সেই রঙ্গ এই সকল পত্রের মধ্যে মধ্যে ঝলসিত। যথা—

"Mind, you all broke my wings once about the farces ; if you play a similar trick this time I shall forswear Bengali and write looks in Hebrew or Chinese !"

(কেশবকে পত্র 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা কালে)

"Besides Mrs. Radha is not such a bad woman after all"

(রাজনারায়ণকে পত্র ১৮৬১)

পত্রের বিভিন্ন অংশে তাঁহার প্রচুর রঙ্গবোধ দেখা যায়। বিভিন্ন ইংরেজ কবির প্রথায় মধু পত্রে তাঁহার প্রতিটি সাহিত্য-কর্ম উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। আত্মজীবনী না রাখিলেও মধু পত্রাবলীর পরিধিতে নিজের জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজি ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় মধু অসংখ্য কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ফরাসী, ইতালীয় ভাষায তাঁহার রচনা এবং কবিতার সাক্ষ্য আছে।

বাংলা রচনা—

প্রথম পর্যায় 'শর্মিষ্ঠার' (১৮৫৯) প্রস্তাবনায় উদাত্ত নূতন সুর প্রতিধ্বনিত। পণ্ডিতদের সংস্কৃত নাটকের বিধান অমান্য করিয়া বিদেশী ধরণে নাটক লিখিবার অভিলাষ নাট্যকারের প্রকাশ পায় গৌরকে লিখিত ১৫শ সংখ্যক পত্র হইতে ('জীবনচরিত')। বসন্তের বর্ণনা অথবা স্তোত্রের গতানুগতিক মুখবন্ধ অগ্রাহ্য করিয়া নাট্যকার দেশের অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন। শর্মিষ্ঠার আখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত। যে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের দাসত্ব অমান্য করিয়া প্রতীচ্যের নাটক-ভঙ্গি এদেশে প্রতিষ্ঠার জন্য শর্মিষ্ঠার অবতারণা, সর্বতঃ সেই সংস্কৃত নাটককে মধু পরিহার করিতে পারেন নাই।

কাহিনী বা প্লটের বিন্যাস, নাটকের অঙ্গে পয়ার বা ছন্দকবিতার প্রচলন ইত্যাদি সংস্কৃত নাটকের প্রভাব চিহ্নিত করে। দীর্ঘ কৃত্রিম বর্ণনাদি 'রত্নাবলী' নাটকের ভাষানুস্মৃতি। কোথাও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম', 'রঘুবংশম', ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিতমের' সুপষ্ট অভিব্যক্তি। মধুর দ্বিতীয় অবদান দুইখানি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা'? এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। প্রথম বাংলা প্রহসন মধু আনিলেন সাহিত্যে। প্রাচীন নাটকের মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক কয়েকটি আখ্যান অবশ্য ছিল, যথা 'আলালের ঘরের দুলাল', 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। মধু নাটক ও আখ্যানগুলি হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করেন। এখানে আগাগোড়া দেশী সামগ্রীর

সমারোহ। কিন্তু সামাজিক অনাচারের চিত্রণে তাঁহার প্রবণতা মলেয়ারের দিকে।

তাহার পরে 'পদ্মাবতী' নাটক, (১৮৬০)। পদ্মাবতীর প্রথমাঙ্কের দৃশ্যগুলি গ্রীক পুরাণোক্ত আপেলের জন্য দেবীদের বিবাদের উপর গঠিত। শচী, রতি, মুরজা যথাক্রমে Hera, Aphrodite, Pallas Athena, এবং ইন্দ্রনীল পারিস। সোনার আপেল এখানে কনকপদ্ম। কিন্তু 'পদ্মাবতী' অবৈধ নায়িকা হেলেন নয়, বরঞ্চ 'উষার' সঙ্গে মিল আছে। অনিরুদ্ধকে উষা শ্রীকৃষ্ণের লীলায় স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। এখানে রতির ছলনায় পদ্মাবতী প্রথমে ইন্দ্রনীলকে স্বপ্নে পান। তারপর চিত্র দেখিয়া প্রিয়কে চেনা 'শ্রীমদ্‌ভাগবতে'র উষা আখ্যায়িকার অনুরূপ। নাটিকাটি শেষের দিকে সংস্কৃত আঙ্গিক গ্রহণ করিয়াছে। পাত্রপাত্রীর সম্বোধনের ভাষা, স্বস্তিবাচন (নারদকৃত), সংস্কৃত নাটক লিখনভঙ্গির ন্যায়। কঞ্চুকী, কলি ও নারদের ভাষনে অমিত্রছন্দের আদি ব্যবহার হয়। গ্রীক পুরাণের ছায়ায় গ্রীক আঙ্গিকে নাটক লিখিত। মধু পত্রে লেখেন—"I shall look to the great dramatists of Europe for models—In the first act you have the story of the golden apple Indianised".

(রাজনারায়ণকে পত্র—১৮৬০)

কিন্তু সংস্কৃত নাটকের প্রভাব দৃশ্যমান, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের অনুকরণেও 'পদ্মাবতীর' অংশ রচিত। " 'পদ্মাবতীর' আখ্যায়িকাটি. যদিও গ্রীক পুরাণ হইতে পরিগৃহীত, তথাপি মধু তাহাকে এরূপ হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অনুকরণাংশও মৌলিক বলিয়া মনে হয়" (জীবন-চরিত পৃঃ ২৪৯-৫০)। 'পদ্মাবতীর' মধ্যে মধ্যে অমিত্রছন্দ কদাচিৎ ব্যবহারের দ্বারা মধু বাংলায় প্রথম অমিত্রছন্দের ব্যবহার দেখান।

পরবর্ত্তী গ্রন্থ মধুসূদনের যশের চিরস্থায়ী সোপান, বাংলায় প্রথম

অমিত্রছন্দের বিবর্তন। এই ছন্দে তিনি 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য লেখেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষরের এইভাবে জন্ম হইল।*

তবু মধুর কীর্তি নাটকে, প্রহসনে নয়; গীতি কবিতায় নয়, যদিও তিনি তাহাদের আদি লেখক। তাঁহার কীর্তি মহাকাব্য ও অমিত্রাক্ষর। অতএব খণ্ডকাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব' আমাদের মনোযোগের যোগ্য।

'তিলোত্তমা'য় 'মেঘদূতম্'-এর ছায়া দেখা যায় 'কুমারসম্ভবম্'-এর কবিস্বপ্ন লক্ষিত হয়। কীট্‌সের 'হাইপেরিয়ন' কাব্যের সঙ্গে, মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লস্টের' সঙ্গে এই কাব্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত ঃ

"The ideas are no doubt borrowed and Keats and Shelley and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put into requisition, but as you very justly say, "Whatever passes through the crucible of the auther's mind receives an original shape." ('জীবনচরিত, পৃঃ ২৯৪) 'তিলোত্তমায়' শৃংগাররসাত্মক বর্ণনার হেতু মধু বলেন—
"Perhaps that is owing to a partiality for Kalidas."

(রাজনারায়ণকে পত্র)

* "ইহার রচনা প্রণালী অপর সকল বাঙ্গালীর কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন ও অন্তযমকের পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরেজ পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়।"

'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-শকাব্দ—১৭৮০
নূতন গ্রন্থের সমালোচন (৬০ খণ্ড, পৃঃ ১৮৯)

"It is also written on classical models"

(রাজনারায়ণকে লিখিত ১৭নং পত্র, 'জীবনচরিত')

যোগীন্দ্র বসুর 'জীবনচরিতে' তিলোত্তমার উপর বিভিন্ন কাব্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা আছে। অতএব বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইলাম।

'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)—'শ্রেষ্ঠ রচনা' পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'—(১৮৬১) 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে চিহ্ন পড়িয়াছে দেশীয় কবির। স্বাভাবিক, কারণ বৈষ্ণবীয় ধর্ম ভারতবর্ষের নিজস্ব ধর্ম।

"উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রায় সব কবি এবং মধ্যভাগের অনেক কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। এমনকি মাইকেল মধুসূদন দত্তও নয়। মধুর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বৈষ্ণব পদাবলী অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের গানের প্রভাব কিছু কম নয়।"

(সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৪ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস')

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব নবীন যুগের দ্যোতক। বিশাল মহৎ পদাবলী সাহিত্যের জন্ম হইল এবং পদ-সংগ্রহ পাঠকের হাতে আসিল।

১৮শ এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দশ পনেরো বৎসরের মধ্যে পদাবলী সঙ্কলিত হইল।

বৈষ্ণবসাহিত্য মহাকবির প্রাণ স্পর্শ করিল। তিনি পাঁচালি ধারার সঙ্গে কাব্য-রচনায় গীতিকবিতার ধারা যোজনা করিলেন।

ইতালীয় মিশ্রছন্দের আদর্শে মধু 'ব্রজাঙ্গনায়' এক নূতন মিশ্রছন্দ সৃজন করিলেন—"I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it."

অমিত্রাক্ষরের মত নূতন মিশ্রছন্দও মধুর প্রবর্তনা।*

ভাবসম্পদে দেশীয় কবি-প্রভাবের মধ্যে পদাবলী সাহিত্য,

* "কোন একটা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাষণ, সম্বোধন বা উচ্ছ্বাসও। নানা ছন্দে বা একেবারে স্বাধীন ছন্দে (Verse libers) উচ্ছ্বাসই 'ওডের' বিশেষত্ব। বর্তমান কালের পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'ওড' এখন নানামুখী গতি এবং প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। বঙ্গভাষায় মধু ব্রজাঙ্গনার রাধা উক্তি রূপে 'ওডকে' (Ode) অবতরিত করিলেন।"

'বাণীমন্দির', শশাঙ্ক মোহন সেন।

ভারতচন্দ্র, সংস্কৃত 'পদাঙ্কদূতম্'* এবং 'মেঘদূতমের' প্রভাব আছে। ভারতচন্দ্রের কবিত্ব সম্পর্কে উচ্চ ধারণা না থাকিলেও মধু ভারতচন্দ্রের রচনার শ্রদ্ধাশীল পাঠক ছিলেন। য়ুরোপের পত্রাবলীতে ভারত-চন্দ্রের কবিতার একাধিক উদ্ধৃতি আছে। 'বিদ্যাসুন্দর' মধুর অতি পরিচিত কাব্য।

ভারতচন্দ্রের গান :—

"নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্র-ধনু
পীতধড়া বিজুলীতে ময়ূরে নাচাও হে,
নয়নচকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে।"

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনায়' দেখিতে পাই—

"কি শোভা ধরয়ে জলধর
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে।
স্বর্ণবর্ণ শক্রধনু রতনে খচিত তনু
চূড়া শিরোপর।
হায় ও রূপমাধুরী, কার মন নাহি চুরি
করে রে, শিখিনি!" ('ময়ূরী')

'মেঘদূতমে'র ১৫শ শ্লোকের তুলনা দেখা যাক :—

"রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তা-
দ্বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।"

'ব্রজাঙ্গনায়' প্রত্যেকটি গানের শেষে মধু ভণিতা দিতেছেন। কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচনা করেন। তাঁহারা ও অন্যান্য কবি

* পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম 'পদাঙ্কদূতম্' কাব্যের রচয়িতা

মালাধর বসু ভাগবত অনুবাদ করেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে। কৃষ্ণদাস এইরূপ ভণিতা দিতেন। 'ব্রজাঙ্গনার' নূতন সমালোচনা-ক্ষেত্র আছে। অন্যথায়, এ পরিচ্ছেদে আমরা মধুর কোন পুরাতন, বহু আলোচিত গ্রন্থ সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহী হইব না।*

মধুসূদনের পুনর্বার নাটক রচনার ইচ্ছা হইল। মহাভারতের সুভদ্রা উপাখ্যানের দুই অঙ্ক অমিত্র ছন্দে লিখিয়া তিনি কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখিতে দিলেন। অভিনয়ের উপযোগী নয় বলিয়া সেই নাটকের উপাখ্যান ত্যক্ত হইল। তারপর, সুলতানা রিজিয়া চরিত্রের কাঠামোতে মধু 'রিজিয়া' নাটক লিখিতে সুরু করেন এবং নাটকের ছক দেখান। হিন্দু দর্শকের কাছে বিষয়বস্তু প্রীতিকর হইবে না আশঙ্কায় তাহাও পরিত্যক্ত হইল। অবশেষে টডের 'রাজস্থান' হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া মধু 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করিলেন, (১৮৬১)।

শেক্সপীয়র যেমন স্বদেশীয় পুরাতন কাহিনী গ্রহণ করিতেন, মধু সেই পদাঙ্কে 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করেন। শেক্সপীয়র যেমন প্লটার্ক (Plutarch) হইতে ঐতিহাসিক নাটকের মালমশলা সংগ্রহ করিতেন, মধু তেমনি টড্ হইতে ইতিহাসের তথ্য গ্রহণ করিলেন।†

বাংলাভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত ও ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী।' এই নাটকে শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

* 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের জন্য মধু 'বিহার' নামক একটি সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মাত্র কয়েকটি পংক্তি রচনার পরে তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় মধু ত্যাগ করেন। এই সময়ে সাংসারিক অনটন, পত্নীর পীড়া, মানসিক চঞ্চলতা মধুকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল।

† শ্রীসুকুমার সেন বলেন যে 'কৃষ্ণকুমারী' সাক্ষাৎভাবে টডের 'রাজস্থান' হইতে গৃহীত নয়। ১৮৫৭, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' প্রবন্ধটি মধুর সাক্ষাৎ উপজীব্য বলিয়া তিনি মনে করেন ('বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩)।

মধুর সমসাময়িক পত্রাবলীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে শেক্সপীয়রের উল্লেখ আছে।

শেক্সপীয়রায় উচ্চাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটকের প্রথায় মধু কোথাও 'কৃষ্ণকুমারীর' মধ্যে কমিক দৃশ্যের অবতারণা করেন নাই, তবে মধ্যে মধ্যে সরস উক্তি বিকীর্ণ করিয়াছেন। নাটকটিকে তিনি 'romantic tragedy' (১৫শ পত্র—'জীবনচরিত') বলিয়াছেন। শেক্সপীয়রের 'King John'-এর Bastard এখানে বলেন্দ্র সিংহ (৩১শ পত্র, জীবনচরিত)। সাধারণ ব্যক্তির মুখে চলিত ভাষা দেখা যায় শেক্সপীয়রের নাটকের সাধারণ ব্যক্তির মত। যথা, "রক্ষক—মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্ছা যাচ্যেন। ভগবান, শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচ্যেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠছে না।···দেখ, ভাই, বড়ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই।"

(পঞ্চমাঙ্ক-দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মঞ্চের উপর উন্মাদনা, আত্মহত্যা, মৃত্যু, দৈববাণী—সমস্ত কৌশলগুলি শেক্সপীয়রীয় নাটকে Seneca-র···প্রভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। কৃষ্ণকুমারী নিরপরাধা, নিয়তির জন্য তাঁহার মৃত্যু। গ্রীক নাটকে এমনি বহু নায়িকা আছে। 'কৃষ্ণকুমারী'র ভাষা 'শর্মিষ্ঠা' অপেক্ষা অনেক পরিমার্জিত। কবিত্বময় অথচ অসরল ভাষার পরিবর্তে পাত্রোপযোগী ভাষা মধু অধিক ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক অঙ্কে সময়ের ঐক্য (Unity) লক্ষিত হয়।

'কৃষ্ণকুমারী'তে মধু ভাগ্যের (Fate) চক্রান্তের উর্ধে গ্রীক এবং খৃষ্টীয় আদর্শ দেখান কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিসর্জনে। কৃষ্ণকুমারী স্বার্থ বিসর্জন দিলেন, তাঁহার জন্য যুদ্ধ বাধিল না। তাঁহার খুল্লতাতকেও ঘাতক হইতে হইল না। কৃষ্ণকুমারী স্বয়ং আত্মবিসর্জন করিলেন।

তারপর কয়েকদিন মধু সৃজন-বস্তু অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আবার মহাকাব্য লিখিবার বাসনা হইল। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ

করিয়া তিনি মহাভারতীয় কোন ঘটনা অবলম্বনে একখানি কাব্য আরম্ভ করেন। কাব্যখানি শেষ হয় নাই। ভগ্ন উরু দুর্যোধনের আত্মবিলাপ কাব্যের প্রারম্ভিক অংশ।

"Jotindra proposes the battles of the Kaurava and Pandava princes"—

(কাব্যটির শিরোনাম 'পাণ্ডব বিজয়' বা 'দুর্যোধনের মৃত্যু',
রাজনারায়ণকে পত্র, ১৮৬১)

সিংহল-বিজয় অবলম্বন করিয়া দুইখণ্ড একখানি কাব্য লিখিবার অভিপ্রায় মধুর ছিল। আদ্যন্ত একটি ছকও তিনি রাখিয়াছিলেন এবং কাব্যটির ১ম ও ২য় খণ্ড আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যটি রচনার প্রবল বাসনা ছিল। ঈনীড অবলম্বনে ভার্জিলের প্রথায় সিংহল বিজয় নামে আর একখানি মহাকাব্য রচনা করিবেন, এই ইচ্ছায়ও তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বহু রচনার মতই সিংহল বিজয় তাঁহার মানস স্বপ্ন মাত্র রহিল। মধুর 'ভারত-বৃত্তান্ত' নামক একখানি খণ্ড কাব্যের সূচনা করেন, এটিও অসমাপ্ত। ভারতবৃত্তান্তের মধ্যে মধু মহাভারতের নানা ঘটনা লইয়া নানা বিষয় লিখিতে ইচ্ছুক ছিলেন। 'মৎসগন্ধা' নামক খণ্ডকাব্য ইহারি অন্তর্ভুক্ত। যৎসামান্য সূচনার পরে মধু ইহা অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আমরা মধুর 'বীরাঙ্গনা' কাব্য পাইলাম (১৮৬২)। ওভিডের 'Heroic Epistle'কে আদর্শ করিয়া 'বীরাঙ্গনার' প্রথম খণ্ডে মধু একাদশখানি পত্র রচনা করেন। ওভিডের মত এক-বিংশতিখানা পত্র রচনার অভিলাষ তাঁহার ছিল। সেজন্য তিনি পরে আরও পাঁচখানা পত্রিকা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। অমিত্রছন্দের কাঠামোতে কোমল এবং ওজস্বিনী ভাবের জন্য 'বীরাঙ্গনার' প্রসিদ্ধি।

ভার্জিলের ঈনীড-এর অংশ-বিশেষ দেখা যায়—

"Not sprung from noble blood nor goddess-born
But hewn from hardened entrails of a rock,
And rough Hyacanian tigers gave thee suck."

'বীরাঙ্গনায়' ভানুমতী পত্রিকায় ভীম সম্বন্ধে পাই—

"ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুখে—নরনারী স্তন্যদুগ্ধপানে কি"—ইত্যাদি।

বীরাঙ্গনা কাব্যে নায়িকাদের প্রেমিক অথবা পতির নিকট পত্র রচনা সর্বতঃ বিদেশী নয়। আমরা কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এ দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার পত্ররচনা দেখি ঃ—

"তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনর্মদনো দিবাপি রাত্রাবপি
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়স্তয়ি বৃত্তমনোরথায়া অঙ্গানি।"

(তৃতীয় অঙ্ক-'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্')

সুতরাং প্রেমপত্রিকা ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতেও জাত বলা চলে।

মধুসূদনের বাংলা রচনার প্রথম পর্যায় এখানে শেষ হইল। মধুপ্রতিভার সুবর্ণযুগ অল্প কয়েকটি বৎসরে বাংলাসাহিত্যে নূতন প্রাণস্পন্দন আনিয়া দিল। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি গীতিকবিতা কবি রচনা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে কয়েকটি

'আত্মবিলাপ' বায়রণের 'Childe Harold's Prilgrimage'-এর শেষ পংক্তিসমূহের সহিত তুলনীয়।

…"But I am not now
That which I have been—and my visions flow
Less palpably before me—and the glow
Which in my spirit dwelt is fluttering faint
and low."

"My Native land, Good night"—বায়রণের মটো উর্ধস্থ করিয়া মধু 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন বিদেশ যাত্রা কালে।

'Childe Harold' হইতে মটোর পংক্তিটি উদ্ধৃত। চাইলড হ্যারল্ড নিজ দেশ ইংলণ্ড হইতে স্পেনগামী জাহাজে বিদায়-সঙ্গীত গাহিয়াছেন,

"Adieu, adieu ! my native shore,

(Canto The First.)

Fades O'er the waters blue,"—

বায়রণ আবার অন্যত্র ঋনী।

'Childe Harlods Pilgrimage'-এর ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—

'The "Good Night" was suggested by "Lord Maxwell's

Good Night" in the Border Ministrelsy, edited by Mr. Scot'.

যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুর বাংলা রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই কবিতার প্রথম সূচনা কিন্তু এ সময়ে হয়, মধুর প্রতিভার গৌরবময় স্বুবর্ণযুগে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক রবিবারে মধুসূদন রাজনারায়ণকে পত্রে লেখেন—

"I want to introduce sonnet into our language and some morning ago made the following"—

উল্লিখিত সনেটটির নাম 'কবি মাতৃভাষা,' পরবর্তী কালে 'বঙ্গভাষা' সনেটে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মধু বিদেশ যাত্রা করিলেন। সাহিত্য স্বষ্টির প্রথম পর্যায়ের এখানে শেষ।

দ্বিতীয় পর্যায়—

চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) 'শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বিদেশ হইতে ‘চতুর্দশপদী’র কবি ব্যবহারজীবী হইয়া ফিরিলেন। বিদেশে তিনি ‘সুভদ্রাহরণ’ নামে কাব্য এবং ‘ভারতবৃত্তান্তের’ অন্তর্ভুক্ত ‘দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর’ নামে একখানি কাব্য আরম্ভ করেন, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই। ‘দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে’র ছন্দ পয়ার (১৮৬৩-ভার্সেই)। য়ুরোপে থাকিতে মধু তাঁহার ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ ও মিলান্তপদ কাব্যের পুনর্লিখন আরম্ভ করিয়া আবার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সরস্বতীর বরপুত্র লক্ষ্মীর আরাধনায় রত হইলেন। ফলে প্রতিভার মৃত্যু ঘটিল। তিনি তারপরে ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি এই সময়ে নাই। পথভ্রষ্ট প্রতিভার বিক্ষিপ্ত প্রয়াস মাত্রে মধুর শেষ জীবন কণ্টকিত।

Aesop's Fables এবং ফরাসী কবি La Fontaine-এর আদর্শে তিনি কতকগুলি নীতিমূলক কবিতা রচনা করেন। কতকগুলি ‘অসমাপ্ত কবিতাবলী’র মধ্যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ‘নীতিগর্ভ কবিতা’ নামে কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। পাঠ্য বা টেক্সট্ হইবার উদ্দেশে কবিতাগুলি লিখিত হয়। কয়েকটি পাঠ্যও হইয়াছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মধু ‘হেক্টরবধ’ নামে একখানি অসমাপ্ত গদ্য পুস্তক লেখেন। হোমারের ‘ইলিয়াড’ অবলম্বনে গদ্য কাব্যটির রচনা কার্য হয়। মধুর বাংলা গদ্যরচনার সীমা একখানি মাত্র পুস্তকে, তাহাও অসমাপ্ত। নাটকের মধ্যে স্থাপিত গদ্যাংশ অপেক্ষা ‘হেক্টরবধে’র গদ্য অনেক কৃত্রিমতাপূর্ণ এবং অসরল। নাটকের গদ্যাংশ ও ‘হেক্টরবধ’ মধুর গদ্যরচনার নিদর্শন। তিনি পদ্যরচয়িতা ছিলেন প্রধানতঃ।

অবশেষে মধু ‘মায়াকানন’ নামে একখানি নাটক থিয়েটারের অগ্রিম টাকার বিনিময়ে অতিকষ্টে শেষ করিয়া যান (১৮৭৪)। ‘বিষ না ধনুর্গুণ’ নামে আরও একখানি নাটক তিনি পরে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সমাপ্তি ঘটিল না।

কার্লাইলের গদ্যে জার্মানিস্‌ম আছে।* 'হেক্তরবধের' গদ্যের সঙ্গে তুলনীয়। হোমারের আদর্শে গঠিত বলিয়া গদ্য ভাষায় ওজোগুণ দেখা যায়। বাংলা গদ্যে এই গদ্যের ভঙ্গি একটু নূতনত্ব আনিয়াছিল।

'মায়াকানন' মধুর শেষ জীবনের বিষাদাচ্ছন্ন রচনা। নাটকে শেক্সপীয়রের 'Winter's Tale'-এর সাদৃশ্য পাষাণী মূর্তির অস্তিত্বের মধ্যে ক্ষীণভাবে পাওয়া যায়। বিষাদ-মথিত শীতের কাহিনীর মতই বিষণ্ণ রূপককাহিনী 'মায়াকানন'। শেক্সপীয়র নাটক মিলনান্ত করেন, মধু বিয়োগান্ত করেন নিজের জীবনের প্রতিফলনে।

মায়াকাননে পরলোকগত আত্মার আবির্ভাব ও ভাষণ শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের, যথা 'Hamlet'-এর ও অন্য নাটকের ছায়া। মধুর নাটকাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সেনেকার প্রভাব দেখা যায় এই নাটকখানায়, প্রেত, আত্মহত্যা, বিষপান, অলৌকিকতত্ত্ব ইত্যাদি। অজয় ও ইন্দুমতীর পূর্বজন্ম গান্ধার কুলে এবং অভিশাপের ফলে নরজন্ম, সুন্দরীর পাষাণী রূপ আবার বাণভট্টের কাদম্বরীর ছায়াপবিত্র। মধুর নাটকে য়ুরোপীয় ও সংস্কৃত উভয় নাট্যরূপের ছায়া আছে। 'বিষ না ধনুর্গুণ' মনোকষ্টে বিক্ষিপ্ত, অসমাপ্ত নাটক, মন্তব্য-যোগ্য নয়।

মধুসূদনের শিল্পীজীবন তারপর মৃত্যুসাগরে পথ হারাইল।

* "His (Carlyl's) mannerisms of style, tortured and frequently disagreeble"—Thompson.

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আপেক্ষিক সমালোচনা

প্রথম পর্যায়—

'মেঘনাদবধ কাব্য' সমালোচকের মতে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অমিত্রছন্দে মহাকাব্যের গুণসম্পন্ন এই কাব্য মধুর খ্যাতির সর্বোত্তম জয়ধ্বজা। প্রাচ্য প্রতীচ্যের যুগান্ত-সঞ্চিত মানসিক সঞ্চয় নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া মধুসূদন বাংলা ভাষাকে অভিনবত্ব দান করিলেন। 'মেঘনাদবধ' শুধু কবির প্রতিভার নয়, কবির পাণ্ডিত্যের সুদৃঢ় স্বাক্ষর।

মহাকাব্যখানি বিভিন্ন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রচনার সঙ্গে একাত্মা। রামায়ণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস প্রভৃতি দেশীয় এবং বিদেশীয় সমুদ্র-মন্থনের অমৃত—'মেঘনাদবধ কাব্য'। জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্ব বিফল কবির দগ্ধ বাসনা কিন্তু অনায়াসে রত্নাকরের রত্নহারে তাঁহাকে সাহিত্যের সমুদ্র সৈকতে বরণ করিয়া লইয়াছিল—জীবনে যাহা তাঁহার অগম্য ছিল, সেই পরিপূর্ণতা সাহিত্যলক্ষ্মী কবিকে দিয়াছেন। একটি হতাশ, বিফল জীবনের সর্বাঙ্গীন সার্থকতার সন্ধান-দাতা এই কাব্য আরও মহৎ। কারণ কবিজীবনের আশ্বাস এখানেই। যে সকল স্বপ্ন মধু দেখিয়াছিলেন, তাহাদের একত্র মিলন কাব্যপরিসরে ঘটাইয়াছেন। যে সমস্ত কাব্য তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহারা 'মেঘনাদে' অমর হইয়া আছে। তাই কাব্যের পরম সার্থকতা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

প্রতিভার সর্বাপেক্ষা সার্থক স্বপ্ন এই কাব্য হোমারের 'ইলিয়াডে'র সমপর্যায়ে উন্নীত করা। অন্য কবিদেরও ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, কিন্তু প্রধানতঃ 'ইলিয়াডের' ছকে গ্রথিত 'মেঘনাদ'। সুতরাং আমাদের প্রধান ও প্রথম আলোচনা 'ইলিয়াডের' সহিত 'মেঘনাদবধের' তুলনা-

মূলক সমালোচনা। মধুসূদনের উৎস প্রধানতঃ হোমার। ভাবধারায় 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বিদেশী কাব্যের সঙ্গে তুলনা এই পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়।

ইতিপূর্বে আমরা যে সকল কবির সংক্ষেপ আলোচনা করিয়াছি, তাঁহাদের প্রতিটি নাম পাইয়াছি কবির পত্রাবলী বা কদাচিৎ জীবনী হইতে। দেশীয় কবির মধ্যে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম, মাঘ, ভারবি, ভাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ভারতচন্দ্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ কবির কাব্যে পাওয়া যায়।*

পাশ্চাত্য কবির মধ্যে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, টাসো, ওভিড, শেক্সপীয়র, মিলটন, ড্রাইডেন, শেলী, বায়রণ, কীটস্, মূর, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন, হুগো, পোপ, স্কট, নাট্যকার মলেয়ার কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। বিশেষত্ব এই যে পূর্বোক্ত প্রতীচ্যের রচনাকারদের প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর ক্লাসিকাল ভাবাপন্ন। গ্রীস দেশের সাহিত্যের এবং কখনও রোমের সাহিত্যের দিকে কোন না কোন প্রকারে তাঁহারা হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। গ্রীক জাতিকে তাঁহারা ভালবাসিতেন, তাঁহারা গ্রীসের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধু তাঁহাদিগকে ভালবাসার মধ্য দিয়া অবশেষে তাঁহাদের স্বপ্নলোকে প্রবেশপত্র পাইলেন। তিনিও মনে প্রাণে গ্রীক হইলেন।

* মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে' বহু রচনাকারের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, যথা, কবিবর ভিক্টর হুগো, বাল্মীকি, কবিবর আলফ্রেড টেনিসন, কবিগুরু দান্তে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কালিদাস, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব। এছাড়া পেত্রার্কের বন্দনা প্রথম সনেটে পাওয়া যায়। 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', 'অন্নদা-মঙ্গল' ইত্যাদির রচয়িতাদের বিষয়বস্তুর বর্ণনা মধুর এই সকল কাব্যে প্রীতি জানায়। ইহাদের কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। মধুর পাণ্ডিত্য বিস্তৃত ছিল, পড়াশোনা এত অধিক ছিল যে তাঁহার সম্যক পাঠ্য কাব্যের সমালোচনা সম্ভবপর এখানে নয়। সমালোচনা, দর্শন, নাটক ইত্যাদির সূত্র আমরা টানি নাই। প্রবন্ধকে অযথা ভারাক্রান্ত করা আমাদের উদ্দেশ নয়।

আনন্দে তিনি স্বচ্ছন্দে ঘোষণা করিলেন, "আমার লেখার তৃতীয়-চতুর্থাংশ গ্রীকমূর্তি।" ড্রাইডেনের মত তিনিও ব্যক্ত করিলেন, "আমি একজন গ্রীক যে ভাবে লেখেন, তেমনি করিয়া লিখিতে চাই।" শৈশব যৌবনের প্রিয়তম কবি মিলটন শেষে লীন হইলেন গভীর ক্লাসিকসমুদ্রে। মধু সূত্র অবলম্বনে শেষ লক্ষ্যে উপনীত হইলেন। যে সৌন্দর্য পারাবারে মিলটন অবগাহন করিয়াছেন, মধুসূদনও সেখানে আত্মবিসর্জন করিলেন। তাঁহার প্রিয় কবিদের কাব্যলোকের শেষ যে অলকায়, মধুর সাহিত্যস্বপ্ন সেখানে বিকশিত হইল। অনেক সাধনা, অনেক তপস্যা কবিকে গ্রীক এপিকের চাবিকাঠির সন্ধান দিল। অনধিকারীর কাছে এমন নন্দনস্বপ্ন অবশ্যই উন্মোচিত হইত না।

বহু বিনিদ্র রাত্রির জাগরণ, অনেক দুর্লভ মুহূর্তের ক্ষয়, মৃত্যুর পদধ্বনি অগ্রাহ্য করিয়া কবি যে সাহিত্য-জগতের সন্ধান পাইলেন, তাহা উদার দাক্ষিণ্যে তিনি আপনার জনের হাতে দিলেন। গ্রেজ ইনের ব্যারিষ্টার নয়, আঁরিয়েতের স্বামী নয়, ডিয়ালট্রির দীক্ষিত নয়—বাংলার মধুসূদন তিনি। যে সম্পদ তিনি দেশের মনমঞ্জুষায় দান করিলেন আজ হয়তো তাহা পুরাতনের খাতায় লিখিত প্রাপ্তি মাত্র। কিন্তু মহাদেশ সেদিন নূতন দিগন্তে দৃশ্যমান হইল—রেনেসাঁসের মহাদেশ। বাংলা এক পরম লগ্নে গ্রীসের সঙ্গে একাত্মা হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের অবরুদ্ধ আকাশে বিচিত্র অরোরা বরিয়ালিস্। গ্রীসের আত্মা বাংলার ভাষায় বন্দী এমন যে সাহিত্যসৃজন তাহা ধন্য। বিজাতীয় বলিয়া মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে প্রাপ্য গৌরব-বঞ্চিত নূতন সমালোচক করিবেন না। তিনি পৃথিবীর সর্ব কাল, সর্ব দেশ, সর্ব ভাষার ভাষ্যকার। অথচ তিনি বাঙালী।

ইতিপূর্বে অন্যান্য সমালোচক মধুসূদনের প্রেরণার উৎস হিসাবে বৈদেশিক সাহিত্যের উল্লেখ করিলেও নিয়মবদ্ধভাবে বিশদ আলোচনা কোথাও নাই। তাই এই দিক হইতে নূতন সমালোচনার প্রয়োজন আছে।

হোমারের 'ইলিয়াড' এবং মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' আমরা এখন পাশাপাশি স্থাপনার পরে একত্রে পাঠ করিব।

বিষয়বস্তু—দুইটি কাব্যই একটি সমভাবাপন্ন সংগ্রামের উপাখ্যান। 'ইলিয়াডের' যুদ্ধ মিনালাউস পত্নী হেলেনের পারিস দ্বারা অপহরণ জন্য।

'মেঘনাদের' যুদ্ধ রামের পত্নী সীতার রাবণ দ্বারা অপহরণ জন্য। সমুদ্রসেতু নির্মাণ করিয়া রামচন্দ্র বানর সৈন্য সাহায্যে লঙ্কা আক্রমণ করিলেন। বিভিন্ন রাজন্যদিগকে একত্রিত করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক গ্রীক সৈন্য ট্রয় আক্রমণ করিল। অপহরণ কার্যটি পারিস দ্বারা সম্পন্ন হইলেও তাঁহার ভ্রাতা হেক্তর প্রকৃত পক্ষে ট্রয়ের নায়ক। যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইলে প্রেতকৃত্যাদির পরে দ্বাদশ দিনের সন্ধি দ্বারা যুদ্ধ ঐ দ্বাদশ দিনের জন্য বিরত হয়। 'মেঘনাদবধে' অপহরণকারী রাবণের পুত্র মেঘনাদ লঙ্কা যুদ্ধের নায়ক।

তাঁহার মৃত্যু হইলে দাহন কার্য সমাধার পর সপ্তদিনের জন্য সন্ধি হয়। 'ইলিয়াডের' আকিলিস্ 'মেঘনাদবধে' লক্ষ্মণ, উভয়ের হস্তে যথাক্রমে হেক্তর ও মেঘনাদ নিহত হইলেন। উভয় নায়কের মধ্যে একটি যুদ্ধই প্রধানতঃ পুস্তকে বর্ণিত যুদ্ধটির ভাগ্য নির্ণয় করিতেছে। হেক্তর ও মেঘনাদের চরিত্রমাহাত্ম্যে পাঠকের মন অন্যায়কারীদের প্রতি বিমুখ থাকে না। বীরবাহু ইলিয়াডের পাট্রোক্লুস। বীরবাহুর মৃত্যু হইলে দেবী কমলা ছদ্মবেশে যাইয়া মেঘনাদকে এ সংবাদ জানাইলেন। মেঘনাদ সুখসম্ভোগ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। 'ইলিয়াডে' দেখি পাট্রোক্লুসের মৃত্যুর পর দেবী আইরিস্ আকিলিসের নিকটে যাইয়া মৃত বন্ধুর শবদেহ রক্ষার্থে তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন।

উভয় কাব্যই সহসা পাঠকবৃন্দকে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করায়। অপহরণ কার্য, যুদ্ধারম্ভ ও যুদ্ধের পূর্বভাগ ইত্যাদি বিষয়ে হোমার

ও মধুসূদন কালক্ষেপ করেন নাই। প্রথম হইতেই কাব্যের চাবি-কাঠির সন্ধান উভয়েই দিয়াছেন, যথা—

"Sing, heavenly Muse, the wrath of Peleus' Son."

"কহ হে দেবী অমৃতভাষিণি, কোন বীরবরে বরি···" উভয় ক্ষেত্রেই একটি সমস্যা লইয়া কাব্যের আরম্ভ। আবার উভয় কাব্যেই নায়কের মৃত্যুর পর একটি সন্ধির দ্বারা যুদ্ধবিরতি হইয়া সহসা কাব্য শেষ হইল। যুদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্র বর্ণনা বহুস্থানে একই রকম, উদাহরণতঃ, দুই চাকা বিশিষ্ট রথে রথী ও সারথি ইত্যাদি।

দেবদেবী—হোমারের কাব্যে গ্রীক দেবদেবীগণের এবং অলিম্পাস্ পর্বতস্থিত দেব-রাজ্যের অতি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। জলদ-জালাবৃত অলিম্পাস পর্বত-শিখরে স্বয়ং দেবরাজ জিউস বা জুপিটার হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দেবতা দুই দলে বিভক্ত হইয়া উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের সাহায্য করিতেছেন। জুপিটার স্বয়ং ট্রোজান-দিগের প্রতি সদয় অথচ পত্নী জুনোর প্রীতি গ্রীকদিগের প্রতি। এদিকে শিব রাবণের প্রতি প্রসন্ন কিন্তু কাত্যায়নীর সহানুভূতি রামের দিকে। এজন্য স্বামী-স্ত্রীতে কখনও বাদানুবাদ কখনও নিজ নিজ পক্ষ টানিবার প্রচেষ্টা উভয় কাব্যেই পরিলক্ষিত হয়।

ইন্দ্রের সহিত মার্স ও আপোলোর সাদৃশ্য আছে। ভগিনী মিনার্ভার সহিত যোগ দিয়া মার্স গ্রীকদিগকে সাহায্য করিতেছেন। আপোলো যেমন তাঁহার অমর সৈন্য লইয়া যুদ্ধাবতরণ করেন সেইরূপ ইন্দ্র তাঁহার দেবসৈন্য সজ্জিত করিয়া পরিচালনা করেন। মেঘনাদ-বধে মিনার্ভা মায়া। আকিলিস এবং হেক্তরের শেষ যুদ্ধে তিনি হেক্তরকে প্রহেলিকাজালে নিক্ষেপ করিয়া আকিলিসের জয়লাভের পথ সুগম করিয়াছিলেন। মায়া সেইরূপ ভাবে ইন্দ্রজিতের শেষ মুহূর্তে তাঁহার বিভ্রম ঘটাইয়াছিলেন।

ইলিয়াডে দেবশিল্পী ভলকান হেক্তর-বধের পূর্বে আকিলিসের জন্য দিব্য অস্ত্রাদি প্রস্তুত করেন, এখানেও লক্ষ্মণ শিবনির্মিত দেবাস্ত্র

পাইয়া মেঘনাদকে নিহত করিতে সক্ষম হইলেন। উজ্জ্বল-বিভাযুক্ত দেবাস্ত্রের কথা পড়িয়া ইলিয়াডে আকিলিসের প্রদীপ্ত অস্ত্রসমূহের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। সেই দীপ্তিতে মারমিডগণ নয়ন আবৃত করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

'ইলিয়াডে' থেটিস 'মেঘনাদবধে' বারুণী। জলতলে গভীর গুহা মধ্যে স্ফটিকাসনে আসীনা থেটিসের বর্ণনার সহিত বারুণীর বর্ণনা তুলনীয়।*

লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা। মেঘনাদের মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি স্বীয় তেজ সংবরণ করিলেন, তেমনি হেক্তরের মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁহার রক্ষক দেবতা আপোলো তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বারুণীর দূতী মুরলা লঙ্কা ধামেস্থিতা কমলার নিকটে যুদ্ধের বারতা শুনিবার জন্য যাইয়া তাঁহার সহিত দেউল দুয়ারে দাঁড়াইয়া রাক্ষস সৈন্যদের রণসজ্জা দেখিলেন। কমলা এক এক করিয়া রাক্ষস বীরদিগকে দেখাইয়া মুরলার নিকট তাঁহাদের পরিচয় দিলেন। 'ইলিয়াডেও' এইরূপ একটি দৃশ্য আছে। জুনোর দূতী আইরিস হেলেনের নিকটে যাইয়া পারিসের দ্বৈতযুদ্ধসংকল্পের বার্তা জানাইলেন। হেলেন ট্রয়নগরীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। তথায় উপবিষ্ট প্রায়ামকে হেলেন এক এক করিয়া গ্রীক বীরদিগকে দেখাইয়া তাঁহাদের পরিচয় দিতেছেন, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

উভয় কাব্যেই দেবদেবীগণ দুইটি যুধ্যমান পক্ষ সমর্থন করিয়া সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। মানুষের সুখ দুঃখের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়া অমরগণ মরণশীল মানুষের মতই ব্যবহার ও

* 'প্রবাল আসনের বারুণী রূপসীর মুক্তা ফল দিয়া কবরী' বন্ধন যেন মনে করাইয়া দেয়—মিলটন-এর 'কোমাসে'—

> "Sabrina fair !
> ……In twisted braids of lilies knitting
> The loose train of thy amber-dropping hair."……

দলাদলি করিতেছেন। উভয় কাব্যেই দেবতারাও প্রাক্তনকে ও নিয়তিকে সব কিছুর, এমন কি নিজেদের উপরেও স্থান দিয়াছেন। 'ইলিয়াডে' দেখি স্বর্গসম্রাট জুপিটারও নিয়তি (Destiny)-কে ভয় করিয়া চলেন। 'মেঘনাদবধে'—"প্রাক্তনের ফল ত্বরা পূরিবে এ পুরে"—(১ম সর্গ), "দেবে কি মানবে কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি", (২য় সর্গ)।

অলিম্পাসশিখরের সহিত মেঘাবৃত কৈলাসচূড়ার সাদৃশ্য আছে। দেবতাদিগের গীতবাদ্য, আনন্দ উৎসব 'মেঘনাদবধে' ইন্দ্রসভার বর্ণনার কথা স্মরণে আনে—

"বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব বাদিত্র। ছয়রাগ, মূর্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত।—
যোগায় গন্ধর্ব স্বর্ণপাত্রে সুধারসে।···
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিবনিবাসী সহ।"—(২য় সর্গ)

"···Each to his lips applied the nectar'd urn
Vulcan with awkward grace his office plies,
···Thus the blest gods the genial day prolong,
In feasts ambrosial, and celestial song,
Apollo tuned the lyre ; the Muses round,
With voice alternate aid the silver sound."

(Pope's tran. Homer)

চরিত্র ও ঘটনা সংস্থান—হেলেনের প্রতিরূপ কিছু পাই সীতাতে। হেলেন ভীনাসের যাদুমন্ত্রে স্বামী ত্যাগ করিয়াছিলেন। সীতাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনা হইয়াছে। দুইটি রূপসীর জন্যই দুইটি

রাজ্য বিনষ্ট হইল। দুইজনই স্বজন হইতে দূরে নির্বাসিতা। হেক্তর হেলেনের সহিত সুকোমল ব্যবহার করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। সীতার সান্ত্বনাদাত্রী সরমা। সীতা ও হেলেন উভয়েই নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছেন এবং হেক্তর ও মেঘনাদের মৃত্যু যথাক্রমে নিজেদের নিমিত্ত বলিয়া ক্ষোভ করিতেছেন। সীতার আক্ষেপোক্তির সহিত হেলেনের আক্ষেপোক্তির অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। যথা—

"কুক্ষণে জন্ম মম সরমা সুন্দরী"—(৪র্থ সর্গ)

"Oh that day my mother gave me birth
Some storm had on the mountains cast
me forth."

"হে বিধি কেননা আমি মরিনু তখনি"—(চতুর্থ সর্গ)

"Would I then had died."*

হেক্তরপত্নী আন্দ্রোমাকী মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলা। প্রমীলার তৃতীয় সর্গে যোদ্ধৃবেশে মেঘনাদের নিকটে গমন করিবার দৃশ্যটি, তাঁহার সহচরীদের বর্ণনা, তাহাদের সমরপ্রচেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে আমাজোনদের কথা স্মরণে আনিয়া দেয়। হেক্তরের যুদ্ধগমন প্রাক্কালে অশ্রুমুখী আন্দ্রোমাকী যে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শ্রবণান্তে হেক্তরের বীরত্ব-ব্যঞ্জক প্রত্যুত্তর মেঘনাদবধকাব্যে প্রমীলা ও মেঘনাদের বিদায় দৃশ্য দুইটি (১ম ও ৫ম সর্গ) মনে আনিয়া দেয়। কিন্তু মধুসূদনে যে মাধুর্য ও প্রেমের সমাবেশ দেখি হোমারে তাহা পাই না। মৃত্যু সন্নিকটে হইলেও মেঘনাদ পূর্বে তাহা জানিতে পারেন নাই, তাই বিদায় দৃশ্যে আশা ও বীরত্বের আলোক পড়িয়াছে। কিন্তু, হেক্তরের মনে যেন ভবিষ্যৎ ঘটনার একটা নিরানন্দ আভাস ; তাই ইলিয়াডে স্বামী স্ত্রীর বিদায় দৃশ্যে বিষাদ ও কারুণ্যের সুরই পাওয়া যায়। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে প্রমীলা

---

* টেনিসনের 'Dream of Fair Women'-এ নায়িকাদের আক্ষেপ তুলনীয়।

ও আন্দ্রোমাকী ফিরিয়া ফিরিয়া পতির গমনশীল মূর্তি দেখিতেছেন। আর জীবনে দেখা হইল না। উভয় মহাকাব্যেই এটি একটি অপরূপ দৃশ্য।

পতির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের ব্যাপারেও উভয় নায়িকার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই নিজেদের সর্বনাশ সম্বন্ধে পূর্বে বিন্দুমাত্র জানিতে পারেন নাই, নিশ্চিন্ত চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্বামীর প্রত্যাগমন হেতু প্রয়োজনীয় আয়োজনাদি করিতেছিলেন। তাঁহাদের নিকটে কোনও ভগ্নদূত সংবাদ বহন করিয়া আনে নাই, প্রাসাদমধ্যে বিলাপধ্বনি শুনিয়া তাঁহারা সচকিত হইয়াছিলেন।

রাবণমহিষী মন্দোদরী ও চিত্রাঙ্গদা প্রায়ামপত্নী হেকুউবার কার্য করিতেছিলেন। স্বসঙ্গিনী চিত্রাঙ্গদার বীরবাহুবধে বিলাপ, হেকুউবার হেক্তরবধে বিলাপের সহিত এবং মন্দোদরীর মেঘনাদের কল্যাণার্থে পূজা হেক্তরের কল্যাণার্থে হেকুউবার বলিপ্রদানের সহিত তুলনীয়। চিত্রাঙ্গদা কর্তৃক রাবণের গঞ্জনা হেলেন ও হেক্তর কর্তৃক পারিসের গঞ্জনার কথা মনে করায়। রাবণ এবং পারিস উভয়েই অন্যের পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়া কুলনাশের কারণ হইয়াছেন।

> ...“হায় নাথ, নিজ কর্মফলে
> মজালে রাক্ষস কুলে মজিলা আপনি।”
>
> (চিত্রাঙ্গদার উক্তি)

> ...“a great sorrow for thy father's head
> Troy town and all the people of the land
> By thine inhospitable offence has bred”
>
> (Worsley's tran. Homer)

হোমারের কাব্যে ভ্রাতৃস্নেহ ও বন্ধুপ্রীতির মধুর নিদর্শন দেখা যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আগামেমনন্ ছোট ভাই মিনালাউসের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল। পাণ্ডারুস-নিক্ষিপ্ত তীরে মিনালাউস আহত হইলে

আগামেমননের অবস্থার সহিত লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পরে রামের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখা যাক—

"Great Agamemnon shuddered as he saw
The crimson blood-drops issuing from
the wound."···
(Derby's tran. Homer)

"বৈদেহী নাথ ভূপতিত তথা
নীরবে !
নয়ন জল অবিরল বহি
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি,"—(৮ম সর্গ)

আগামেমনন্ ও রাবণের বিলাপও অনেকটা এক রকম ; উভয়েই ভ্রাতাকে প্রাণাধিক সম্বোধন করিয়া এই দুর্দৈবের নিমিত্ত প্রকারান্তরে নিজেদের দোষী করিতেছেন। শত্রুবেষ্টিত পুরীতে ভ্রাতা ভিন্ন নিজেদের নিঃসহায় মনে করিতেছেন এবং কুলবধূ-উদ্ধারের কোনই উপায় নাই দেখিতেছেন। তবে রামচন্দ্রের বিলাপে নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃ-প্রেম ও কমনীয়তা 'ইলিয়াডের' বীরবরের বিলাপের অপেক্ষা অনেক বেশী প্রকট। মিনালাউস্ কেলমাত্র আহত হন কিন্তু লক্ষ্মণ গতাসু হন। সুতরাং রামের বিলাপ অধিকতর মর্মস্পর্শী এবং করুণ। এই দৃশ্যে মধুসূনের ক্ষমতা হোমার অপেক্ষা বেশী দেখাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

'ইলিয়াডের' সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যায় ট্রোজান বীর অজেয় হেক্তর গ্রীকদিগের মধ্য হইতে একজন রথীকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন। মিনালাউস্ যাইতে উদ্যত হইলে জ্যেষ্ঠ আগামেননন্ তাঁহাকে নিরস্ত করেন। হেক্তরভীতিপ্রদর্শনে স্নেহান্ধ আগামেমনন্ মিনালাউসকে বিরত করেন। মেঘনাদের সহিত যুদ্ধের পূর্বে রামও অনুরূপ বাক্যে লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার

সে চেষ্টা সফল হয় নাই। উভয় ক্ষেত্রেই মহারথী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠের জন্য এই আশঙ্কাজড়িত স্নেহ-প্রকাশ উপভোগ্য।

মেঘনাদের মৃত্যুর পরে রাবণের শোকপ্রকাশ ও পুত্রহন্তাকে হত্যা করিবার জন্য সজ্জার প্রতিরূপ দেখি সুহৃৎ পাট্রোক্লুসের মৃত্যুর পরে আকিলিসের শোকপ্রকাশে এবং হেক্তরকে শাস্তি দিবার জন্য রণসজ্জাতে। রাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলপ্রহারে অচৈতন্য করিয়া সেই শবদেহ অধিকার করিবার প্রচেষ্টা করিলে দেবদূত রাবণকে নিরস্ত করেন। আকিলিসের হস্তে হেক্তরের মৃত্যু হইলে শবদেহ আকিলিস অধিকার করিলেও প্রায়ামের অনুনয়ে তাহা প্রত্যর্পণ করেন।

সমভাবাপন্ন অংশ—মেঘনাদ নিক্ষিপ্ত প্রহরণ হইতে লক্ষ্মণকে মায়া রক্ষা করিতেছেন—

> "কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসারণে,—
> ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
> খেদান মশকবৃন্দে সুপ্তসুত হতে
> করপদ্ম সঞ্চালনে।" (৬ষ্ঠ সর্গ)

মিনালাউসকে মিনার্ভা রক্ষা করিতেছেন—

> "Pallas assists and
> Diverts the Weapon from its déstined course
> So from her babe, when slumber seals his eye
> The watchful mother wafts the envonomed fly"
> (Pope's tran. Homer)

'মেঘনাদবধে' দেবাদেশ যোদ্ধাদের সম্মুখে এইভাবে প্রকট হইল—

> "...অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
> শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে
> ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌদিকে!

পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন
গগন ;···
—ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
···কতক্ষণ পরে
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজগর—বিজয়ী সংগ্রামে।" (৬ষ্ঠ সর্গ)

'ইলিয়াডে' দেবাদেশ—

"Joves bird on sounding pinions beat the
skies ;
A bleeding serpent of enormous size,
His talons trussed ; alive and curling round
He stung the bird, whose throat received the
wound ;
Mad with the smart, he drops the fatal prey,
In airy circles wings his painful way,
Floats on the winds, and rends the heaven
with cries"—
(Pope's tran. Homer)

যজ্ঞগৃহে নিরস্ত্র মেঘনাদ কর্তৃক আতিথ্যের আহ্বান পাইয়া লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু ছাড়ে রে
কিরাত তারে ?—জন্ম রক্ষকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি !
কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ?" (৬ষ্ঠ সর্গ)

হেক্তর কর্তৃক সর্তপালনে আহূত হইয়া আকিলিস বলিতেছেন—

"Talk not to me of compacts as 'tween men
And lions no firm concord can exist"

(Derby's tran. Homer)

মৃত্যুর পূর্বে মেঘনাদ লক্ষ্মণের নির্দয়তার জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাত দিতেছেন—

"…এ বারতা যবে…
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে
নরাধম ?
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রানিবে, সৌমিত্রি !" (৬ষ্ঠ সর্গ)

মৃত্যুর পূর্বে এইরূপ হেক্তর আকিলিসকে অভিসম্পাত দেন—

"When by the scaean gate
The hand of Paris, with Apollo's aid,
Brave warrior as thou art, shall strike thee down".

(Derby's tran. Homer)

এই ভবিষ্যৎবাণী উভয় কাব্যেই সফল হইতে দেখি। লক্ষ্মণ অন্যায়কারী রাবণের হস্তেই শক্তিশেলাহত হইলেন। গ্রীক বীর আকিলিসেরও অবশেষে কৃতঘ্ন পারিসের হস্তেই জীবনান্ত হইল। হেক্তরের শবদেহ শকুনি গৃধিনীর কবলে সমর্পণ করিবেন বলিয়া আকিলিস ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। সেইরূপ রাবণ লক্ষ্মণকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন :—

"…মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে—" (৭ম সর্গ)

হেক্তরের দাহকার্যের সহিত মেঘনাদের দাহকার্যের সাদৃশ্য আছে। সেই বর্ণনার সহিত উভয় কাব্যই সমাপ্ত হইল। হেক্তরবধ

দৃশ্যটির সহিত মেঘনাদবধ দৃশ্যটির যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দুইখানি পুস্তক পাশাপাশি রাখিলে ভাল বোঝা যাইবে। কিন্তু, ভীষণ ও গম্ভীর মেঘনাদের মৃত্যুদৃশ্য—হেক্তরবধের দারুণ নিষ্ঠুরতা সেখানে মন্দীভূত।

শিবের জটার বর্ণনা—

"নড়িল মস্তকে জটা…
কাঁপিল কৈলাস গিরি থর থর থরে।" (৯ম সর্গ)

জুপিটারের জটা—

"Waved on the immortal head the ambrosial locks,
And all Olympus trembled at his nod"
(Darby's tran. Homer)

'মেঘনাদবধে' দুর্গা রক্ষঃকুল-বিনাশে কৃতসংকল্পা হইয়া শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মনোহরণ করিবার নিমিত্ত মোহিনী বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। 'ইলিয়াডে' জুনো ট্রোজানদিগের বিনাশ জুপিটারের নিকট হইতে গোপন রাখিবার নিমিত্ত ভীনাসের মেখলা ধারণ করিয়া জুপিটারের মনোহরণ করেন। 'মেঘনাদে' প্রথমে দুর্গা রতির সাহায্যে মোহিনী মূর্তি ধারণ করিলেন। তাহার পর মদনকে আহ্বান করিয়া ফুলধনুর দ্বারা শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

"কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে"—দুর্গার সমস্যায় রতি মোহিনী মূর্তি ধরিবার পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে সাজাইতে লাগিল—

"…সুবাসিত তেলে
মাজি চুল বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত,…
রত্নসঙ্কলিত আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে।" (২য় সর্গ)

জুনো নিজ গৃহে সাজিতেছেন—

"Her artful hands the radiant tresses tied ;
···Around her next, a heavenly mantle flow'ed
That rich with Pallas' labour'd colours glowed ;
Far beaming pendants tremble in her ear
Each gem illumned with a triple star,
···Last her fair feet celestial sandals grace,"

(Pope's tran. Homer)

তাহার পরে তিনি ভীনাসের নিকট হইতে মেখলা পরিধান করিয়া মনোহারিণী হইলেন। রতি এখানে ভীনাস। মদনকে দেবী সঙ্গে আসিতে বলিলেন।

তাহাতে মদনের ভীতি—

"···হেন আজ্ঞা কেন দেবি, কর এ দাসেরে ?
স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি, মা তরাসে !
···যবে
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্বভার ত্যাজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান ;—
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙ্গিতে···" (২য় সর্গ)

তাহার পরের কাহিনী সকলেই জানেন। স্বর্ণবর্ণ বাষ্পজালে নিজ মূর্তি আবৃত করিয়া উমা পুষ্পধম্বাকে অভয়প্রদানপূর্বক সঙ্গে লইলেন। 'ইলিয়াডে' মদনের প্রতিরূপ নিদ্রাদেব। জুনো কর্তৃক জুপিটারের চক্ষে নিদ্রা দিতে অনুরুদ্ধ হইয়া নিদ্রা বলিতেছেন—

"···How unbidden shall I dare to sleep
Jove's awful temples in the dew of sleep ?
Long since, too venturous, at thy bold command
On those eternal lids I laid my hand ;

···Great Jove awaking, shook the blest abodes
With "rising wrath···"

(Pope's tran. Homer)

তাহার ফল 'ইলিয়াডে'ও 'মেঘনাদবধে'র মতই শোচনীয় হয়।

কৈলাস পর্বতে 'যোগাসন' নামক খ্যাত গিরিশৃঙ্গটি আইডা পর্বত চূড়ার মতই ; ফুলধনুর শরাঘাতে পশুপতির ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি পার্বতীকে প্রশ্ন করিলেন—

"কেন হেথা একাকিনী দেখি
এ বিজন স্থলে তোমা ?—
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া জয়া ?"—(২য় সর্গ)

ঈশানীর উত্তরে হৃষ্ট হইয়া ঈশান তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন, অমনি···

"···চৌদিকে
প্রফুল্লিত ফুলকুল ; মরকন্দ লোভে
মাতি শিলীমুখ-বৃন্দ আইলা ধাইয়া ;
বহিল মলয় বায়ু ; গাইলা কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে···
—কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা কুসুম ধনু···
প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী !···
—লজ্জা বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু !
—ঘন রাশি রাশি
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,

বরষি প্রসূনাসার-কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত আদি
মন্দসমীরণপ্রিয়া-ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।"

'ইলিয়াডে' জুনোকে দেখিয়া জুপিটার প্রশ্ন করিলেন—

"Why comes my goddess from the ethereal sky,
And not her steeds and flaming chariot nigh ?"

(Pope's tran. Homer)

জুনোর উত্তরে প্রীত হইয়া এবং ভীনাসের মেখলা হেতু জুনোর মোহিনী মূর্তি দর্শনে জুপিটারও প্রেমামোদে মাতিয়া উঠিলেন। প্রেম-ক্রীড়ায় জুনোকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য জুপিটার আশ্বাস দিলেন—

"Nor god nor mortal shall our joys behold,
Shaded with clouds, and circumfused in gold
Not even the sun···
—Glad earth perceives, and from her bosom pours
Unbidden herbs and voluntary flowers :
Thick new born violets a soft carpet spread,
And clustering lotus swell'd the rising bed,
And sudden hyacinths the turf bestow,
And flamy crocus made the mountain glow.
There golden clouds conceal the heavenly pair,
Steeped in soft joys and circumfused with air ;
Celelstial dews, descending o'er the ground
Perfume the mount, and breathe ambrosia round.
At length, with love and sleep's soft power
oppress'd···"

(Pope's tran. Homer)

'যাই হোক, জুনো ও উমা স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন।

এই সূত্রে দুই একটি কথা আবার বলা সমীচীন। উভয় কাব্যের মধ্যে প্রধান প্রভেদ দেখা যায় দেবদেবীদের চরিত্রচিত্রণে। অমর কবি হোমার অঙ্কিত অমরবৃন্দ কিয়ৎ পরিমাণে হাস্যজনক—জুপিটার ও জুনোর তুচ্ছ পারিবারিক কলহের মধ্যে শিব ও দুর্গার পবিত্র মধুর প্রেমের আভাসমাত্রও নাই। ক্রোধান্ধ জুপিটার পত্নীর অঙ্গে হস্তক্ষেপের ভীতি পর্যন্ত প্রদর্শন করিতেছেন, জুনোর সহিত প্রেমালিঙ্গনের দৃশ্যে তাহার কামুক চরিত্রই প্রকাশ পাইয়াছে। জুনো ও পার্বতীর উদ্দেশ মুখ্যতঃ এক হইলেও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' একটি শালীনতা দেবীকে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির বেদীচ্যুতা করায় নাই। কাত্যায়নীর আদেশ ও অভয় প্রদানই মন্মথকে দুরূহ কার্যে প্রবৃত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু 'ইলিয়াডে' জুনো সাধারণ মানবীর মত নিদ্রাদেবকে একটি সুন্দরী রমণীরূপ উৎকোচ দানের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করেন। জুনোর মুখের প্রতিশ্রুতি কিন্তু সেই দেবতার পক্ষে যথেষ্ট মনে হইল না, জুনোকে নানাবিধ সাক্ষী মানিয়া শপথ করিতে হইল। এই সামান্য দৃষ্টান্তটি লক্ষ্য করিলে হোমার ও মধুসূদনের দেব-চরিত্রের পার্থক্য বোধগম্য হইবে। 'ইলিয়াডে'র প্রতিটি দেব-চরিত্র এইরূপ কোন না কোনও ভাবে দৈব মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য হারাইয়া অতি সাধারণ, সামান্য মানুষের মত আচরণ করিতেছেন—কখনও তাঁহারা ঈর্ষা ও ক্ষোভে ব্যাকুল, কখনও কলহপরায়ণ কখনও অতিমাত্রায় হাস্যজনক। বরঞ্চ তাঁহাদের অপেক্ষা ট্রোজান ও গ্রীক মানবীয় বীরগণ অধিক শ্রদ্ধার দাবী রাখে। দেবতাদের অতি জীবন্ত ভাবে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে চিত্রিত করিবার প্রশংসা হোমার পাইলেও অমরবৃন্দের কার্যকলাপাদি কিছু পরিমাণে নৈরাশ্যজনক। মধুসূদন দেবতাদের মানবমানবীর মত চিত্রিত করিলেও তাঁহাদের দেবতাই রাখিয়াছেন। কাজটি সুকঠিন ('ধর্ম'

পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) বাংলার সংস্কৃতি, ভারতীয় আদর্শ মধুসূদনের দেব-লোককে মহিমমণ্ডিত করিয়াছে। নগাধিরাজ হিমালয়ের তুঙ্গ শিখরের রহস্য, বাংলার চিরসঞ্চিত দেবমাহাত্ম্য দিয়া মধুসূদনের দেবতা পরিকল্পিত। কল্পনার রং সেখানে গরিমা ও মহত্ত্বস্পর্শে নিয়ন্ত্রিত। এই দেবতার ছবি বিদেশীয় কাব্যে কোথাও নাই।

ভার্জিল—ভার্জিলের প্রভাব প্রধানতঃ অষ্টম সর্গে নরকদর্শন দৃশ্যে পরিলক্ষিত হয়।

(Aeneid) 'ঈনীডের' নায়ক ঈনীয়াস (Aeneas) রসাতল প্রদেশে গমন করিয়া স্বীয় পিতার প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন। সিবিল (Sibyl) তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দেন ও স্বর্ণবৃক্ষকাণ্ড হস্তে দিয়া তাহার সাহায্যে ঈনীয়াসের নিরাপত্তা এবং পথনির্দেশের ব্যবস্থা করেন। এইস্থানে ত্রিশূলীর শূল হস্তে মায়াদেবীর রাম-চন্দ্রকে অধোদেশে পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়ার কল্পনা সূচিত হইতেছে। রামচন্দ্র দশরথের প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া লক্ষ্মণের জীবনরক্ষার উপায় জানিয়া লইলেন। স্বর্ণবৃক্ষকাণ্ডটি কবি বিস্মৃত হন নাই। দশরথের তপশ্চর্যার স্থল অক্ষয়বৃক্ষের বর্ণনায় ঈনীয়াসের স্বর্ণশাখা অমর হইয়া আছে—"সুবর্ণ শাখা, মরকত পাতা," ইত্যাদি। "চিরনিশা-বৃত-ভীষণ পুরীর' পরিখা বৈতরণী নদী, "নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশ দেশে, কিংবা চন্দ্র কিংবা তারা"···"গর্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমনি পিনাকী", "গিরি শত শত বন্ধ্যা" ইত্যাদি। 'ঈনীডে'র নানাস্থানে এইরূপ বর্ণনার উপাদান বিস্তৃত। ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে।

> **'A cavern deep there was,**
> **Immeasurable in its desolate gape.**
> **Of rugged rocks and sheltered with black mire....'**
> **Through mirk they fared enwrapt in lonely**
> **night···**

'Neath niggard night of fitful moon
There runs a road through trees, when Jupiter
Shrouds heaven, and inky night steals every
hue'

প্রবেশ পথের মুখে বিভিন্ন রোগের শরীরী মূর্তি দেখা যায়। মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গের সহিত 'ঈনীডে'র অংশ তুলনা করিলে তাহাদের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মৃতব্যক্তিদিগের বিতাড়িত আত্মা 'ঈনীডে' দেখা যায়।

···"Countless as leaves, that in an early
frost of autumn fall···"

'মেঘনাদবধে' অনুরূপ বর্ণনা—"পলাইলা রড়ে ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা বহিলে প্রবল ঝড়!" স্বর্ণশাখা দর্শনে গ্রীক অধোদেশের পরিখা 'স্টিক্স' (Styx)—নদীর খেয়া মাঝি 'কারণ' (Chaorn) সিবিল এবং ঈনীয়াসকে পার করিয়া দিলেন। 'মেঘনাদবধে' বৈতরণী নদীর সেতুরক্ষক যমদূত শিবের ত্রিশূল দেখিয়া নম্রভাবে মায়া ও রামচন্দ্রকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। বৈতরণী নদীতে সন্তরণমান পাপীদিগের কথা পড়িলে 'ঈনীডের' পাপীদের সন্তরণ মনে হয়। রামচন্দ্র যেমন লঙ্কাযুদ্ধে নিহত রক্ষীদের ছায়াদেহ দেখিলেন ঈনীয়াসও সেইরূপ সমুদ্রে বিনষ্ট তাঁহার পোতরক্ষকদের প্রেতাত্মা দেখিতে পাইলেন। "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত নাহি গতি এ নগরে···নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী যতদিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে যতনে"—রামচন্দ্রের প্রশ্নে মায়ার এই উক্তিতে 'ঈনীডের ' ঈনীয়াসের প্রশ্নের উত্তরে সিবিলের উক্তি মনে পড়ে—

'Helpless this crowd thou seest, unburied all
···'Tis not allowed
To cross the dreadful banks and currents hoarse
Until their bones win place for rest···'

বীরগণের আত্মা দর্শন করিয়া ঈলিসিয়ান (Elysian) ভূমির সুখৈশ্বর্যের মধ্য দিয়া ঈনীয়াস মুসেউস্ (Museaus) চারণের নির্দেশমত শ্যামল বনভূমিতে তাঁহার পিতার ধ্যানরত ছায়ামূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। 'মেঘনাদবধকাব্যে' রামচন্দ্র এইরূপ বীরাত্মাদিগকে দেখিয়া অলকার রম্য দৃশ্যের মধ্যে জটায়ুর নির্দেশমত শ্যাম ভূমিতে অক্ষয়বৃক্ষের নিম্নে ধ্যানমগ্ন দশরথের ছায়াদেহকে দেখিতে পাইলেন। 'মেঘনাদবধের' ন্যায় 'ঈনীডের' প্রারম্ভাংশেও মিউসের (Muse) বন্দনা দেখি।

('ঈনীডে'র এই অনুবাদগুলি Prof Duff কৃত)

চতুর্থ সর্গে সীতার স্বপ্ন—"দেখিনু সম্মুখে সখি, অভ্রভেদী গিরি" ইত্যাদির সঙ্গে ভার্জিলের 'ঈনীড' কাব্যের দৃশ্য-সাদৃশ্য আছে। অ্যাঙ্কাইসিস্ (Anchises)-এর পিতা ঈনীয়াসের এইরূপ ভবিতব্য-দ্বার খুলিয়া পুত্রকে দেখাইয়াছিলেন।

এ কথা বলা অসঙ্গত হয় না যে ভার্জিল, দান্তের প্রভাব মধুসূদনকে অষ্টম সর্গ রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কাব্যের আখ্যান-বস্তুর সহিত এই সর্গটির সংযোগ সামান্য। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য কৈলাসে শিবদুর্গার কথোপকথন হইল, ত্রিশূলী আপনার ত্রিশূল মায়াদেবীর হস্তে দিয়া অধোলোকে দশরথের প্রেতাত্মার নিকট রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে বলিলেন। দশরথ লক্ষ্মণের জীবনোপায়ের কথা বলিয়া দিবেন। সুতরাং এইভাবে অতি শক্তিশালী অষ্টম সর্গটির সম্ভাবনা হইল এবং সমগ্র কাব্যখানিকে সমৃদ্ধতর করা গেল। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দেবাদিদেব মহাদেব বিশল্যকরণীরূপ সামান্য ওষধির সন্ধান নিমিত্ত দুঃসাধ্য কর্মে রামচন্দ্রকে প্রবৃত্ত না করিয়া নিজে বলিয়া দিলেন না কেন?

এইবার দান্তের কিছু কথা আসে। 'Divina Commedia'-র 'Inferno'-অংশের সহিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অষ্টম সর্গের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

'ইনফার্নোতে' দেখা যায় ভার্জিলের আত্মা দান্তেকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন। ইনফার্নোর প্রবেশ দ্বারে উৎকীর্ণ ভীষণ কথার সহিত তুলনা করি—

"আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ মুখে,—এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখ দেশে চিরদুঃখ ভোগে ;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।"

"Through me you pass into the city of woe,
Through me you pass into eternal pain ;
All hope abandon ye who enter here"

(Cary's tran. of 'Inferno')

তাহার পরে আকেরন (Acheron) নদী (বৈতরণী) এবং খেয়া মাঝি কারণকে (Charon) দেখা গেল। 'মেঘনাদবধ' এবং 'ঈনীড' কাব্যের অন্তেষ্টিক্রিয়ার ন্যায় এই কাব্যে ধর্ম ও দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বলা হইয়াছে। তাহা ভিন্ন পুণ্যাত্মাগণও সক্ষম নহেন। ইনফার্নোর অধোদেশের বর্ণনার সহিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অষ্টম সর্গের অতি নিবিড় সংযোগ আছে। ইনফার্নোর দ্বিতীয় চক্রে কামী এবং তৃতীয় চক্রে উদরপরায়ণের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। কেরবেরাস (Cerberus) কর্তৃক পাপীর শাস্তি—

..."Clawed the hands, with which
He tears the spirits, flays them and their limbs
Piecemeal disparts......"

'মেঘনাদবধে' নানাস্থানে এইভাবে পাপাত্মার শাস্তি দেখি—

"বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ি ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে—"

এই পক্ষিটি হার্পিস (Harpis)। ষ্টিজিয়ান (Stygian Lake) হ্রদে পাপীর শাস্তি হইতেছে।

> …"A lake, the Stygian named expands
> The dismal stream…
> …In the marish sunk described
> A miry tribe……"
> "কতক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
> মহাহ্রদ ;……
> —ভাসিছে তাহে কোটী কোটী প্রাণী"

মরুক্ষেত্রগুলির সন্ধানও দান্তের কাব্যে আছে। ইনফার্নোর বিভিন্ন চক্রে যেসব পাপী ও তাহাদের যেসব শাস্তির ব্যবস্থা দেখি তাহাতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি দেখাইয়া দেওয়া একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। যদি কেহ মনোযোগ সহকারে দুইটি একত্রে পাঠ করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন। তবে 'Divina Commedia'-র কেবল 'Inferno'-এর সাদৃশ্য দেখি 'মেঘনাদবধে'। 'Paradiso' এবং 'Purgatorio' নামক অংশ দুইটির সঙ্গে সাদৃশ্য নাই। ধর্মসম্পর্কীয় আলোচনার আনুষঙ্গিক দ্বারা দান্তে স্বীয় কবিত্বশক্তি নিয়োজিত রাখিয়াছেন। মধুসূদন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিয়া রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাব্য আত্মার সন্ধান করিলে মধুসূদন ও হোমার একাত্মা, কিন্তু মধুসূদন আরও অনেক পরিমাণে কাব্যধর্মী। তাই রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে পাশে তিনি ফুল ফুটাইয়াছেন, প্রেম ও প্রীতির করুণমধুর চিত্রে, নিসর্গ শোভার অনুপম বর্ণনায়, হৃদয়বৃত্তির সুকোমল অভিব্যক্তিতে। অধ্যাত্মীয় পরিমণ্ডলে মধুসূদন প্রবেশ না করিলেও তাঁহার অপরূপ কবিসত্তা হোমরীয় কাব্যপরিধির মধ্যে চির জাগরূক ছিল।

টাসো—'মেঘনাদবধ' রচনার সময়ে মধু টাসোর 'জেরুসালেম উদ্ধার' কাব্যখানি আগ্রহে পাঠ করিতেছিলেন। অতএব ধারণা করা স্বাভাবিক যে টাসোর সুরের ঈষৎ ধ্বনি, 'মেঘনাদে' আসিতে পারে। সত্যই টাসোর রচনার কোন অংশের ছায়া সমালোচক 'মেঘনাদে' খুঁজিয়া পান।

হোমারের নিকট হইতে মধু যত পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তত ঋণ আর কাহারও নিকট হইতে নেন নাই। টাসোর বিরাট কাব্যের ছায়াপক্ষ কখনও বা 'মেঘনাদের' অঙ্গাবরণ করিলেও টাসোর নিকটে মধুর ঋণ স্বল্প। বরঞ্চ টাসোর ভঙ্গির সঙ্গে কবির ভঙ্গি তুলনা করা যায়।

"...The lyrical and ornamental tradition......is enriched with a religious solemnity and dramatic intensiy." Cassell's 'Encyclopaedia of Literature'.

টাসোর দীর্ঘ বিশ খণ্ডের সাঙ্গরূপক কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব মনোহারী বর্ণনা, প্রবল কবিত্ব এবং অতিপ্রকট রোমান্টিক প্রবণতা। গল্পের প্রধান উপজীব্য খৃষ্টধর্মের পটভূমিকায় নারীর সহিত সংগ্রাম এবং নারী-চরিত্র। আমাজোন-সুলভ বীরাঙ্গনা ক্লরিণ্ডার (Clorinda) চিত্র দ্বাদশ সর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বাদশ সর্গে বীর নাইট টানক্রীডের (Trancred) হস্তে ক্লরিণ্ডার মৃত্যু ঘটিল। ক্লরিণ্ডাকে "Stout Clorinda" (tran. by Edward Fairfax) বলিয়া বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার বর্ণনা হইতে মধু প্রমীলাচরিত্র পাইয়াছেন, জীবনীকার যোগীন্দ্র বসুর মত। কিন্তু ক্লরিণ্ডার চরিত্র বর্ণনার সহিত বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র স্বভাব একীভূত। এমন নায়িকা প্রেমে অনভিজ্ঞ, পুরুষালি সংগ্রামে প্রীত, প্রসাধনে অপটু, ভালবাসায় অদীক্ষিত নারী। প্রমীলা চরিত্র এমন নয়। ক্লরিণ্ডার নাইটদের সহিত যুদ্ধ-লিপ্সার ভাষা-প্রকাশ অবশ্য প্রমীলা ও সহচরী নৃমুণ্ডমালিনীর বীরভাষণকে স্মরণ করায়। ক্ষাত্রতেজদীপ্তা

প্রমীলার রণসজ্জা বীরাঙ্গনা ক্লরিণ্ডার মত। টাসোর নারীরূপ ও সজ্জার বর্ণনা মধুকে অবশ্য কিছু প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কিন্তু এ সাদৃশ্য বাহ্য মাত্র। জীবনীকার আবার মায়াময়ী আর্মিডার (Armida) উপবনে ভ্রান্ত বীর রিনাল্ডোর (Rinaldo) বিলাস-লীলার ছায়া পাইয়াছেন প্রমীলা ও মেঘনাদের প্রমোদউদ্যান দৃশ্যে। কিন্তু এই সাদৃশ্যও সম্পূর্ণ বাহ্য। আত্মিক মিলন দুই দৃশ্যে থাকা সম্ভব নয়, কারণ প্রমীলার স্বামীর জন্য আত্মবিসর্জী প্রেম আর্মিডার কামকেলী নয়। লক্ষ্মণের চণ্ডীদেউলে গমনের পূর্বে। (৬ষ্ঠ সর্গ) প্রলোভন এবং বিভীষিকার আবির্ভাব টাসোর আর্মিডা-পুরীর পথ মনে করায়। প্রায়ামকে হেলেন যেমন গ্রীক যোদ্ধাদের চিনাইতেছিলেন অনুরূপ দৃশ্য টাসোর 'জেরুসালেম ডেলিভারড'-এ পাওয়া যায়। আরমিনিয়া রাজা আলাডিনকে অবরোধকারী নাইটদের চিনাইতেছেন (৩য় সর্গ)।

টাসোর কাব্যে প্রেম, নারীরূপ, প্রথম হইতে সারাটি কাব্য আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বরঞ্চ, নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্রে'র প্রতিরূপ টাসোতে দেখি। 'হোমরিক' ভীষণতা এই কাব্যে অদৃশ্য। অনুপম কবিতার মাধুর্যে টাসোর কাব্য উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া আদৃত। মধুর কবিধর্ম টাসোধর্মী, যদিও কাব্যের গঠনে তিনি হোমারের সহিত একাত্মা। মধুসূদনের কাব্য যদি মহাকাব্যলক্ষণচ্যুত হয় তবে সাঙ্গরূপক কাব্য 'জেরুসালেম উদ্ধার' লিখিয়াও টাসো এপিক লেখেন নাই বলিতে হইবে।

টাসোর কাব্য ইলিয়াডের আদর্শে বাহ্যিক গঠিত। একটি কাহিনী এবং একটি সুস্পষ্ট ক্রিয়া আদ্যন্ত পরিলক্ষিত। ট্রয়ের অবরোধের ন্যায় জেরুসালেম-অবরোধ টাসোর প্রতিপাদ্য। নায়ক গডফ্রে (Godfrey) ঐতিহাসিক নাইট। তিনি ইলিয়াডের আগামেমনন। পৌত্তলিক তুর্কীর হস্ত হইতে খৃষ্টের সমাধিভূমির উদ্ধার কাব্যের প্রতিপাদ্য। আকিলিসের প্রতিরূপ রিণাল্ডো।

আকিলিসের মতই রিণাল্ডোর ক্রোধ তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সাময়িকভাবে অপসারিত করে কিন্তু তার পরেই টাসো আরমিডার বাহুপাশে ধরা দিলেন। বীর রমণী এরমিনিয়ার (Erminia) প্রেমোচ্ছ্বাস শোনা গেল, শৌর্যকীরিটি টানক্রীডের ক্লরিণ্ডানিধনে ভাবালু বিলাপের সৃষ্টি হইল। অতএব টাসো হোমারের পথ হইতে নিজের পথে কবিত্ব, মাধুর্যের সঙ্গী হইয়া চলিয়া গেলেন। নারীর বন্দনা তিনি করিলেন। হোমারের সহিত তাঁহার পার্থক্য সৃষ্ট হইল। মধু এইখানে হোমারের শিষ্যত্ব হইতে কবিধর্মে ইতালীয় কবির শিষ্য হইলেন সাময়িকভাবে।

টাসোর কাব্যের কোন কোন পংক্তি আলোচনা করিলে মধুসূদনের সহিত টাসোর কবিধর্মের সমভাব দেখা যায় (রোমান্টিক ক্ষেত্রে)। 'Jerusalem Delivered'-এর প্রথম পংক্তি সুস্পষ্ট ভার্জিলের অনুসরণ—

> "The sacred armies, and the godly knights
> That the great sepulchre of Christ did free
> I sing……"

পরবর্তী স্তবকের সঙ্গে মধুর 'মেঘনাদবধের' আহ্বানের অধিক মিল—

> "O heavenly Muse……
> Inspire life in my wit"—

তার পরে কল্পনার ক্ষেত্রচারণের জন্য টাসো কাব্য-লক্ষ্মীর নিকট অনুমতি চাহিয়াছেন। মধুও কল্পনাদেবীর বন্দনা করিয়াছেন। টাসোর প্রবল কবিত্ব রোমান্টিকধর্মী অথচ তিনি মহাকাব্যের রচয়িতা। মধুর কবিমানস কখনও বা হোমারধর্মী অপেক্ষা টাসো-ধর্মী। লিরিক উচ্ছ্বাস এবং রোমান্টিক প্রবণতা যদি 'জেরুসালেম উদ্ধার'কে মহাকাব্য-যশোবঞ্চিত না করে; 'মেঘনাদবধ'কেও করিবে না।

টাসোর কবিমানসের স্বরূপ এক স্তবক কবিতার মধ্যেও চমৎকার দৃশ্যমান।

"The Purple morning left her crimson bed
And donned her robes of pure vermillion hue
Her amber locks she crowned with roses red
In Eden's flowery garden's gathered new."

(Third Book)*

Edward Farifax মিলান্ত পদে বৃহৎ অনুবাদ গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—

"Jerusalem Delivered is a romantic treatment of the First Crusade."

পূর্বোক্ত 'religious solemnity' বা ধর্ম-প্রবণতা টাসোর অনুপম সৃষ্টির কোথাও হাস্যকর আপোষ আনিয়াছে, যথা ক্লরিণ্ডা খৃষ্টান নাইটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অবশেষে মৃত্যু-মুহূর্তে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা লইল (দ্বাদশ স্বর্গ)। মধুসূদন ধর্মভাবসম্পন্ন হইলেও কোথাও এই শুচিবাই দেখান নাই। হোমারের মতই তিনি নিজে ধর্ম-প্রচারক সাজেন নাই।

মিলটন—মিল্টনের প্রতি মধুর একান্ত আনুগত্য সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। মিল্টনকে মধু 'divine' বলিতেন। মিল্টনের কাব্যসাধনার বিশিষ্ট প্রভাব আমরা মধুসূদনের রচনায় প্রত্যক্ষ দেখি। মধুর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান অমিত্রছন্দ মিলটনের নিকট হইতে গৃহীত। ভাবধারায় সোজা ক্ল্যাসিক্সে আশ্রয় লইলেও কবির 'মেঘনাদবধ'-এ বহু স্থানে মিলটনের সাক্ষাৎ মেলে। সেই সাদৃশ্যের

* "হাসি দেখা দিল উষা উদয় অচলে
ফুটিল কুন্তলে ফুল"—'মেঘনাদবধ' (৬ষ্ঠ সর্গ)

বর্ণনাভঙ্গি এবং শব্দচয়নে টাসোর প্রভাব মধুসূদনে পরিলক্ষিত হয়।

সূত্র ধরিয়া দীর্ঘ সমালোচনার দ্বারা পুনরুক্তি করিতে চাই না। তবে মিলটনের প্রভাবউল্লেখ-বিহীন মধুর কাব্যসমালোচনা অপূর্ণ। আমরা দেখি মধুসূদনের প্রাথমিক ভারতীর আরাধনায় হোমার, ভার্জিল ভিন্ন মিলটনের 'Paradise Lost'-এর ছায়া। প্রমীলা ও ইন্দ্রজিতের নিদ্রাভঙ্গ বর্ণনার সঙ্গে Adam ও Eve-এর সমভাবাপন্ন অংশ তুলনীয়। 'Comus'-এর Sabrina Fair' 'মেঘনাদের' বারুণী। মিলটনের মত দেবচরিত্র অঙ্গনে মধু মানবীয় এবং দৈবভাবের একত্র সমাবেশ করেন।

স্থানে স্থানে মিলটনের কোনো অংশের প্রায় বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়—

"To look into the clear smooth lake
That is to me seemed another sky—"
('Paradise Lost'—Book IV)

"দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী"
('মেঘনাদবধ', ৪র্থ সর্গ)

মিলটনের সাহিত্য-প্রভাব মধুর সাহিত্যের নানা অঙ্গে পরিলক্ষিত হইলেও প্রধানতঃ মধুর ঋণ অমিত্রচ্ছন্দ। সীমাবদ্ধতার নিগড় মোচনের দ্বারা স্বাধীন স্রোতে ভাষাকে ভাসাইয়া চলার ছন্দ মধু গ্রহণ করিলেন ইংলণ্ডের মিলটনের কাছে। এই ছন্দে যতিপাত ও ছেদপাত ভাব-ধারার ইচ্ছাধীন। ভাব এক পংক্তি হইতে অন্য পংক্তিতে গড়াইয়া চলে। অমিত্রচ্ছন্দে চতুর্দশ অক্ষরের বৃত্তি, কিন্তু অন্তমিল নাই মিতাক্ষর পয়ারের মত। যেখানে ভাবের সমাপ্তি সেখানেই পূর্ণচ্ছেদ। অনুপ্রাস যমক ও বিরামবৈচিত্র্যে দীর্ঘ 'মেঘনাদ' অপরূপ। ভাব কখনও দ্রুত, কখনও স্তিমিত, কখনও স্থগিত হওয়ায় ছন্দসৃষ্টি বিস্ময়কর। মিলটনের ছন্দের এই শক্তি মধু বাংলা ভাষায় উপহার

দিলেন। যতি ও মিলের বন্ধনহীন ছেদকে মধু ভাবের অনুগামী করিয়া ছন্দে প্রবহমানতা সৃষ্টি করিলেন ('আঙ্গিক' দ্রষ্টব্য)।

দেশীয় প্রভাব—দেশীয় কবির রচনা-ঋণী 'মেঘনাদবধ'কে বলা চলে না। মধু আদিকবি বাল্মীকির ভক্ত থাকিলেও অনুসৃতি-বিরত ছিলেন। বরঞ্চ শৈশবে চিত্ত-গ্রথিত কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপাদান দিয়াছিলেন। রামায়ণের কাহিনী কাব্যের পটভূমিকা। প্রমীলা-চরিত্র মধুসূদন কাশীরাম দাসের হস্ত হইতে গ্রহণ করেন। রামচরিত্র কৃত্তিবাসের, পূর্বেই বলিয়াছি। চতুর্থ সর্গে মধু বাল্মীকির বন্দনা করেন। প্রথম সর্গে তিনি ভারতীর বন্দনাসহ বাল্মীকির কবিত্বকীর্তন করিয়াছিলেন। অন্য সর্গ রচনার পক্ষে দুরূহ হইলেও মধু বাল্মীকির কোন পুনর্বন্দনা করেন নাই। 'ইলিয়াডের' অনুকরণে কাব্যটি লিখিত হইলেও সীতাচরিত্র বিদেশী নয়। বাল্মীকির অবদানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সীতার আদর্শ চরিত্র মধু বর্ধিত করিয়াছেন। এই আদর্শ হিন্দুনারীর চিত্র বিদেশী কোথায় পাইবে? তাই তো বাল্মীকির বন্দনা। দণ্ডকবাসের বর্ণনা ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিতমের' সঙ্গে তুলনীয়। বাল্মীকির রামায়ণে উল্লিখিত ভাবধারায় চতুর্থ সর্গ পুষ্ট।

দ্বিতীয় সর্গে হর-পার্বতী মিলনের দৃশ্যে 'ইলিয়াডের' সঙ্গে কালি-দাসের 'কুমার সম্ভবম্'-এর দীপ্তি দৃশ্যমান। শৃঙ্গাররস বর্ণনায় মধুর মনে কালিদাসের রসানুভূতি দেখা যায়।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে চতুর্থ সর্গ মধু চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে পাইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে মেয়েরা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ* বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলোৎসবে গান করিতেন। মধু বিভিন্ন স্থানে

* চন্দ্রাবতী—ষোড়শ শতাব্দীর মহিলা কবি। পিতার নাম বংশী দাস। সীতার বনবাস পর্যন্ত রামায়ণ কবি চন্দ্রাবতী রচনা করিয়াছিলেন। ব্যর্থ প্রেমে চন্দ্রাবতীর বেদনা 'ময়মনসিংহ গীতিকার' কোন গাথার উপজীব্য।

গান শুনিতে ভালবাসিতেন। সুতরাং চন্দ্রাবতীর রামায়ণ শোনা বিচিত্র কি? প্রমীলার চিত্র কাশীরাম দাসের 'অশ্বমেধ পর্ব'* হইতে গ্রহণ করিলেও কোন কোন সমালোচক মধুকে এই চরিত্রের জন্য সুহৃৎ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' কাব্যের নিকট ঋণী বলেন। কিন্তু, পদ্মিনীর বীরসজ্জা এবং প্রমীলার বীরসজ্জা উভয় কাব্যে বর্ণিত হইলেও মধুর কাব্যমানসের ঋণ রঙ্গলালের নিকটে নয়। রঙ্গলাল পাশ্চাত্য ভাবে কাব্য লিখিয়া পূর্বসূরী হইলেও মধুর কাব্যের ধাতু পৃথক। প্রতীচ্যের কাব্য সমূহের, বিশেষতঃ 'ইলিয়াডের' ধাতুতে গড়া 'মেঘনাদবধে' দেশীয় প্রভাব সম্পর্কে তাই অতিরিক্ত আলোচনায় বিরত হইলাম।

মেঘনাদের আঙ্গিক—মিলটনের ছন্দ গ্রহণ করিলেও ভার্জিলের 'ইনীড' কাব্যের ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি মধুকে আরও ভার্জিলভক্ত করিয়াছিল। ভাবানুসারে নিয়ন্ত্রিত ভার্জিলিয়ান ছন্দে তাঁহার অনুরাগ তিনি ব্যক্ত করেন। কিন্তু পয়ারপ্লাবিত বাংলাদেশে পয়ারভাঙ্গা অমিত্র ছন্দ সংস্কৃত ছন্দেরও সাহায্যসাপেক্ষ ছিল। গাম্ভীর্য হেতু যুক্তাক্ষর প্রয়োগে, লালিত্য হেতু যমক, অনুপ্রাস প্রয়োগে মধু অমিত্র ছন্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। মধুর দীর্ঘ কাব্যে কোথাও একছন্দ ব্যবহারের একঘেয়েমি নাই। অমিত্রাক্ষরের মিলশূন্য চরণে ধ্বনি দ্বারা কবি বৈচিত্র্য সম্পাদন করিলেন। সংস্কৃতের নিকট এইবার তাঁহাকে ঋণী হইতে হইল। মধুর ভারতীয় সাহিত্যের নিকট প্রধান এবং প্রথম ঋণ এখানেই। সংস্কৃত ছন্দে সঙ্গীতের প্রধান নির্ভর হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের বিন্যাস ও যুক্তাক্ষরবাহুল্য। এই সঙ্গীত মধু সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলাভাষায় আনিলেন (এই

* 'যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা নারী দেশে'
(৩য় সর্গ-মেঘনাদ)

সঙ্গে মিলটনীয় প্রভাব দ্রষ্টব্য)। প্রবহমান পয়ার মধুসূদনের দান বাংলার সমগ্র কবিকুলকে—এই ছন্দ গতানুগতিক বাংলা গীতিছন্দকে অতিক্রম করিয়া সকল অনুভূতির, সকল রূপরসের প্রকাশসক্ষম বিশিষ্ট ছন্দ।*

সংস্কৃত কাব্যছন্দে মিলান্ত পদ নাই, কিন্তু যুক্তাক্ষরধ্বনির সমাবেশে সুমধুর সঙ্গীত সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃতের মত শ্রুতিসুখকর, সঙ্গীতময় ভাষায় মিলের অভাব অনুপ্রাস-যমক-যুক্তাক্ষর ইত্যাদি পূরণ করিয়াছে। শব্দ সেখানে ধ্বনি-মাধুর্যের প্রধান উপাদান। মধুসূদন ভাষারীতির এই বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করিলেন। বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষার নিকট হইতে তাঁহাকে সোজাসুজি শব্দ চয়ন করিতে হইল। তাই অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার ভাষা আমাদের কাছে দুরূহ মনে হয়। কিন্তু শব্দপ্রয়োগে নৈপুণ্য দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য ভাব প্রকাশের জন্য মধুকে অভিজাত সংস্কৃত ভাষাকে বহন করিতে হইয়াছিল। সংস্কৃত ঝঙ্কারসহ খাঁটী বাংলা বাক্‌পদ্ধতি ও উচ্চারণরীতির ছন্দ, এবং পয়ারের চরণ মধুসূদনের প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষরের অন্তর্নিহিত রহস্য। বিদেশী ব্ল্যাঙ্ক ভার্স অপেক্ষা মধুসূদনের এই সুললিত সঙ্গীতবহ নূতন বাংলা ছন্দ অমিত্রাক্ষর।

বাংলাভাষার গ্রাম্যতাদোষ মুক্ত করিয়া শালীন সংযমবদ্ধ বিশুদ্ধ ভাষা মধু কবিভাষা রূপে বাংলার কবিদের উপহার দিলেন। রোমান্টিক মন ক্লাসিকাল ভাষাভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করিল। 'মেঘনাদের' নির্মাণকৌশল ক্লাসিক অনুসৃতি। সেই সঙ্গে ভাষা ভঙ্গিও ক্লাসিক। সযত্ন পরিচ্ছন্নতায় ও সংযমে কবি 'বাণীমূর্তি' নির্মাণ করিয়াছেন। গ্রীক রচনার মত অলংকারপ্রয়োগ 'মেঘনাদে' লক্ষণীয়।

* 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের অমিত্রাক্ষর গীতিসুরপ্রধান। মহাকাব্য রচনার উপযোগী নয়। অতএব মধুসূদন নানা প্রক্রিয়ায় অমিত্রাক্ষরকে উপযোগী করিয়া মহাকাব্যের বাংলাছন্দ গড়িলেন।

ভাষার বিন্যাসে (syntax) বা গঠনে কখনও মধুসূদন পাশ্চাত্য ভঙ্গির বহুল প্রচলন করিয়াছেন। যথা—

"ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে
উর্মিলাবিলাসী নাশি" ইত্যাদি।

('মেঘনাদবধ', ১ম সর্গ)

এখানে ইংরেজি ভাষার মত প্যারেনথিসিস্ প্রয়োগ দেখা যায়, যথা 'অজেয় জগতে' শব্দ মধ্যে প্রয়োগ।

এমনি বহু উদাহরণ মধুর রচনায় পাওয়া যায়।* দেশীয় এবং বিদেশীয় ভাবের বিচিত্র মিলন ভাষা-ভঙ্গিতে থাকিলেও মধুর রচনাকৌলীন্য সংস্কৃত ভাষার অঙ্গরাগের দ্বারা বর্ধিত। সংস্কৃত অলঙ্কারের প্রতি আসক্তির পরিচয় মধুর কাব্যের ছত্রে ছত্রে। রূপক, উপমা, উপমানের প্রতি কবির অপরিসীম অনুরাগ। শব্দালঙ্কারের ও অর্থালঙ্কারের প্রতি মনোযোগ তাঁহার বৈশিষ্ট্য। ভাবের যথাযথ প্রকাশের জন্য তিনি অলঙ্কারের আশ্রয় লইয়াছিলেন। রূপক,—উপমা—উপমানের আধিক্য কখনও বা আধুনিকের কাছে তাঁহার ভাষাকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। "উপমা কালিদাসস্য" বলিয়া খ্যাত আছে, মধুসূদনে সেই উপমার জয়পত্র। তিনি প্রতীচ্য সাহিত্যিক অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যশালী।

মধুর কাব্যে নানা অলঙ্কারদোষ সংস্কৃত পণ্ডিতবৃন্দ দেখিয়াছেন। প্রতিভাসন, ব্যাকরণতুষ্টতা, অপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগ, দুর্বোধ্যতা তাহার মধ্যে প্রধান। ইতিপূর্বে, শ্রুতি-সুখকর হেতু বিদ্রোহী মধু যে ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করিয়া শব্দ চয়ন করিতেন তাহা বলিয়াছি ('বিপ্লব' পরিচ্ছেদে) এই ভাবে নানা নূতন শব্দরচনার (coinage) জন্য মধু দায়ী। সেই সমস্ত শব্দ মুগ্ধবোধে অপাংক্তেয় হইলেও ভাষাতত্ত্বের

* "জনরবের অসংখ্য জিহ্বা" ('মায়া কানন'-তৃতীয় গর্ভাঙ্ক) এই প্রয়োগ পাশ্চাত্য।

ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। কয়েকটি অপ্রচলিত, নবনির্মিত শব্দ আমরা উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপিত করিতেছি।*

"মুক্তিল"†—মুক্তাফল দিয়া সাজানো, (৩য় সর্গ)

"ধূপ—ধূমি ধূপদানে"—ধূমদান করিয়া, (৫ম সর্গ)

"সমরিবে"—যুদ্ধ করিবে,

"আয়াসিতে"—আয়াস দিতে,

"মর্দি"—মর্দন করিয়া,

"শাস্তিয়া"—শাস্তি দিয়া (৬ষ্ঠ সর্গ), ইত্যাদি।

যে অমিত্র ছন্দ মধু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার প্রবহমানতা রক্ষা করিবার অভিলাষ কবিকে প্রচুর শব্দচয়নে ও শব্দনির্মাণে উৎসাহী করিয়াছিল। নির্মাণকৌশলের নানা বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিকতা 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও মধুর রচনাবলীকে এমন রূপ দিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অতুলনীয়। নূতন আঙ্গিক বাংলাভাষায় গ্রহণ করিয়া সেই আঙ্গিককে আবার নূতনত্ব তিনি দিয়াছিলেন। বিদেশী ইঙ্গিতের সূত্র ধরিয়া দেশের মৃত্তিকায় তিনি তাঁহার কাব্যসরস্বতীর দেহ পরিগঠন করিয়াছেন।

যতির নানারূপ (বিরাম যতি, ললিত যতি, ধীর যতি, ছন্দ যতি) ব্যবহারের দ্বারা মধুসূদন মহাকাব্যের ভাবকে পরিস্ফুট রাখিতে পারিয়াছেন। পয়ারের (৮—৬) ভাগ বজায় রাখিয়া ঝোঁক বা stress দ্বারা ছন্দস্পন্দন মধুর অমিত্রাক্ষরের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

* এই সূত্রে গদ্যেও নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয় যথা—"রচিয়া" দিতে পারিলাম না, "যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্তিস্তম্ভ নির্মিতেছ" ইত্যাদি।

('হেক্টর বধ')

"যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে"—('মেঘনাদবধ') এই ধরণের শব্দগাম্ভীর্য (অপ্রচলিত শব্দসহ) রবীন্দ্রসাহিত্যেও প্রচুর।

† এই সূত্রে উল্লেখ্য যে 'মুক্তিল' পর্যায়ের নামধাতুর প্রয়োগ বিদ্যাসাগরের গদ্যেও আছে আর রবীন্দ্রকাব্যে ইহার বহুল প্রয়োগ।

কবির আর একটি বিশেষত্ব 'Verse-paragraph' বা পদ্য পংক্তিব্যূহ। মোহিতলাল সংক্ষেপে এই প্রণালীকে 'পংক্তিব্যূহ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ('বাংলা কবিতার ছন্দ') "স্বল্প ও দীর্ঘ বিরামযুক্ত বহু বাক্য ও বাক্যাংশের সমাহার বা সঙ্গীতসঙ্গতির সহায়ে, একটি ভাব, একটি চিত্র বা একটি ব্যাখ্যান যে পূর্ণ ছন্দরূপ লাভ করে—তাহাই অমিত্রাক্ষরের পংক্তিব্যূহ।"

(মোহিতলাল—'মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ')

মিলটনের অনুগামী এখানে মধুসূদন। এই Verse-paragraph দ্বারা মধুর অমিত্রাক্ষর প্রকৃত ছন্দ-গৌরব লাভ করিয়া মিলটনের সমকক্ষ হইয়াছে। 'বীরাঙ্গনা' দ্রষ্টব্য, যথা—

"যেদিন—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যেদিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ—অতুল জগতে"—ইত্যাদি

('সোমের প্রতি তারা')

সঙ্গীতাত্মক সংস্কৃত ভাষাপরিগঠিত মধুসূদনের পংক্তিব্যূহ ইতস্ততঃ মনিমুক্তার ন্যায় বিকীর্ণ—মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্টের' ছন্দমণ্ডল এখানে আরও শ্রুতিসুখকর-রূপে বিন্যস্ত।

আদি কবি হোমারের 'ইলিয়াড' ভীষণ ও মহৎ কাব্য। এই মহাকাব্যকে কখনও বা 'The wrath of Achilles' নামে আখ্যাত করা হয়। কাব্যখানির শেষ পংক্তি প্রথম পংক্তিকে মনে করায়। গাথার রূপে আবৃত্তিযোগ্য কাব্যখানি 'হোমরিক সিমিলি' পূর্ণ, ভাষা কখনও অমার্জিত। কিঞ্চিৎ আদিম ভাবের স্বাক্ষর পরিস্ফুট। পনেরো হইতে ষোল হাজার লাইনের সুদীর্ঘ মহাকাব্যে বিশাল ব্যাপ্তি; সর্বমনের বিভিন্ন রূপসম্পাতের আলেখ্য। কিন্তু আকিলিসের নিদারুণ নির্মম ক্রোধের মতই উত্তপ্ত মরুদাহন 'ইলিয়াডে'। যে

সমুদ্রতীরে অনির্বাণ চিতা জ্বলিতেছে, তাহার জল প্রতিশোধের অনলে একবিন্দুও শান্তিবারি বর্ষণ করিতে পারে না। আদিম মানুষের আদিম প্রবৃত্তির উদ্দীপ্ত পটভূমিকায় প্রেম-মায়া-মমতার পদচিহ্ন কম। কামনা সেখানে কামনাই, প্রেমের মোহন স্পর্শে রূপান্তরিত নয়।

এই দগ্ধ ভূমিখণ্ডের পাশে সবুজ শস্যের পাড় বুনিয়া দেয় 'মেঘনাদ বধ'। সেখানে প্রেম ভালবাসার স্নিগ্ধ হরিৎস্পর্শ। সুন্দরী উপপত্নী ব্রিসেইসের জন্য কোন বীর আকিলিস সেখানে ক্ষুব্ধ আক্ষেপে কাব্যের অঙ্গে বিক্ষোভের চিহ্ন লেখেন নাই। প্রতিশোধের অনল সেখানে ধর্মীয় হোমানল। সেখানে বীরের চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে বিষাদ। 'ইলিয়াডে'র অগাধ ব্যাপ্তি সেখানে না থাকিলে সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতির রূপলেপ আছে। 'ইলিয়াডে'র বহু যুগ পরের 'মেঘনাদে' তাহাই অনিবার্য।

বিস্মৃত সভ্যতার আলোছায়ায় বহু জাতি, বহু মানবের পদধ্বনিত যুদ্ধক্ষেত্রের ইতিহাস হোমারের কাব্য; বহু প্রাচীন দেশের দর্পণ। অজস্র আখ্যান, অজস্র চরিত্রের রত্নপেটিকা হোমারের মহাকাব্য— সে তুলনাবিহীন।

হোমারের আদর্শে কবি ভার্জিলের মহাকাব্যের প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত, কৌশলী। গ্রীক মহাকবির অনুসারী ভার্জিলের ল্যাটিন কাব্য 'ঈনীড' সযত্ন পরিমার্জনে রচিত। বারোটি খণ্ডের কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গির অনবদ্য রূপও কঠোর সমালোচক ভার্জিলকে তৃপ্ত করে নাই—প্রকাশে তাই তাঁহার আপত্তি ছিল। এই সযত্ন অনুশীলনের ছাপ কাব্যের সর্বত্র। জুলিয়ান-রাজবংশের গৌরবকীর্তনে পূর্বপুরুষ ঈনীয়াসের যে অভিযান, তাহা মানবাত্মার অজ্ঞাত রহস্যের কূলে চিরভ্রমণের যাত্রা। তাই 'ঈনীড' সর্ব দেশের মনোহরণ করিয়াছিল। কিন্তু উদ্দেশ-প্রণোদিত ভার্জিলের এই Epic of Art সুচিন্তিত পরিকল্পনায় শিল্পসৌন্দর্যে নির্মিত সৌধ, কলালক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্তের প্রসাদ। তবু সম্রাট আগাষ্টাসের পূর্বপুরুষ

ট্রোজান ঈনীয়াসের চরিত্রচিত্রণে ভার্জিলকে অতি সাবধান হইতে হইয়াছিল। শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের ভারে ঈনীয়াস সহজতা, সাবলীলতা হইতে বিচ্যুত। তাই নায়ক জনপ্রিয় নন, তাই রাজাসনের ছায়া পড়ে কাব্যে।

'ঈনীডের' শক্তি 'মেঘনাদে' নাই সত্য, কিন্তু মেঘনাদের চরিত্র ভালবাসার উদ্রেক করে—মেঘনাদের মৃত্যু চোখে জল আনে। আর সমস্ত চরিত্রগুলি জীবন্ত হৃদয়ে জীবন্ত হইয়া দাঁড়ায়। মধুর কাব্যে মধুরকরুণ রস মানবীয়। 'মেঘনাদে' সযত্ন পরিশীলনের, ঘষামাজার ও শ্রমের চিহ্ন নাই—সাবলীল, সহজ রচনা।

ইতালীয় কবি দান্তের 'দিভিনা কমেডিয়া'য় রসাতলের পথে মহাকাব্যকারের প্রাচীন যাত্রা, পথ-প্রদর্শক ভার্জিল। মহাকাব্যের যথার্থ লক্ষণাক্রান্ত না হইলেও আধ্যাত্মিক উচ্চতায় ও ভাবের ঐশ্বর্যে কাব্যত্রয় জ্যোতির্ময়। রূপক ও প্রতীকধর্মী এই কাব্য মানবাত্মার জয়যাত্রা ও ধর্মীয় ধারণাপদ্ধতির আকাশ-সঙ্গীত।

এই নভোমণ্ডলে মধুসূদন উত্তীর্ণ হন নাই, যদিও রসাতলের যাত্রা তাঁহারও পথে পড়িয়াছে। কিন্তু রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে ভরা ছোট এই পৃথিবীর দুঃখ মৃত্যু আনন্দের গানই তিনি প্রধানতঃ গাহিয়াছেন। সেখানে দিব্যসঙ্গীত নাই, 'মুরজ মুরলী' আছে।

টাসোর সাঙ্গরূপক কাব্য 'জেরুসালেম লিবার্টা' ক্রুজেডযুদ্ধের এক রোমান্টিক ও অবাস্তব কাহিনী। গীতিপ্রবণ ও বাগালঙ্কারময় উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় টাসো ইতালীয় রেনোসাঁসের অবসাদের দিক চিহ্নিত করিয়াছেন। ক্ষীণ প্রতিধ্বনি দান্তের শোনা গেল আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় পরিবেশসৃজনের প্রয়াসমধ্যে। মধুসূদনের কবিসত্তা টাসোর অসীম কবিত্বসাগরে স্নান করিলেও মধুসূদনের ক্লাসিক সংযম ও ভারতীয় শালীনতা তাঁহাকে অধিকতর সংযমী করিয়াছিল।

মিলটনের কাব্য-আলোচনায় দেখা যায় 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'-এ মিলটন ঈশ্বরকে কাব্যমধ্যে সাক্ষাৎ উপস্থিত রাখিবার ফলে এক

সুকঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছেন। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের আদিম সম্বন্ধ এবং বর্তমান সম্পর্কের কারণ লইয়া এই মহাকাব্য পরিকল্পিত। দেবদূত ও দিব্যসত্তা-আকীর্ণ, স্বর্গীয় ভাবধারার কাব্যটি দান্তের কাব্যের কথা স্মরণে আনে। সঙ্গীত-ধ্বনি শব্দচয়নে, কল্পনার উচ্চতায়, কবিত্বের অনুপম সৌন্দর্যে মহনীয় কাব্য মিলটনের সৃষ্টি 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'। পরবর্তী খণ্ড 'প্যারাডাইস্ রিগেন্ড্' তুলনায় শ্রীহীন ও খৃষ্টধর্মের একখানি প্রচারপত্র।

ভাষার পরিগঠনে, ছন্দনির্মাণের নিপুণতায়, নানা কলাকৌশলের দক্ষতায়, সর্বোপরি কবিত্বের উৎকর্ষের জন্য বারবার মধুসূদনকে মিলটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

ঈশ্বরকে উপস্থিত রাখিয়া খৃষ্টধর্মসুলভ উল্লেখকণ্টকিত যে কাব্য, তাহার সুকঠিনত্ব 'মেঘনাদবধে' অদৃশ্য। 'মেঘনাদের' দেবদেবা পেগান দেবদেবী, খৃষ্টীয় একেশ্বর নয়। সুতরাং যদি সেখানে কখনও বা দেবমহিমার চ্যুতি ঘটে, 'প্যারাডাইস্ লষ্টে'র বিধাতার মহিমা চ্যুতির মত অপরাধ হয় না। বাইবেল হাতে মিলটনের কাব্যপাঠ করিতে বসিয়া নন্দনকাননের রূপশ্রী কখনও বা ম্লান হইয়া যায়। মধুসূদনের স্বর্ণলঙ্কার তীরে মানুষিক ভাবনা কাঁদিয়া ফেরে, তাহারা এই পৃথিবীর, স্বর্ণলঙ্কাও এই পৃথিবীর। করুণ-মধুর রসে পরিপ্লুত মনে মিলটনীয় কাব্যপাঠের উর্ধ্বে মানুষের বেদনা, মানুষের মহত্ত্ব জাগিয়া থাকে না কি ?

বাঙালী পাঠকের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই মধুর কাব্যপাঠে মনে হয় ঃ সব কিছু বুঝি এখানেই আছে। বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন মহা-কবির কাব্য যাহা দেয় নাই বোধহয় তাহাই পাইলাম। এখানে যে বৈচিত্র্য, যে কবিত্ব, যে ঐশ্বর্য, অল্পপরিসরে যে কলাকৌশল, তাহার আস্বাদে মুগ্ধ বাঙালী মন অন্য কাব্যগুলিতে এমন তৃপ্তি খুঁজিয়া পায় না। তিলোত্তমার মত তিলে তিলে রূপ আহরণ করিয়া

মধুসূদন যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, সেই কাব্যে উল্লেখিত কাব্যগুলির অল্পবিস্তর সকল স্বাদই আছে।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' যেন ভারতবর্ষের সমুদ্র। সমুদ্রের তীরে স্বর্ণলঙ্কায় রাবণ প্রথম সর্গেই সমুদ্রকে সম্বোধন করিতেছেন। শেষ সর্গে সেই সিন্ধুতীরে চিতাভস্ম জাহ্নবীর জলে প্রক্ষালন করিতেছেন রাক্ষস। সেই সিন্ধুমেখলা ভারতবর্ষের রূপ পাই মেঘনাদে।

বৈদেশিক কাব্যজলধি যেন আসমুদ্রমেখলা বিশাল ধরিত্রী; কখনও তরঙ্গভঙ্গে আরব্যোপসাগর, কখনও বিস্তৃতিতে ভূমধ্যসাগর, কখনও উত্তাল আটলান্টিক। আর মধুসূদনের কাব্য যেন ভারত-ভূখণ্ডের নানাবিধ সমুদ্রসৈকত।

ঐশ্বর্যে রাজসিকতায় দীপ্তমান রাক্ষসপুরী, সেখানে রণভেরী বাজিতেছে, যুদ্ধের কলরবে আকাশের পাখী ভীত। যে মান্দ্রাজ সমুদ্রকূলে মধুসূদনের প্রথম কবিত্ব উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, সে যেন সেই মান্দ্রাজের মহাবলীপুরমের বিক্ষিপ্ত উদ্ভ্রান্ত সমুদ্র।

বৈজয়ন্তধামের, কৈলাসশিখরের দেবদেবীর সোচ্চার মহিমায় কাব্য উড়িষ্যাখণ্ডে পুরীর সমুদ্রতীর। উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তার নভোচারী হইতে চায়। বালুবেলায় তার আকুতি দূরে মহাতীর্থের দেবাধিপতি জগন্নাথদেবের উদ্দেশে। সেখানে মহিমা ও গরিমা মহাসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে।

বনবাসী রাঘবের গোদাবরীতীরস্থ বনালয়ের স্বপ্নময় বর্ণনায় আবার কাব্য মেদিনীপুরের দীঘার স্নিগ্ধ-শান্ত সমুদ্র। 'পবিত্র-তুলসীর মূলে' সেখানে 'সুবর্ণ দেউটি' জ্বলে। সীতাদেবীর পুণ্য চরিত্রপ্রভায়, সখী সরমার সহানুভূতিপূর্ণ বচনে সেখানে শান্ত সমুদ্রের ঘুমপাড়ানিয়া মৃদু কলধ্বনি বাজে।

শিলাবন্ধনে বঙ্কিম সমুদ্র রামচন্দ্রের কটকের স্তব্ধ প্রতীক্ষার সম্মুখে বোম্বাই প্রদেশের মালাবার উপকূলের মত অপেক্ষায় থাকে।

সমগ্র 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য সমুদ্রমেখলা ভারতবর্ষ। বৈচিত্র্যের

বিভিন্ন উপাদানের মিলনক্ষেত্র এই কাব্যে ভাষা, ছন্দ, কবিত্ব, কলাকৃতি নানা উৎসজাতা তটিনীসমূহের মত বিশাল মহৎ পারাবারে মিলিত হইয়াছে। অপরিসীম কারুকার্যমণ্ডিত এক হীরকখচিত সুবর্ণমঞ্জুষা—এখানে বাংলার সমস্ত প্রেম, সমস্ত প্রাণমন, সমস্ত মহত্ত্বের স্বপ্ন, আশা ও সাধনা শান্তিনিদ্রায় ঘুমাইয়া আছে।

এখানে আদিম নারী আদিম পুরুষকে প্রলুব্ধ করে না—শুধু তাহার চিতায় পুড়িয়া মরে।

দ্বিতীয় পর্যায়—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'

মধুসূদনের প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের উৎসসন্ধান ও হোমারের সহিত তুলনা হইয়াছে। কবির সর্বপৃথিবীর জ্ঞানকে আমন্ত্রণস্পৃহা ও বিশ্বমানবতার পূর্ণ পরিচয় আমরা পাইলাম। 'মেঘনাদবধে' ভাবধারা প্রধানতঃ আমাদের আলোচ্য ছিল। আঙ্গিক অথবা টেকৃনিক্ ইত্যাদি গ্রহণের ক্ষেত্র অমিত্রছন্দের আশ্রয়। সেই অমিত্রছন্দ বৈচিত্র্যের অবকাশ-বিহীন। কবি কতটি ক্ষেত্র হইতে আর অমিত্রছন্দ গ্রহণ করিয়া বা বৈচিত্র্য-সম্পাদন করিয়া নানাবিধ নৈপুণ্যের প্রদর্শনী দেখাইতে পারেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা, এবং কয়েকজন সমালোচকের মতে মধুর শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা, 'চতুর্দশপদীতে' আঙ্গিক বা টেকৃনিকের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্র আছে। সনেটের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক প্রচলিত ছিল এবং মধু সেই আঙ্গিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'মেঘনাদে' আমরা ভাবধারার সংমিশ্রণ দেখিয়াছি এখানে আমরা আঙ্গিকের গ্রহণ দেখিব। মহাকাব্য এবং গীতিকবিতা এই দুইটি পর্যায়ে মধুর প্রতিভার সম্যক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনীয়। "মেঘনাদবধের কোলাহল-মুখরিত রণোন্মাদনার পাশে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের নিভৃত আপন মনের গান"।

('বাংলা সাহিত্যের নবযুগ', পৃঃ ১৫৮, শশিভূষণ দাসগুপ্ত)

কবির পরিণত বয়সের রচনা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', প্রকৃত

পক্ষে তাঁহার প্রতিভার অন্তিম স্বাক্ষর এই ১০৯টি সনেটকবিতা দ্বারা রচিত হইয়াছিল। পরবর্তী যৎসামান্য রচনায় তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত প্রকাশ হয় নাই। কারণ কবির সাহিত্য জীবন তখন সমাপ্ত প্রায়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক রবিবারে মধু রাজনারায়ণ বসুকে যে পত্র লিখিয়া সনেটের জন্ম চিহ্নিত করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। 'কবি মাতৃভাষা' বনাম 'বঙ্গভাষা' সনেটটি মধুর প্রথম সৃষ্ট সনেট।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কবি বিদেশযাত্রা করেন এবং সেখানে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের ভের্সাই নগরে অবস্থানকালে মধু ক্রমে ক্রমে শতাধিক সনেট রচনা করেন। তাঁহার প্রকাশক কলিকাতার ষ্ট্যানহোপ প্রেসের স্বত্ত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানী সেগুলি পাইয়া ১০২টি সনেটের একখানি বই ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে কবির কয়েকটি অসমাপ্ত কবিতা যোজিত ছিল, পরে সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। অসমাপ্ত কবিতাগুলির নাম 'সুভদ্রা হরণ', 'তিলোত্তমা সম্ভব' ও 'নীতিগর্ভ' কাব্য (ময়ূর ও গৌরী, কাক ও শৃগালী, রসাল ও স্বর্ণলতিকা)। সনেট ভাগে 'উপক্রম' নামে দুইটি সনেট এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী ভাগে ১০০টি সনেট যুক্ত ছিল।

পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পরে নানা উপলক্ষে মধু আরও সাতটি সনেট রচনা করেন। সর্বসমেত ১০৯টি সনেটের সমষ্টি আমরা পাইয়াছি। বাংলাভাষায় সনেট রচনার এই ইতিহাস।

সনেট বলিতে আমরা গীতিকবিতার কোন একটি বিশেষ রূপ বুঝি। বাঁধাধরা কাঠামোতে একটি সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশ সনেটের ধর্ম। সনেটের আঙ্গিকের বিশেষ রূপ ; কখ খক, কখ খক, গঘঙ, গঘঙ (**abba, abba, cde, cde,**)। চতুর্দশ লাইনের চতুর্দশ অক্ষরের সনেট কবিতা। প্রথম আট লাইনে একটি ভাবের সমাপ্তি

(Octave বা অষ্টক)। দ্বিতীয় ভাগ ছয় লাইনে নূতন ভাব-বিন্যাস (Sestet বা ষটক)। "চতুর্দশ পদই সনেটের আসল ধর্ম নহে, আসল ধর্ম নিজের মনের ভাবাবেগপ্রকাশের ভিতর একটা কঠোর সংযম।"

('বাংলাসাহিত্যের নবযুগ' শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত)

সনেটের জন্ম ইতালী দেশে বলিয়া খ্যাত। Guiotony নামক ব্যক্তি সনেটের জন্মদাতা। দান্তে ও পেত্রার্কের হাতে সনেটের চরমোৎকর্ষ।

'মেঘনাদবধ' কাব্যরচনার সময়ে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধু ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা জানিতেন, কিন্তু ইতালীয়, ফরাসী ভাষা ভাল শিক্ষা করেন নাই। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে ইতালীয় কবির ছায়া সদ্য সদ্য ইতালীয় সাহিত্যের অনুবাদপাঠে। তখনও ফরাসী গ্রন্থে তাঁহার অনুরাগ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু ইতালীয় ভাষার কাব্যে প্রবল অনুরাগ পরিলক্ষিত। ইতালীয় কবি ওভিডের অনুকরণে 'বীরাঙ্গনা' ও ইতালীয় মিশ্র ছন্দের অনুরণনে 'ব্রজাঙ্গনা' পাওয়া গেল। এই সময়ে কবির সনেটে স্পৃহা জাগে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভার্সেলস্ হইতে মধু গৌরকে পত্র লেখেন—

..."I have had the strength of mind...in learning the three continental languages viz. Italian, German, and French languages....I have been lately reading Petraca—the Italian poet and scribbling sonnets after him."

এই পত্রের সঙ্গে মধু গৌরদাস বসাককে চারিটি সনেট পাঠাইয়া দেন, তাহাদের নাম 'কবতক্ষ নদ', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'সায়ংকাল', 'জয়দেব'। চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছের প্রারম্ভে পেত্রার্ক ও ইতালিকে বন্দনা করিয়া দুইটি সনেট সন্নিবিষ্ট হয় (উপক্রম)। পত্রাদি ও উপরোক্ত সনেট দুইটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় ইতালীয় ভাষায় পেত্রার্কীয় সনেটই মধুসূদন দত্তকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল।

কিন্তু কেবলমাত্র ইতালির প্রভাব নহে, ইংলণ্ডের প্রভাবও মধুসূদনকে অতি তীব্রভাবে আশ্রয় করে। সুতরাং মধুসূদনের সনেটবিচারে কেবলমাত্র দান্তে অথবা পেত্রার্কের নাম উল্লেখ করিলে চলে না। মধুসূদনের কবিতায় ইতালি ও পেত্রার্ককে বন্দনা করা যে কোন ভাষার সনেটীয়ব্রের কর্তব্য কর্ম বলিয়াই পরিগণিত হইবে। কারণ সনেটের জন্মের সহিত ওই দুই নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' অধিকাংশ পদ আট লাইনের বলিয়া 'অষ্টপদী' নামে খ্যাত ছিল। চতুপাই (চতুষ্পদী) ছপায় (ষটপদী) হিন্দী ভাষায় আছে।

এই সূত্রে স্মরণ করা কর্তব্য যে দত্তকবি বাল্যকাল হইতেই ইংরেজি ভাষায় সনেট লিখিতে যথেষ্ট অভ্যস্ত ছিলেন। তখন তিনি ইংরেজি কবিদের সনেটপাঠে বিমোহিত হইতেন। সুতরাং ইংরেজি সনেটের রূপ প্রথম হইতেই তাঁহাকে আকর্ষণ করে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় সনেট লিখিয়া বঙ্গভাষায় তিনি প্রথম সনেটের রূপ আনিলেন। চতুর্দশপদী নামটিও তাঁহারি দেওয়া। হিন্দী দোঁহা, চতুষ্পদী ইত্যাদি নামের দৃষ্টান্তে এই নাম রাখা হইল।

বিশুদ্ধ ইতালীয় চতুর্দশপদীর **rhyme-scheme** বা মিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী মধুসূদন বহু সনেট রচনা করেন। 'কমলে কামিনী' সনেটটির ছক পাওয়া যায়, কখখক, কখখক, গঘঙ, গঘঙ। ইহাতে ষট্‌ক ও অষ্টকের পরিষ্কার ভাগ আছে।

'সায়ংকালের তারা' সনেটের ছক—কখখক, কখখক, গঘগ, খগঘ। ইহাতেও অষ্টক ষটকের ভেদরেখা আছে। কীটস্‌, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিসেস ব্রাউনিং প্রভৃতি সনেটলেখকেরা এই শেষোক্ত কাঠামোতে সনেট লিখিতে বেশী অভ্যস্ত ছিলেন। উপরোক্ত দুইটি পদ্ধতি ইতালীয়। কিন্তু মধুসূদন কেবলমাত্র পেত্রার্ক ও ইতালীয় আদর্শে সনেট লেখেন নাই। তাঁহার লিখিত সনেটগুলি হইতেই প্রমাণ দৃশ্যমান। ইংরেজী ভাষায় সনেটের বিভিন্ন রূপান্তরও তিনি

তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতায় দেখান। 'English Sonnet'-এর বিশিষ্ট নামটি ওয়াট, সারে, স্পেনার, সিডনি, ড্রামণ্ড, শেক্সপীয়র, কীটস্ প্রভৃতি আঙ্গিক ও ভাবের বাঁধাধরা ইতালীয় মূর্তি হইতে কিছু না কিছু মুক্তি দিয়া গিয়াছিলেন। সেই সনেটের বিচিত্র রূপ মধুসূদনর কবিকৃতি বিশেষতঃ মিলটনের প্রভাব মধুসূদনের সমগ্র কাব্য সাধনাকেই অন্তরঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল। সনেটেও স্পর্শ সুস্পষ্ট।

কাব্যরসিক মাত্রেই অবগত আছেন যে মিল্টন quatrain (চৌপদী) গুলি ও অক্টেভ বা সেষ্টেট-এর (অষ্টক-ষষ্টক) মধ্যের অনতিক্রম্য ভেদরেখা বর্জন করিয়াছিলেন। বিদেশী সমালোচকের ভাষায়, ফলে মিলটনের সনেটগুলিতে কামান-গর্জনের স্পন্দন অনুভূত হইত। মিলটনের সনেট আবৃত্তি করিলে এই উক্তির যাথার্থ্য বোধগম্য হয়। খাঁটী সনেটের নির্দেশানুযায়ী অষ্টকে ভাবার্থের প্রাথমিক বিরাম না হইলেও তাহাতে অষ্টকের ভাগ অসার্থক প্রতিপন্ন হইয়া যায় নাই।

সনেটের অষ্টক ও ষটকের মধ্যে অনতিক্রম ভেদরেখা কিন্তু মধুসূদন বিলুপ্ত করেন মিলটনের উদাহরণে। ইংরেজি সনেট নির্মাতাদের প্রভাবও তাঁর মিলবিন্যাসের, বৈচিত্র্য-অন্বেষণের ও বিষয়-বস্তুনির্বাচনের মধ্যে দেখা যায়। তাঁহার রচিত কতকগুলি সনেটে খাঁটী ইতালীয় ছাঁচ দেখা যায় না। ইংরেজি ভাষার পরবর্তী কবির যথা কীটস্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিসেস ব্রাউনিং প্রভৃতি ভেদরেখা বর্জন করিয়াই বহু সার্থক সনেট লিখিয়া গিয়াছেন। 'হরি পর্বতে পার্বতীর মৃত্যু' সনেটের মিলপদ্ধতি—কখকখ, কখকখ, গঘগ, গঘগ। ইহাতে অষ্টক ষট্‌কের ভাগ আছে।

'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' সনেটের কাঠামো—কখকখ, কখকখ, গঘগ ঘগঘ। ইহাতে অষ্টক ষটকের দ্বিধাবিভাগ আছে। জয়দে সনেটের ছক, কখকখ, খকখক, গঘঘ, গকক। ইহাতে অষ্টক ষটকে কোনই বিভাগ নাই।

কিন্তু অষ্টক ষট্‌কের দ্বিধাবিভাগ সম্বন্ধে মধুসূদনের কতটা জ্ঞান ছিল তাহার প্রমাণ বহু সনেটের দুই অংশের সুনির্দিষ্ট ভেদরেখা দেখিলে পাওয়া যায় ('বঙ্গভাষা' দ্রষ্টব্য)।

মধুসূদনের কয়েকটি সনেটে ভেদরেখার বিলুপ্তি দেখিলে বোঝা যায় তিনি বঙ্গভাষায় কেবলমাত্র সনেটের প্রবর্তন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সনেটের ভবিষ্যৎ মুক্তির পথও নির্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অসংখ্য সনেট হইতে এইরূপ দুই চারিটি উদাহরণ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বৈচিত্র্যের সন্ধান মধুসূদনকে কতরকম মিল ও বিষয়বস্তুর সন্ধানে উৎসুক করিয়াছে। কেবলমাত্র খাঁটী ইতালীয় মূর্তি কবিকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই।

কিন্তু মধুসূদন ইতালীয় নির্দেশানুযায়ী পাঁচটির বেশী শব্দমিল ব্যবহার করেন নাই। যদিও শেক্সপীয়রের মত couplet (যুগ্মক)-এ তিনি কয়েকটি সনেট শেষ করিয়াছেন, যথা, 'বঙ্গভাষা', 'জয়দেব', 'কাশীরাম দাস'। এই রকম সমাপ্তি ইতালীয় সনেটে দুই চারিটি পাওয়া যায়। তবে ইহা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ তাহা হইলে সনেটে এপিগ্রামের সুর চলিয়া আসে বা বৈসাদৃশ্যজনিত তীব্রতা দেখা দেয়।

ইংরেজি ভাষায় যে সকল কবি সনেট লিখিয়াছেন, তাঁহারা ইতালীয় ভাষায় সনেটের প্রকৃতরূপ সম্বন্ধে অবগতি লাভ করিলেও নিজেরা বিভিন্ন রীতির দ্বারা নূতনত্ব আনেন, সেটি ইচ্ছাকৃত। সেইরূপ মধুসূদন দত্তের প্রতিভা শুধু ইতালীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরেজি ভাষার প্রভাব তাঁহার মধ্যে পূর্ণ বিদ্যমান থাকিবার জন্য কেবল ইতালীয় সনেটের রূপ তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করে নাই। আবার সুচারু ভাবে ইতালীয় ভাষা না জানিলে দত্তকবির সনেটের আঙ্গিকের বিচার করা সম্ভবপর নয়। কারণ সনেটের বাঁধা পরিখা সত্ত্বেও ইতালীয় সনেটের স্রোত কখনও কখনও ভিন্ন পরিখায়ও প্রবাহিত হইত।

ইংরেজি ভাষা ইতালীয় ভাষার মত মধুর ও গীতিপ্রবণ নয়, তাই প্রয়োজনের তাগিদে কিছু রূপ পরিবর্তন সনেটে অবশ্যম্ভাবী

হইয়াছিল। আবার ফরাসী কবি Marot এবং Joachim Du Bellay-এর দ্বারাও ইংরেজি সনেট অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি মধুসূদন ফরাসী ভাষা বিশেষ ভাল জানিতেন। সুতরাং ফরাসী সনেটের বিশেষত্ব তাঁহার রচিত চতুর্দশপদীতে আছে কিনা তাহা লক্ষণীয়। সাধারণ ফরাসী সনেটের ছকে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, ইতালীয় সনেট হইতে তাহা ভিন্ন। ষট্‌ক অংশ একটি যুগ্মক দিয়া আরম্ভ করা হয়। ফলে আমরা তিনটি চৌপদী এবং একটি যুগ্মক পাই। কিন্তু মধুর সনেটগুলির একটির মধ্যেও উল্লিখিত মিলবিন্যাসের রীতি দেখা যায় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে আঙ্গিকের দিক হইতে তিনি ফরাসী চতুর্দশপদীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেন নাই।

লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে মধুসূদন সম্পূর্ণভাবে বিদেশী সম্পদকে আপন করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রহণ অথবা assimilation তাঁহার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অতিকষ্টে, ভাষাতত্ত্বের পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া একখানি দুইখানি সনেট লিখিয়া নূতন কবিতা আমদানী করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। অতি সহজভাবে নানা রূপকল্পের উপাসনা করিয়া শতাধিক সনেট রচনা করিয়া গিয়াছেন। সনেট জন্মমাত্রে বাংলার মনোহরণ করিল।

'চতুর্দশপদী'র উপক্রম এবং মধুর পত্রাবলী পাঠ করিয়া মনে ধারণা জন্মে যে বোধহয় ইতালীয় ভাষায় লিখিত সনেটের অনুসরণই কবির একমাত্র ঈপ্সিত ছিল। সুতরাং তাঁহার সনেট পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক সর্বত্র বিশুদ্ধ ইতালীয় চতুর্দশপদীর রূপ না দেখিয়া নিরাশ ও বিস্মিত হইতে পারেন। যিনি বিদেশী ভাষার মহাকাব্যের প্রকৃত রূপটি সাবলীল সহজতায় বঙ্গভাষায় আনিয়াছিলেন, যিনি অমিত্রাক্ষর নবীনকাব্যবাহনরূপে প্রবর্তিত করিলেন, ক্ষুদ্র কবিতা সনেটের আইন-কানুন হইতে তাঁহার এ বিচ্যুতি স্বেচ্ছাকৃত, অসতর্কতাপ্রসূত নহে।

ইংরেজি সনেট যেরূপ Elizabethan Sonnteer-দের হাতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সেইরকম ইংরেজ কবিদের অনুসরণে মধুসূদন নানারূপ পদ্ধতিতে সনেটের রূপমূর্তি পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কখনও তিনি কেবল মিলটনকে কখনও বা অন্য কবিকে পথকৃৎ করিয়াছেন। ইংরেজি সাহিত্যে সনেটের অজস্র প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও সেকালে এক মিলটন ভিন্ন মিলবিন্যাসের সহিত কবিত্বের সন্ধিপূর্বক বিশুদ্ধ ইতালীয় কাঠামোর সনেট লিখিবার সাফল্য অর্জনে বিশেষ কেউ সমর্থ হন নাই। অবশ্য এক্ষেত্রে মিলটনের স্বাধীনতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দোষগুণসমেত তথাপি সফল কবি মিলটনের সনেটে অধিক প্রীতি ইংরেজি ভাবানুরাগী যে কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক।

এইবার মধুর সনেটগুলির ছক বা কাঠামো পরীক্ষা করিয়া আমরা উভয় ভাষার (ইতালীয় ও ইংরেজি) সনেটের সহিত তাহাদের আঙ্গিকের সাদৃশ্য দেখিতে পাইব। সনেট গীতিকবিতার কোন বিশেষ রূপ ; তাহার বৈশিষ্ট্য তাহার বাঁধা-ধরা আঙ্গিকে। সেখানে ভাষার সংযম ও ভাবের সংহতি অত্যাবশ্যক। শিল্পদক্ষতা ও সৃজনশীলতার পরীক্ষাক্ষেত্র সনেটের সংযমসুন্দর স্বল্পায়তন।

'কমলে কামিনী' ও 'সায়ংকালের তারা' সনেটে আমরা বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় রূপ পাইয়াছি।

মধু প্রথম সনেট 'বঙ্গভাষা' (প্রথম নাম 'কবি-মাতৃভাষা') দেখা যাক। এই কবিতাটি একটি মিশ্রণ। ইহার ষট্‌ক অংশের ঢং-এর সহিত মিলটনের লেখা একটি ইতালীয় সনেটের এই অংশের ঢং-এর মিল আছে, কখকখ, খকখক (abab, baba)। ইহার অষ্টক অংশও দুই একটি খাঁটি সনেটের অনুসরণ, গঘঘগ, ঙঙ (cddc, ee)। ভাষাতত্ত্বপুস্তকে তাহাদের রূপ অগ্রাহ্য হইলেও মাতৃভাষায় তাহাদের ইতস্ততঃ চলন বাধা পায় নাই।

'কাশীরাম দাস' সনেটের ছক, কখকখ, কখকখ, গঘঙ, ঘঙঙ।

এইটি স্পেনারের সনেটের আঙ্গিকে, যদিও সংযুক্ত মিলবিন্যাস (linking rhyme-scheme) নাই, বরঞ্চ ইহাতে ড্রামণ্ড, সিডনি প্রভৃতি কবিদের রূপকর্ম পাওয়া যায়। এইটিতে অষ্টক ষট্‌কের পরিষ্কার ভেদরেখা নাই। কিন্তু এই দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ পীড়াদায়ক নয়, মিলটনের সনেটের মত গাম্ভীর্যবর্ধক। মিলটনের ভাবের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় মধু ইতালীয় কবি অপেক্ষা ইংরেজ কবি, তাঁহার প্রিয় মিলটনের দ্বারা অধিক উদ্দীপিত হইয়াছিলেন। বিষয়-বস্তুর দিক হইতে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে মধুর সনেট বহু অংশে ইংরেজি সনেটধর্মী। পেত্রার্ক তাঁহার প্রিয়া লরাকে উদ্দেশ করিয়া সনেট কবিতা লিখিতেন। দান্তের মানসী ছিলেন বিয়াত্রিচে। সেই সকল প্রেমবিহ্বল সনেট-অনুক্রম (sequence) মধুসূদন-এ কত পাওয়া যায় ?

শেক্সপীয়র প্রেমমূলক সনেট ভিন্ন পৃষ্ঠপোষকদিগকে উদ্দেশ করিয়াও বহু সনেট লিখিয়াছেন। মিলটনের সনেটগুলি অধিকাংশই নৈর্ব্যক্তিক। মধুসূদনের সনেটের বিচারে এই সকল ইংরেজি সনেটের সহিত মধুর সাদৃশ্য ধরা যাইবে।

মধুসূদন সনেটের আঙ্গিকে যে বৈচিত্র্য-সাধন করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুসৃত সনেটের বাহিরের রূপ সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। অন্তর-প্রকৃতির দিক হইতেও এই সনেটগুলি বৈচিত্র্যের দাবী রাখে। প্রেম উপজীব্য করিয়া 'লেডি লাভের' উদ্দেশে রচিত সনেটের প্রাদুর্ভাব ইতালীয় এবং ইংরেজি ভাষায় ছিল। মধুসূদন নৈর্ব্যক্তিক সনেটে মিলটনের পথ অনুসরণ করিয়া এক মনোহর জগৎ দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত করিয়া দিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দেশের ধর্ম-জীবন, লেখকবৃন্দ, পুরাণ-কথা আশ্রয় করিয়া অপরূপ কলাকীর্তির নিদর্শন মধুসূদনের চতুর্দশপদী। কবির স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই সনেটগুচ্ছ। শৃঙ্গার রসাশ্রিত, কামনা-বিহ্বল কয়েকটি চতুর্দশপদী অবশ্য কবির প্রেমদক্ষ

হৃদয়ের অনাবৃত প্রকাশ। ফরাসী সুরা ও ফরাসী নারী প্রেমতৃষ্ণাতুর প্রবল পুরুষ-চিত্তে অনুপ্রেরণা আনিয়াছিল আদিম প্রেমের, দেহ-স্পর্শাতুর প্রেমের। কালিদাসের শৃঙ্গার-রসপ্রবণতা মধু নিজ কাব্য-পরিধির মধ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সংস্কৃত ভাষার কবির পদাঙ্কে যুবতী-যৌবন ও প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন কবি।

…"বাঁধলো সুন্দরী,
নাগপাশে অরি তুমি; দশগোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার"—

('শৃঙ্গার রস'—মধুসূদন)

'ঘটয় ভুজ বন্ধনম্
জনয় রদখণ্ডনম্'

('গীতগোবিন্দম্'—জয়দেব)

মধুসূদনের 'শৃঙ্গার রসে'র অন্তর্ভুক্ত নামহীন 'নহি আমি চারুনেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী' সনেটটির সঙ্গে পেত্রার্কের 'He blames Love' ('To Laura in life' পর্যায়ের) সনেটটি তুলনীয়। প্রেমাস্পদকে বীর, জয়ী, প্রেমকে রণ এবং নিজেকে বিজিত বলা হইয়াছে।

প্রেমের সনেট মধু অধিক লেখেন নাই।

সমগ্র চতুর্দশপদী কবিতাবলী আচ্ছন্ন করিয়া আছে প্রবাসীর প্রেম—বাংলার প্রতি অকপট অনুরাগ, দেশের সৌভাগ্য-কামনা। 'শ্যামা জন্মদার' বর্তমান স্মরণ ও ভবিষ্যতের কল্যাণকামনার মধ্যে চির দেশ-প্রেমিককে দেখি। নবীন সেন মধুবিয়োগে লিখিয়াছিলেন—

"দেশ দেশান্তরে থাকি কে শ্যামা জন্মদে ডাকি
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ ?"

'আমরা', 'ভারতভূমি' ইত্যাদি সনেটে এই গভীর দেশপ্রেম প্রকট। বায়রণের 'ডন্ ইয়ুয়ান' কাব্যে গ্রীস দেশের গৌরবগাথার সহিত তুলনীয়।

বিদেশী আঙ্গিকে তৃষিত প্রবাসীর প্রেম 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। কবির 'সায়ংকাল' ও 'সায়ংকালের তারা' সনেট দুইটি কবি ক্যাম্পবেলের 'টু দি ইভনিং ষ্টার' একই নামে লিখিত দুইটি কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। নামে মিল ও ভঙ্গিতে সদৃশ হইলেও কবিতা দুইটির মূল সুর পৃথক।

ক্যাম্পবেলের কোমলতা অধিক, মধুসূদনের কবিতায় ঐশ্বর্য অধিক। নমনীয় ফুলের মৃদু-সুরভিত, মৌমাছির ঘরে ফেরাচিহ্নিত একটি সন্ধ্যার গীতিকবিতা দুইটির সঙ্গে কঠিন নিটোল রত্নের মত মধুসূদনের সনেট দুইটি তুলনা করিলে দেখা যায় নাম ও বিষয়বস্তুই সাদৃশ্যের সীমা।

"Gem of the crimson-colour'd Even," ('To the Evening Star') মধুসূদনে—

"আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির ?" ('সায়ংকালের তারা') ইত্যাদি

রূপে ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি তুলিলেও, কবিকৃত সন্ধ্যার রাজরাণীরূপের চিত্রপটবুকে ক্যাম্পবেলের শান্তি ও প্রেম কোথায় পাওয়া যায় ?

মিলটনের সনেটগুলির সঙ্গে তুলনায় মধুসূদনের সনেটে পাই ভাষার অধিকতর কারুকার্য। ছন্দতরঙ্গের ক্রমিক উচ্চতায় মিলটনের সনেট অপরিসীম গাম্ভীর্যের ভারবাহক, শব্দঝঙ্কারের, ছন্দ-স্পন্দনের কৌশলে রাজকীয়। মধুসূদনের সনেট সেখানে উপনীত হয় না। ফেয়ারফ্যাক্স, ক্রমওয়েল, সিরিয়াক স্কিনারকে উদ্দেশ্য সনেটের সঙ্গে মধুসূদনের সনেট 'পণ্ডিতবর থিওডোর গোলড্‌ষ্টুকার', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'কবিগুরু দান্তে' প্রভৃতির তুলনায় এ সত্য নির্ণয় হইবে। অন্যদিকে আবার কবিসত্তার অকপট প্রকাশে, সুমধুর শব্দ-যোজনার সহজ কৌশলে মধুসূদনের সনেট পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে মিলটনের সনেট অপেক্ষা বেশী।

মিলটনের সনেট যেমন ঝোঁক ও যতির অপূর্ব বিন্যাসে এক উদাত্ত গম্ভীর রূপ ধরিয়াছে তেমনি মধুসূদনের সনেট অন্য এক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। সংস্কৃত-কবির উপমা ও উপমানের প্রয়োগরীতি কবিরও কবিরীতি। প্রতিটি সনেটের অঙ্গে অঙ্গে সেই উপমা-উপমানের কারুকার্য যেন নিপুণ ভাস্কররচিত কোন মর্মরশিল্প। আর—তাহারি সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশের যত পুরাণ, যত প্রাচীন সাহিত্য, যত ইঙ্গিত স্তরে স্তরে উন্মোচিত—এই অতীত-আশ্রয়ী ভাবসম্পদ মিলটনে নাই, যদিও ক্লাসিক ও বাইবেলের উল্লেখে তাঁহার সনেট প্রোজ্জ্বল।

আবার মিলটনের মত রাজনীতি-সচেতন একটি রাজনৈতিক মন ছিল না মধুসূদনের, থাকাও সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন রাজনীতি করার ফলে মিলটন রাষ্ট্রসম্পর্কীয় ইঙ্গিতসম্বলিত যে-সকল সনেট লিখিয়াছেন, তেমন রাষ্ট্রসচেতন ও সমসাময়িক ঘটনার তাৎপর্যে মূল্যবান সনেট মধুসূদনে একটিও নাই। কবিত্বে অতুলনীয় মধুসূদনের সনেট, কিন্তু ধার বা দীপ্তিতে মিলটন অপেক্ষা নিষ্প্রভ।

মিলটনের সনেটে কোমলতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া মিলটনের সনেটটি মধুসূদনের সহধর্মিণীর প্রতি সনেটটির তুলনায় নীরস, যথা :—

"Her face was veiled ; yet to my fancied sight
Love, sweetness, goodness in her person shined
So clear as in no face with more delight". ইত্যাদি।

"প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি ;
প্রেমের সুবর্ণরঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে"—ইত্যাদি।

এখানে পুনর্বার স্মরণীয় যে মধুসূদন ভাষা গঠন করিয়া, তবেই সনেটকে পাইয়াছিলেন।

শেক্সপিয়রের সনেটের মাধুর্য, প্রেম-পিপাসা মধুর সনেটে স্তিমিত। মধুসূদনের প্রেম সংস্কৃত কবির প্রেম। সে প্রেম আত্মার পিপাসায় উর্ধ্বমুখী দীপশিখা নয়। প্রেমের সনেট মধুসূদনে অত্যন্ত স্বল্প, বাঁধাধরা হিসাবনিকাশের মধ্যে সীমিত। প্রেমজীবনের যন্ত্রণা, বেদনা, হতাশা, গভীরতা উপলব্ধি না করিলে শেক্সপীয়রের ওই সনেট লেখা যায় না।

'Revolutions' সনেটের সঙ্গে 'নূতন বৎসর' সনেটের তুলনা দেখা যাক।

"Like as the waves make towards the pebbled
shore,
So do our minutes hasten to their end ;
Each changing place with that which goes before,
In sequent toil all forwards do contend."

শেক্সপীয়রের এই সনেটটি মধুসূদন অনুধাবন করিয়াছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু একই চিন্তায় তিনিও চিন্তিত—

"ভূতরূপ সিন্ধু জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পানে।"

কবিতাটির শেষাংশ অতি অপূর্ব, কবিত্ব-মাধুর্যে দীপ্ত, কিন্তু শেক্সপীয়রের শেষ দুইটি পংক্তিতে প্রিয়ের উদ্দেশে যে অপরূপ অভিব্যক্তি ফুটিয়াছে, মধুসূদনের নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিক তত্ত্বের রূপপরিমণ্ডলে তাহার দেখা মেলে না।

শেক্সপীয়রের 'The World's Way-র তীব্র বেদনার সঙ্গে তুলনায় মধুসূদনের 'সাংসারিক জ্ঞান' সনেটে কত আবেগবিহীন! কবি 'মা ভারতি'কে স্মরণ করিয়াছেন শেষ পংক্তিতে—শেক্সপীয়রের

শেষ পংক্তি রক্তমাংসের প্রেমাস্পদস্মরণে এক মুহূর্তে অনুভূতির প্রগাঢ়তায় অনন্য হইয়া উঠিয়াছে—

—"Save that, to die, I leave my Love alone."

মধুসূদনের বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির ভাব ধারার এবং আঙ্গিকের পূর্ণ বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করিলাম। অজস্র রচনার মধ্য হইতে তুলনা বিচারের সুবিধা হেতু আমরা মাত্র দুইখানি পুস্তকের আলোচনা করিলাম। সেই প্রগাঢ় পণ্ডিত, তীক্ষ্ণধী কবির সম্যক আলোচনা সহজ সাধ্যায়ত্ত নয়। তিনি কৃতিত্বের দীপ্ত রাগে নূতন বস্তুকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রহণ প্রবৃত্তি—মৃতপ্রায় ভাষার অঙ্গে প্রাণধারার নূতন প্রাণজোয়ার—জাগৃতির মুক্ত প্রবাহ। তিনি বাংলা ভাষার মানস পুত্র, তিনি জগতের কবির সহিত একাত্মা।

মধুসূদনের চতুর্দশপদী সামগ্রিক ভাবে মর্মর সৌধ তাজমহলের সহিত তুলনীয়।

মধুসূদনের প্রতিভার অস্তসূর্যদীপ্তি ভাস্করসুলভ শিল্পদক্ষতায় অন্তিম স্বাক্ষর রাখিয়াছে চতুর্দশপদীগুচ্ছে! তাই তাহারা সমাধির সহিত তুলনীয়, তাই তাহারা ভাস্কর্যের সহিত তুলনীয়।

ভাষা ও অর্থের সঙ্গমে নিটোল মুক্তার মত এক একটি সনেট—কঠিন গঠনের মধ্যেই তার শিল্পচাতুর্য। এই অধ্যায়ে মধুসূদনের চতুর্দশপদীর ভাবগত উৎকর্ষ অথবা কবির কাব্য-বিচার প্রতিপাদ্য নয়, পূর্বেই কথিত হইয়াছে। শুধু বাংলা সনেটের জনক হিসাবে তাঁহার আঙ্গিক ও সেই পর্যায়ে অন্যান্য আলোচনা আমাদের লক্ষ্য ছিল। মধুসূদনের সমালোচকেরা যেগুলি ব্যতিক্রম বলিয়াছেন, সেগুলি যে নানারূপ পরীক্ষা ও নিরীক্ষার প্রয়াস তাহাও আমরা দেখিলাম।

তবু মধুসূদনের চতুর্দশপদীর শিল্প-সুন্দর রূপমূর্তি যে কোন তথ্য-মাত্রপ্রয়াসী পাঠকের মনে শুষ্ক তথ্যসমুদ্রপারের স্বপ্নশ্যামল দ্বীপের

ছায়া আনিয়া দেয়। মনে হয়, সুদীর্ঘকাল ক্লাসিকস্ পাঠ করিবার ফলেই কবি ক্লাসিকাল সংযমে সনেট কবিতার ভাবগম্ভীর সুঠাম অবয়ব নির্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কবি সংস্কৃত-ভাষার দ্বারে প্রার্থী হইয়া নিত্য নূতন শব্দচয়নে মাতৃভাষার অঙ্গরাগ করিয়াছিলেন। শব্দসম্পদের উপর বহুলাংশে সনেটের সাফল্য নির্ভর করে। মধুসূদন দত্ত প্রথম বাংলা সনেটের জনক হিসাবে সেই সময়ে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন।

একই পংক্তি ছন্দ ও নির্দিষ্ট মিলের মাধ্যমে কবি শতাধিক সনেট লিখিয়াছেন। তাজমহল আদ্যোপান্ত শুভ্র মর্মরে রচিত, একই শুভ্রতা সেখানে দীপ্ত—যেমন মধুসূদনের কবিতাগুলির একই আঙ্গিকবদ্ধ রূপ। কিন্তু তাজমহলের কোথাও আঙুরলতা উৎকীর্ণ, কোথাও জালিকাটা মিনার, কোথাও বৃক্ষপল্লব। সেখানেও বৈচিত্র্য আছে। মধুসূদনের সনেটও বিচিত্র বিষয়বস্তু ও ভাবধারার সন্নিবেশ।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাটো কথা, যথা 'নূতন বৎসরে', 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা'র দিনে কবি মনের অভিব্যক্তি ; পুরাতন স্মৃতি, যথা 'কপোতাক্ষ নদী' ও বিভিন্ন হিন্দু উৎসব ; নিসর্গ সৌন্দর্য ; ব্যাঙ্গাত্মক উক্তি যথা 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' ; প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে সনেটপ্রাচুর্য বিস্ময়কর। মহা-কাব্যের পরিধির মধ্যে যে মানুষের দেখা মেলে না, সে এখানেই ধরা দিয়াছে।

পরিমিত কথায় গভীর ভাবপ্রকাশের কলাকীর্তি মধুসূদনের প্রতিটি সনেটে সিদ্ধ, কোনটি দুর্বল বা শিথিল নয়। নির্দিষ্ট রূপবৃত্তের বন্ধনে বন্দী কবির সনেট কবিতা ভাস্কর্যশিল্প তাজমহলের মতই নিখুঁত কৌশলে নির্মিত। প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য, মহাকবির উদাত্ত সাধনা সেখানে ব্যাহত হইলেও তার রূপসাধনা প্রতিভার সুস্পষ্ট অবদান।

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রভাব

যে নূতন প্রাণ-প্রবাহ মধু বাংলায় আনিয়াছিলেন, তাহা বন্ধ্যা ছিল না। একটি কবির জীবনে ফসল বিলাইয়া সেই প্রাণশক্তি নিঃশেষে মৃত্যুবরণ করে নাই। অনেক কবির কাব্যে সোনার ফসলের আমন্ত্রণ আনিয়াছিল। কাব্য, সনেট কবিতা, নাটক, প্রহসন—সমস্ত কিছুর মধ্যেই মধুসূদনের সুদূর বা প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা পাইয়াছি। অনেক অনুস্মৃতি শ্রদ্ধার্পণের কাজ করিয়াছে।

যে সাহিত্য পরবর্তী কালের উপর বা সমসাময়িক কালের উপর কোন চিহ্ন রাখে না, সে সাহিত্য আবেদনশীল বা সর্বগ্রাহ্য নয়। মধুসূদনের সাহিত্যের বিরুদ্ধে কোন কোন সমালোচকের যুক্তি থাকিলেও সত্যই তাঁহার সৃষ্টি মহৎ। এই মহাসৃজন অনেক রচনা-কারকে রচনা-প্রসঙ্গে উৎসাহিত করিয়াছিল।

মধুসূদনের অনুকারকদের প্রয়াসগুলির মধ্যে আমরা বিচার করিলে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেখি, যথা—'বৃত্রসংহার কাব্য', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহাকাব্য বা কাব্য লিখিবার প্রবৃত্তি বঙ্গকবিকুলের মনে 'মেঘনাদবধ' কাব্য প্রকাশের পরে জাগ্রত হয়। হেমচন্দ্র প্রথমে 'বীরবাহু' নামে একখানি কাব্য লেখেন। এই কাব্যের মটো স্বরূপ বায়রণের কবিতাংশ উদ্ধৃত—

"Italia! Oh Italia! thou who hast
The fatal gift of beauty,"—

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ক্ষুদ্র কাব্যটি অপরিণত। হিন্দু রাজত্বের মাহাত্ম্য-বর্ণনা মূলক এই কাব্য মিশ্রছন্দে মিলান্ত পদে লিখিত। ইতিপূর্বে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'চিন্তাতরঙ্গিনী' নামক অতি ক্ষুদ্র কাব্য (মিলান্ত) হেমচন্দ্র প্রচার করেন। তাহা কলেজে পাঠ্য হয়।

অতি নৈতিক শিক্ষাভারে কবিতা এখানে অন্তর্হিতা। হেমচন্দ্র অতঃপর 'আশাকানন' নামে একখানি ছন্দমিল-সমন্বিত কাব্য লেখেন। এই কাব্যকে তিনি "সাঙ্গ রূপক কাব্য" (Allegory) বলেন। তারপর দান্তের 'ভিভিনা কমেডিয়া' অবলম্বন করিয়া তিনি 'ছায়াময়ী' কাব্য প্রণয়ন করেন, মিশ্র মিলান্ত ছন্দ।

হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' নামে গীতি কাব্যাংশের প্রশংসা হইয়াছিল (১২৮৯)। ভারতচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'র বর্ণনার সঙ্গে গীতিকাব্যখানির সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু হেমচন্দ্র যে বিভিন্ন কাব্য-রচনায় বিষয়-বস্তুর মনোনয়নে মধুসূদনের পরবর্তী তৎ-প্রভাবান্বিত কবি, তাহাতে ভুল নাই। 'মেঘনাদ-বধ'ই হেমচন্দ্রের প্রধান কাব্য 'বৃত্রসংহারে'র অনুপ্রেরণা। মহাকাব্য-রচনালিপ্সু হেমচন্দ্র দুই খণ্ডে চব্বিশ সর্গ মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পাত্র পাত্রী 'তিলোত্তমা সম্ভবে'র অনুকরণে দেব ও দৈত্য। মানুষিক উপাদানের এখানে অভাব, যদিও চরিত্র চিত্রণে ইন্দুবালা, ঐন্দ্রিলাকে কবি রক্তমাংসের মানুষ করিয়াছেন। 'মেঘনাদ বধে'র সঙ্গে কাব্যের অতি প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মহাকাব্যের লক্ষণ বিচ্যুত। চরিত্র চিত্রণ এবং ঘটনা-বিন্যাসে নিপুণতার অপেক্ষা ভাবপ্রবণতার আধিক্য ঘটিয়াছে, "প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে" হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন (১৮ই পৌষ ১২৮১), "এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দই সন্নিবেশিত হইয়াছে।" মাইকেলের ঋণ স্বীকারের পরে হেমচন্দ্র অমিত্রছন্দের সংস্কৃতঘেঁষা রূপ দিতে চাহিয়া মিলহীন পয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। অমিত্র-ছন্দের গুরু মাধুর্য দিতে পারেন নাই। ১৩টি সর্গ তিনি এই রকম অক্ষম অমিত্রছন্দে রচনা করিয়াছেন। বাকী ১১টি সর্গে তিনি পয়ার ও ত্রিপদীর মাধ্যম ব্যবহার করিয়াছেন। হেমচন্দ্র বিজ্ঞাপনে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, মধু মিলটন প্রভৃতির ছন্দে রচনা করিয়াছেন, হেমচন্দ্র অন্যপথে রচনার চেষ্টা করিতেছেন। মিলটন-ভক্তি হেমচন্দ্রের প্রচুর, মধুর মতই তাঁহার ক্লাসিক্‌সে প্রীতি। মধুর যোগ্য উত্তরসূরী তিনি।

শেক্সপীয়রের 'Tempest' ('নলিনী বসন্ত') ও 'Romeo-Juliet' ('রোমিও জুলিয়েট') হেমচন্দ্র অনুবাদ করেন এবং নাটকের মধ্যে বাংলা অমিত্রছন্দ ব্যবহার করেন। এখানেও মধু পথিকৃৎ। সংহতি ও যথোচিত শক্তির অভাবে 'বৃত্রসংহার' দীর্ঘ গাথা মাত্র।

পরবর্তী মহাকাব্য-যশোপ্রার্থী কবি নবীনচন্দ্র সেন। মধুসূদন রামায়ণের কাহিনী গ্রহণ করেন। নবীনচন্দ্র সমগ্র মহাভারত অবলম্বনে তিনখণ্ডে বৃহৎ কাব্য সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণ-চরিত্রের বিশেষ রূপ দেন। 'রৈবতক' (১২৯৩), 'কুরুক্ষেত্র' (১৩০০) এবং 'প্রভাস (১৩০৩) লিখিয়া নবীনচন্দ্র যশস্বী হইয়াছিলেন। অতি ভক্তিভাব এবং ভাবপ্রবণতার জন্য কাব্যত্রয় মহাকাব্যের লক্ষণ পায় নাই। নবীনচন্দ্র অমিত্রছন্দ সর্বত্র স্থায়ী রাখেন নাই। 'রৈবতকে' পর্যন্ত তিনি অমিত্রছন্দ পরিহার করিয়া মিত্রছন্দের আশ্রয় লইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র আরও কাব্য লিখিয়াছেন, 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রসিদ্ধতম। কাব্যটি স্কটের মত কবিতায় গ্রথিত গল্প। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য প্রকৃত-পক্ষে অভিমন্যু বধ। 'মেঘনাদ বধে'র মত অভিমন্যুর বধ লইয়া নবীন সেন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চরিত্রে বীররস প্রভূত পরিমাণে না থাকিলেও যুদ্ধের বর্ণনা এবং পদ্য বক্তৃতা নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ের উপজীব্য। কবির মন সর্বত্র রোমান্টিকতা আরোপ করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রপর্যায়ের কাব্যত্রয় প্রেমের অভিব্যক্তি ও রূপায়নে তাৎপর্যপূর্ণ। মানবধর্মের বিকাশ অপেক্ষা প্রেমের বর্ণনায় লেখকের নিপুণতা অধিকতর। জরৎকারুর কৃষ্ণের জন্য প্রেম, বাসুকীর সুভদ্রার জন্য প্রেম, শৈলর অর্জুনের জন্য প্রেম ব্যর্থ। ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় আদ্যন্ত কাব্যত্রয় ভারাক্রান্ত। এই সঙ্গে অর্জুন-সুভদ্রার পূর্বরাগ, উত্তরা-অভিমন্যুর লীলা-চঞ্চল দাম্পত্য প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামার মানাভিমান কাব্যে অনেক স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত, মহাকাব্য সৃজনের অনুকূল নয়। হোমারের 'ইলিয়াড'কে যদি Epic of Growth বলিয়া আদি মহাকাব্যের মর্যাদা দেওয়া যায়, তাহা

হইলে দেখা যাইবে কাব্যিক প্রেমের কোন স্থান সেখানে নাই। মানুষ বা দেবতার দৈহিক পরিতৃপ্তির ইঙ্গিত আছে মাত্র। মহাকবি কোমলতাকে কোথাও প্রশ্রয় দেন নাই—রোমান্টিকতা সেখানে সৃষ্টির পথে বিঘ্ন ঘটায় নাই। শৃঙ্গার রসের অবশ্যই স্থান আছে। নবীনচন্দ্রের দার্শনিকতা ও উপদেশাত্মক স্বাদেশিকতা মহাকাব্য-রচনার অন্তরায় ছিল। মধুসূদনের পরবর্তী কবিকুল অমিত্রছন্দে কাব্য প্রয়াস করিতেন অমিত্রছন্দ নূতন আসিয়াছে বলিয়া। মধুর মত এই ছন্দ তাঁহাদের কাহারও রক্তে মেশে নাই।

হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রকে মধুসূদনের সহিত তুলনা করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী মত দিয়াছিলেন—

"দুইশক্তি (চিন্তা ও কবিত্ব) যদি নবীনবাবুর নিজস্ব হইত, তবে বোধ হয়, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহার অনেক পশ্চাতে যাইতেন।··· মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কে অগ্রে, কে পশ্চাতে, এ কথা মীমাংসার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আর আমরা তাঁহার সমসাময়িক হইয়া কখনই ইহার সুমীমাংসা করিতে পারিব না। পারিবে আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা।"

('রৈবতকের' 'মুখপত্র'—প্রকাশকের নিবেদন)

কালীপ্রসন্ন শর্মা কাব্যবিশারদ বৃত্রসংহারের উপক্রমণিকায় অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছেন—"ইহা বঙ্গভাষার সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য।"

'বান্ধব' পত্রের সমালোচক প্রচার করিয়াছিলেন—(হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' সমালোচনা প্রসঙ্গে) "আমার এক বাল্যসখা সমালোচনার অতি সহজ ও সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—'মাইকেল নবম শ্রেণীর কবি, ভারতচন্দ্র চতুর্থ শ্রেণীর কবি, বায়রণ ষষ্ঠ শ্রেণীর কবি, মণ্টগমারি সপ্তম শ্রেণীর কবি'।—হেমবাবু কোন শ্রেণীর কবি, তিনি মাইকেল অপেক্ষা কতটুকু নিচু, বা নবীনচন্দ্র অপেক্ষা কতটুকু উঁচু, এই সমস্ত দুরূহ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা আমাদের সাধ্যাতীত।"

বর্তমানের বিচারে আমরা মধুসূদনের ক্ষমতা ও প্রতিভার প্রকৃত চিত্র পাইয়াছি। সুতরাং মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কবি যে মধুসূদন তাহা পূর্বদিগন্তে সূর্যের মত স্বপ্রকাশ। মধুসূদন ভারতের কেউ নন, তিনি অধার্মিক, তিনি বিজাতীয় ভাব-সম্পন্ন এই অন্ধের হস্তীদর্শন উনবিংশ শতাব্দীর পাঠককে মহাকবির যথার্থ সম্মান দিতে বিরত করিয়াছিল। সাহিত্যিকের বা কবির স্বদেশপ্রেম কি ? কি রূপ তাহার ? নিজের ভাষার প্রতি, দেশীয় সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা। দেশের সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য জীবনপণ। কবি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশ নিতে পারেন না। তাঁহার দেশপ্রেম দেশের গৌরবগাথারচনার মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়। মধুসূদন স্বদেশের সেই চারণকবি।

হেমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগের ব্যাখানা করা হইয়াছে। 'আজি কি আনন্দ বাসর' (ভারতেশ্বরীর জুবিলী উৎসব উপলক্ষে) 'জয় মঙ্গল গীত', 'মন্ত্র সাধন' এবং বিখ্যাত 'ভারতভিক্ষা' কবিতা লেখা সত্ত্বেও তিনি স্বদেশানুরাগী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ! 'খৃষ্ট' লিখিবার পরেও নবীনচন্দ্র 'বিধর্মী' আখ্যা পান নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ের প্রতি-পাদ্য কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

—"তাঁহাকে ব্রাহ্মণবিরোধীরূপে চিত্রিত করা সর্ববিধ জন-প্রবাদ ও প্রচলিত গ্রন্থাদির বিপরীত। তবে অবাধ্য আধুনিক কবি ইচ্ছামত কৃষ্ণের চরিত্র নূতনভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন। এ সর্গে তাহাই করা হইয়াছে" ('রৈবতকে'র হস্তলিপির প্রথম সর্গের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য)।

পূর্বেই দেখিয়াছি যে, মধু রাম-চরিত্রে কৃত্তিবাসী রামের রূপকল্প আরোপের ফলে নিষ্ঠুর সমালোচনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথচ নবীনচন্দ্র যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচকের দ্বারা স্বাধীনতার ছাড়পত্র পাইয়াছিলেন।

যে দুইটি সমকালীন কবির সঙ্গে মধুকে নিরন্তর তুলনা করা

হইত তাঁহাদের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পরে আরও যে-সকল অনুকারী থাকেন, তাঁহাদের কয়েকটি নাম উল্লেখযোগ্য।

মধুসূদনের অমিত্রছন্দ আবিষ্কৃত হইবার পরে পূর্ববঙ্গনিবাসী দ্বারকানাথ গুপ্ত অমিত্রছন্দে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লেখেন। মধুসূদন স্বয়ং লেখককে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

ঢাকানিবাসী জগবন্ধু ভদ্র মধুর অমিত্রাক্ষরকে ব্যঙ্গ করিয়া ব্যঙ্গ অনুকরণে "ছুছুন্দরী বধ" কাব্য লেখেন। কাব্যটি বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ কবিতা মাত্র।

বিহারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত রঘুবীরনারায়ণ মধুর অনুকরণে হিন্দী অমিত্রাক্ষর ছন্দ কবিতার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা প্রচলিত হইল না। তবে হিন্দী লেখকদের মধ্যে কাব্য বা খণ্ডকাব্য রচনার প্রবণতা দেখা যায়।

মধুর ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসুর 'বীরকুমার বধ' উপভোগ্য। অভিমন্যুর মৃত্যু বর্ণনায় লেখিকা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ আত্মীয়ের রচনা-ভঙ্গি স্মরণ করাইয়া দেন।

পথিকৃৎ মধুসূদনের অনুকরণে বহু মহাকাব্যরচনার উদ্যম অকিঞ্চিৎকর পরিণতির মধ্যে শেষ হয়। আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনা' এবং 'মহামোগল কাব্য' তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রের কাব্য 'যোগেশ', হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মুকুট উদ্ধার' ও 'অদৃষ্ট বিজয়', মধুর প্রভাবযুক্ত মহাকাব্য। তাহার পরে বিহারীলালের কাব্যের যুগ। এইসূত্রে ব্যঙ্গ কাব্য ও অনুবাদ কাব্যও উল্লেখ্য।

মধুর জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু 'পৃথ্বীরাজ' কাব্য লিখিয়া 'Captive Ladie'-এর কাহিনীকে আর একবার চোখের সামনে ধরিলেন।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাব্যনাটক লেখার অমিত্র ছন্দ ব্যবহারে মধুর প্রভাব পাই। মনের ভাবপ্রকাশের উপযোগী

নাটকীয় বিন্যাসে পংক্তির হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য সাধন, অমিত্র ছন্দের সাধনা ইত্যাদি কৌশলের মধ্যেই মধুর কাব্যচিহ্ন।* এই ভাঙ্গা অমিত্র ছন্দকে গৈরিশ ছন্দ বলা হয়।

ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য রচনায় বাঙ্গালী কবির প্রবণতা যথেষ্ট। কামিনী রায়ের 'মহাশ্বেতা', 'পুণ্ডরীক', 'পৌরাণিকী'র দীর্ঘ কবিতাগুলি সুমধুর কাব্য নিদর্শন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যরচনার প্রতিভা সুবিদিত। 'সন্ন্যাসিনী' নামক মীরাবাইকে কেন্দ্র করিয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর নাট্য-কাব্য উল্লেখযোগ্য।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হরগোবিন্দ চৌধুরী, শশধর রায়, রাজকৃষ্ণ রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিভিন্ন আঙ্গিকে ও ছন্দের মাধ্যমে মহাকাব্য ও খণ্ড কাব্যের প্রাণ ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারপর বন্যার মত রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ বাংলার প্রাণ প্লাবিত করিয়া দিল—সে মহাকাব্য দিলনা কিন্তু গভীরতর মাধুর্যের স্বাদ আনিল।

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা', বিসর্জন, 'রাজা ও রাণী', ইত্যাদি কাহিনীতে খণ্ড কাব্যের চরমোৎকর্ষ দেখাইলেন। ('চিত্রাঙ্গদা'য় 'তিলোত্তমা'র প্রভাব দেখা যায়। নিজের ছায়া দেখিয়া উভয় রূপসী বিমুগ্ধা) 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে' 'বীরাঙ্গনা'র ঢং।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনুবাদের দ্বারা বাংলার জাগৃতির বন্দনা করেন। ভাষা ও ছন্দের সাদৃশ্য-ধর অনুবাদে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেন। ঈস্কিলাসের 'বন্দী প্রমিথিউস্', সোলোমনের

* গিরিশচন্দ্র যখন ষ্টার থিয়েটার করেন তখন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া 'নটেন্দ্র লীলা' নামে একটি ষট্‌সর্গাত্মক কাব্য লেখা হয়—তাহাতে মধুর প্রভাব হেতু গিরিশকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে—

"সম্মুখ সমরে জিনি মাইকেলী ছন্দে
আহা কি নবীন ছন্দ ভাতিল ভারতে"—ইত্যাদি।

১৬

'Song of Songs' ইত্যাদি অনুবাদের সঙ্গে স্বরচিত দীর্ঘ গাথা কবিতায় কবি খণ্ড কাব্যের চিহ্ন দেখান।

মধুর প্রবর্তিত সনেটের মত জনপ্রিয় কবিতা দুর্লভ। আধুনিক বাংলা মধুসূদনের সনেটের এই বৎসর শতবৎসর পূর্তি উপলক্ষে সশ্রদ্ধ নিবেদন 'বাঙলা সনেট' সঙ্কলনকাব্যের মাধ্যমে করিয়াছেন। মধুসূদনের পরে সনেটেরও অতিদ্রুত প্রচলন হইয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় 'বঙ্গভূষণ' মধুসূদনের আদর্শে প্রকাশিত করিলেন।

"মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বঙ্গ ভাষার প্রথম সৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতার অনুকরণ করিয়া বঙ্গভূষণ রচিত করিলাম।"

(বঙ্গভূষণের বিজ্ঞাপন, ১লা পৌষ, ১২৮০)

দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, কামিনী রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, প্রমথ চৌধুরী, প্রিয়ম্বদা দেবী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া মোহিতলাল মজুমদার, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, বুদ্ধদেব বোস, অজিত দত্ত, হুমায়ুন কবির, হেমচন্দ্র বাগচী প্রভৃতি কবি সনেটকবিতায় ভাষালক্ষ্মীর রূপ চর্চা করিয়াছেন। সনেট একটিও লেখেন নাই এমন বাঙ্গালী কবি কম। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাঁধাধরা সনেট আঙ্গিক পরিলক্ষিত নয়। কাব্য মাধুর্যে, ভাবগভীরতায় অনন্য রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কিন্তু রূপবন্ধে অসিদ্ধ। সনেট ব্যতীত মধুর ভাষার পরিমিত সংহতি এবং সংস্কৃতমূলক শব্দ-চয়ন আর একটি কবির হাতে ধরা দিয়াছে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। দীর্ঘ কাব্যধর্মী গীতিকবিতা 'অর্কেষ্টার' মধ্যে খণ্ড কাব্যের বীজ আছে। *

প্রবহমান পয়ার বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের দান—বাংলায় স্থায়ী আসন পাইয়াছে। এই পয়ারে নানা যতি, ছন্দ মধুসূদনের

* "মধুসূদনের কাব্যের গঠনপ্রণালীকে কেন্দ্র করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক নূতন শ্রেণীর কাব্যরচনার প্রয়াসী হলেন।"

('আধুনিক কবি ও কাব্য' আশুতোষ কলেজ পত্রিকা, ১৩৬২)

পদাঙ্কে অনুসরণ করিয়া বাংলার কবি পয়ারের মাধ্যমে হৃদয়ের গভীর ভাবপ্রকাশে সক্ষম হইয়াছেন।

সংস্কৃত-ভাষামূলক গূঢ় ভাষণ সুধীন্দ্র দত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি বিদ্যমান। মটো হিসাবে বিদেশী কাব্য উদ্ধৃতি, নাটকের ভাষাভঙ্গি, বর্তমানের রচনাকারকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। নূতন শব্দ চয়ন, ক্রিয়াপদের নূতন রূপ, নূতন অসমাপিকা ক্রিয়ার সৃষ্টি ভাষার অঙ্গে মাইকেলী অনুস্মৃতির ব্যঞ্জনা।

এছাড়া খণ্ড কাব্য, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে আখ্যান ইত্যাদির মধ্যেও বঙ্গসাহিত্যে মাইকেলের দানের বিস্তার দেখি। ভাষায় প্রবল পৌরুষসঞ্চার, যথাযোগ্য শব্দের নির্বাচন, উপমা-উপমানের প্রয়োগ, চিত্রকল্পের দ্বারা পরিস্থিতি প্রকাশ ইত্যাদি কাব্যের প্রয়োগকৌশলে মাইকেলী ঢং দেখা যায়।

মহাকাব্য ও চতুর্দশপদীর গুচ্ছ সমেত কাব্যের ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক মধুসূদন নির্মাণ করিয়া গেলেন তাঁহার দেশের উত্তর সাধকের জন্য। বন্ধনমুক্তি ও বিদ্রোহের সুর, পরদেশী সাহিত্য সাঙ্গীকরণের স্পৃহা মধুসূদনের যুগ হইতে দৃশ্যমান। মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ অন্য জগতের স্বাদ আনিয়াছিল। তারপর বিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকে যে নূতন কবিতা-আন্দোলন প্রবর্তিত হয়, প্রবর্তকেরা নিজেরাও বোধহয় চিন্তা করিয়া দেখেন না যে তাহার সঙ্গে মধুসূদনের কতটা সংযোগ আছে।

সাম্প্রতিক কবিতার জন্মক্ষণের প্রধান প্রেরণা প্রাচীনে অবসাদ ও পরিবর্তন প্রার্থনা। উনবিংশ শতাব্দীর মধুসূদনীয় যুগে এই লক্ষণ পাওয়া যায়।

রিভাইভাল অফ্ লারনিং ও হিউম্যানিজম্ এই আধুনিক কবিদের মানস-চিহ্ন। তবে মানবিকতার জয়গানের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁহারা মানুষকে সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের কবিতা অতিমাত্রায় সমাজ-সচেতন ও কখনও বা রাজনীতিধর্মী।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যমাদকতা হইতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যঅভিলাষ করিয়া আধুনিক কবি, আঙ্গিক, ভাষা ও মেজাজের যুগোপযোগী অনিবার্য বিবর্তন সাধনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে প্রতীচ্য ভূখণ্ডের কাব্যপ্রণালীর প্রতি আনুগত্য তাঁহার স্বভাবধর্ম। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মত তাঁহারও মনে বিদেশী কবিপ্রীতি—এলিয়টের মত কবি আর নাই। এলিয়টের ঢং কাব্যপ্রণালীতে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। মনের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন প্রতীচ্য কাব্যজগতে। সেখান হইতে নানা কবির নানা ভাব, নানা ভঙ্গি গ্রহণের পর স্বাঙ্গীকরণ করিয়াছেন মধুসূদনের মতই।

মধুসূদন তাঁহার যুগচেতনাকে সম্যক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেজন্য সাহিত্যবিপ্লব তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইয়াছিল। আধুনিক কবিকেও বিপ্লব করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার যুগ পৃথক, তাই তাঁহার যুগচেতনার রূপও পৃথক। চল্লিশ দশকের কবিতা যাত্রা করিয়াছে যুদ্ধ, নিষ্প্রদীপ দেশ, হত্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির মধ্য দিয়া, তাই কবিতার কণ্ঠে বিষাদ ও হতাশা, কখনও ব্যঙ্গ।

গ্রীক সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, গ্রীক পুরাণের অবিরত উদ্ধৃতি অথবা পুরাণের পরিমণ্ডলে কাব্যরচনার ক্ষেত্রে প্রকট। অনুবাদের মাধ্যমে ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান কাব্যের প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত।

এই সঙ্গে দেশীয় পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের উল্লেখ আধুনিক কবির কাব্যে প্রচুর। সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্রকল্প, পদাবলী সাহিত্য ও প্রাচীন কবিতার পংক্তিবিশেষ কবিতার অঙ্গে অঙ্গে বিধৃত। অর্থঘন, দৃঢ়সন্নদ্ধ কবিতার সংযমসৌন্দর্যের অনুশীলন মধুসূদনীয় অবদান।

মধুসূদনের যুগের রেনেসাঁস নূতন করিয়া নূতনরূপে বাংলাদেশের সাহিত্য পরিধির মধ্যে দেখা দিয়াছে।

মধুসূদন দত্ত হইতে আধুনিক কবি পর্যন্ত সেতু সংযোজিত হইয়াছে। বাংলা ভাষা মধুসূদনকে ভোলে নাই—কখনও ভুলিতে

পারে না। চিত্রে, মঞ্চে বারবার সেই মহাকবিকে আমরা দেখি। যুগাবতারের চিত্রে, বিবেকানন্দের চিত্রে, বিদ্যাসাগরের চিত্রে তাঁহাকে পাই। কলেজের ছাত্রছাত্রী সেই জীবন অভিনয় করে। সংস্কৃতি-মণ্ডপে তাঁহার প্রহসন অভিনীত হয়। বেতারে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী', 'শর্মিষ্ঠা' শুনি, 'মেঘনাদের' আবৃত্তি পাই। 'কবিতীর্থে' তাঁহার জন্মউৎসব হয়, 'সাহিত্যপরিষৎ' তাঁহার পূজা করে। চতুর্দশ-পদী, মেঘনাদ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনার অজস্র উদ্ধৃতি সাহিত্য-পত্রে পাই। পাঠ্যপুস্তকে তাঁহার 'আত্মবিলাপ', 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' পড়ি। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সৃষ্টিধর্মের স্বরূপ খুঁজি। জীবনচরিতে তাঁহার বর্ণনা মিলাইতে চাই। সেই বিশাল নয়ন, প্রতিভা-দীপ্ত কমনীয় মুখশ্রী, শ্যামবর্ণ উদাসী কবির আলেখ্য ও মূর্তি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে শ্রদ্ধাপ্রীতির সিংহাসনে শোভা পায়।

আর প্রতিদিন ক্ষুদ্র-বৃহৎ-যোগ্য, অযোগ্য, সাহিত্যিক-কবি-লেখক তাঁহাকে স্মরণ করিয়া ধন্য হয়। স্কুল কলেজের মুখপত্র হইতে বিচিত্র গুরুগম্ভীর পত্রিকা—পুস্তকে কবি মধুসূদনের স্মরণোৎ-সবের বিরতি নাই। অশান্ত বিংশ শতাব্দীর আত্মা অশান্ত কবির মধ্যে নিজের প্রতীক দেখিয়া প্রত্যহ সন্ধানব্যাকুল হয়।

সেই অশান্ত আত্মার সন্ধান পথে আমি আরও একটি ছোট প্রদীপ জ্বালিয়া দিলাম।

উত্তরকাল

এ কথা সত্য কবি তাঁহার কালকে অতিক্রম করেন, আর্টের স্বাতিক্রমণশীলতায় কবি বিশ্বাসী। হেগেলের দর্শনে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রান্তে অবলোকনধর্মে কবি চ্যুত হইতে পারেন না। অথচ কবি সমাজবদ্ধ জীব অবশ্যই। সমসাময়িকতা এবং পরিবেশের প্রভাব অতিক্রান্ত যাত্রা তাঁহার হইতে পারে না—অন্ততঃ—বৈজ্ঞানিকপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্য তাই।

মধুসূদনকে তাই তাঁহার যুগের পটভূমিকায় গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া সম্যক যুগলক্ষণের ফলাফলজনিত সেই সৃজনপ্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়াছি। পশ্চিমী জাগৃতির যে উত্তাল বায়ুপ্রবাহ বাংলার মনের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া মুক্তির স্বাদ আনিয়া দিল, সেই মুক্তির প্রেরণায় মহাকবি সংস্কার বাধা ভঙ্গ করিয়া মানবিক প্রাণধর্মে দীক্ষিত হইলেন। অতি প্রত্যক্ষ—বাস্তব প্রয়োজনের অতীত মধুসূদনের কাছে এই ধর্ম বিশুদ্ধ সাহিত্যচেতনার জন্ম দিল। বন্ধন মুক্তির 'ব্রহ্মাস্বাদ-চেতনা'র আনন্দ সেখানে। যুগধর্মকে অন্তর্গূঢ় চৈতন্যে গ্রহণ করিয়া যে স্বাধীন বিদ্রোহের সুর মধুসূদনের সাহিত্যে রূপ লাভ করিল, অদ্যাপি তাহার রূপায়ন আধুনিক যুগের বন্ধনমুক্তির প্রয়াসচিহ্নের মধ্যে। যুগ ও জাতির যথার্থ প্রতিনিধিত্বের ভার তিনিই বহন করিলেন। অথচ সমসাময়িকতার গণ্ডির উর্ধ্বে শাশ্বত সমগ্রের অংশ হিসাবে 'মেঘনাদবধ' কাব্যকে গ্রহণ করা চলে। কারণ সমালোচক কাব্যখানি একটি অখণ্ড ভাবের অখণ্ড রূপ বলিয়াই সৃষ্টি করেন। মানুষের ভাগ্যের চিরন্তনী কাহিনী।

তবু উত্তরকালের জিজ্ঞাসা অপরিমিত। কবি যে তাঁহার যুগ-সম্পর্কে সজাগ, কবি যে তাঁহার কালের মানসকে অতিক্রম করিয়া

বিশ্বমানসের অখণ্ড বিন্দুতে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই সাবধানী উত্তর-কালের কাছে যথেষ্ট নয়। সে চায় শুধু কবির নিজের যুগই নয়, পরবর্তী যুগের জন্য কোন উপকরণ সেখানে আছে কিনা ?

প্রকৃষ্টরূপে সচেতন সাহিত্যিক না হইলেও, কখনও বা ভবিষ্যতের কোন অঙ্গীকার অজ্ঞাতসারে তাঁহার রচনাপরিধিতে উপস্থিত থাকিতে পারে। বারবার পাঠকমন নিজের যুগের ইঙ্গিত সেখানে খুঁজিয়া মরে।

মধুসূদন বিদ্রোহ, বিপ্লব, চিন্তাস্বাধীনতার দ্বারা বিংশ শতাব্দীর আপন হইয়াছিলেন। তবু অন্যান্য ভাবধারার কোন পরিপোষণ তাঁহার কাব্যে ছিল কিনা তাহাও বিবেচ্য। আধুনিক বিচার বহুমুখী। সেই বহুমুখী মানদণ্ডের বিচারও বহুমুখী। আজিকার সমালোচকও সমাজ-সচেতন।

আধুনিক জগতের মানুষ মোহভঙ্গের বেদনায় ব্যথিত। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে বর্তমানের মোহমোচন, কবিতার মোহমোচন। চারিটি মতবাদের আঘাত একে একে সাহিত্যের ও সমাজের পুরাতন ভিত্তিতে নাড়া দিয়াছিল—ডারউইন, মার্কস, ফ্রয়েড ও আইনষ্টাইন। কিন্তু মধুসূদন পূর্ববর্তী জগতের লোক।

অবশ্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে চার্লস ডারউইনের 'দি ওরিজিন অফ স্পিসিস' বই-এর প্রকাশ। মধুসূদন তখন কলিকাতার ছায়াশীতল উদ্যান-বাটিকায় বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃজনে মত্ত। সেই বৎসর ও মোটামুটি সেই সময়ে তাঁহার সমগ্র উদ্যম ব্যয় হইয়াছিল প্রথম বাংলাভাষা রচনায় ; 'শর্মিষ্ঠা', প্রহসনদ্বয়, 'তিলোত্তমা'র, 'পদ্মাবতী'র কিছু অংশ। সর্বত্রই তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তি ও ধীশক্তির চরমপরীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল। অন্যত্র দৃষ্টিক্ষেপের অবকাশ ছিল না।

কার্ল মার্কস-এর 'ডাস্ কাপিটাল' ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সের দ্রাক্ষাকুঞ্জের মায়া কাটাইয়া মার্শেই বন্দর হইতে স্বদেশাভি-মুখে মধুসূদন সেই বৎসর চলিয়া আসেন। বিক্ষুব্ধ য়ুরোপের নূতন

চেতনা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন তিনি কলিকাতার ব্যারিষ্টারী প্রলোভনে। স্পেন্সেস্ হোটেলে যে জীবন, তাহা সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক, কাব্যসরস্বতী পর্যন্ত সেখানে অদৃশ্য। তাহার পূর্বে লণ্ডন ও প্যারিসে তাঁহার জীবন ফরাসী অভিজাতসুলভ।

কাব্যবিচারেও মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে সমাজ উপস্থিত, কারণ কবির সমাজবদ্ধ অবস্থায় যে সৃজন তাহা সমাজ-সচেতন। ধনতান্ত্রিক সমাজের ভাঙন মধুসূদনকে স্পর্শ করে নাই, সমাজের সুনিয়ন্ত্রিত পুনর্গঠনের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার কোন দলিল নাই। ফরাসীদেশে বাস করিয়া ফরাসী ললিতকলায়, ফরাসী বিলাসে তাঁহার আসক্তি ছিল, তিনি ফরাসী নারীর দয়িত ছিলেন। কিন্তু ফরাসী বিদ্রোহের জলন্ত অগ্নি তাঁহাকে উত্তপ্ত করে নাই। বিদ্রোহীদের প্রতি তাঁহার বিরাগের অন্ত ছিল না। অধুনাতম মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের সাহিত্য-বিচার তাঁহার প্রতি আরোপ করা যোগ্য নয়। শ্রেণীসংগ্রামের অন্তে শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা, শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্ররূপে আর্টকে কাজে লাগানো, সাম্যবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা—ইত্যাদি কোন উদ্দেশ-প্রণোদিত মধুসূদনের সাহিত্য নয়।

তবু মনে প্রশ্ন জাগে, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য করিলে তিনি কি তথাকথিত বুর্জোয়া ছিলেন?

ব্যক্তিসচেতনার অনুসঙ্গী সমাজসচেতনা। ব্যক্তিসচেতনা মধুসূদনে প্রকট। কবি-মানস যুগচেতনার প্রতিবিম্বিত মুকুর। মধুসূদন তাঁহার যুগপ্রবৃত্তিকে যে সাহিত্যের কোন স্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি।

তবু মনে প্রশ্ন জাগে পাঁচ বৎসর য়ুরোপপ্রবাস মধুসূদনের কি কেবল অর্থোপার্জনের বৃত্তি ও ভাষা শিখিয়া অতিবাহিত হইল? তিনি বিক্ষুব্ধ য়ুরোপ হইতে শুধু কি জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইতালিয়ানের শিক্ষা লইয়া আসিলেন? জার্মান দেশের নবজাগ্রত চিন্তাধারা কি তাঁহার মনকে সচেতন করে নাই? ফ্রান্সে তিনি অভিজাতসুলভ

বিলাসে থাকিবার বাসনায় ঋণসমুদ্রে ভাসমান হন। ব্যাষ্টিলের পতন ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জগতের ইতিহাসে যে অভিনব পরিচ্ছেদ সংযোজনা করিয়াছিল, কবির মন তৎভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল না; তিনি শুধু ফরাসী রাজা ও রাণীকে পথে দেখিয়া জয়বাদ দিলেন ("—I made myself hoarse by shouting"—গৌরকে পত্র, ভের্সাই, ১৮৬৪) অতি উৎসাহে।

পুষ্প গোপনে বিকশিত হইলেও বিকাশক্ষেত্রকে সুরভিত করে। মধুসূদন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাঁহার চেতনার কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে কি কোন নবচেতনার সুরভিদূত ছুঁইয়া যায় নাই?

প্রাত্যহিক জীবনে মধুসূদন রাজসিক—Nobility শ্রেণীভুক্তির উদ্দেশে স্বর্ণমৃগের প্রলোভনে তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন ("বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে"—)। চল্লিশ হাজারের কমে বাৎসরিক আয়ে ভদ্রলোকের চলে না তাঁহার অভিমত। ব্যর্থ ব্যবহারজীবী হইয়াও তিনি ভূম্যধিকারীর ষ্টাইলে চলিতে চাহিতেন। অতএব তিনি যে প্রলিটারিয়েট দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী নন, তাহা সত্য।

রাজৈশ্বর্যের রূপ সর্বত্র উপাসনা করিতেন মধুসূদন, আমরা তাঁহার সমগ্র কাব্যালোচনায় দেখিয়াছি। রাজা ও রাণীর মূর্তি তাঁহার কাব্য-পরিধির মধ্যে নিত্য সমুপস্থিত থাকিত। ভের্সাই-এর রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তাঁহার খেদ—

"—কোথা সে রাজেন্দ্র এবে"—

অতএব শ্রেণীসংগ্রাম বা শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখেন নাই।

অপরদিকে যে-হেতু তিনি সমাজ-সচেতন, তজ্জন্যই তিনি রাজৈশ্বর্যের স্বপ্ন দেখেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের ভাঙন, জীবনের বিকৃত রূপ, তিনি অবশ্যই অনুভবে পাইয়াছিলেন। অতএব সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ পরিবেশের উর্ধ্বে অপরূপ ছন্দোময় কোন জীবনালেখ্যের

স্থির লক্ষ্য তাঁহাকে কখনও বা মার্কসীয় তাত্ত্বিকের নিকট 'পলায়নী' বৃত্তিধর আখ্যাত করিবে। কিন্তু জীবনবিদ্বেষের ঊর্ধ্বে সুন্দরের ভাবলোক সমাজমানসের পক্ষে হিতকর।

ফরাসী কবি ও সমালোচক পল ভালেরি বলেন, সাহিত্য সৃজন লেখকের স্বগতোক্তির অংশ। মনোনয়ন আত্মপ্রীতিনির্ভর।

এই মতকে প্রাধান্য দিলেও 'আত্মপ্রীতি' কথাটার আবার আলোচনা লেখকের মনোনয়নের কারণ সম্পর্কে সমালোচককে উৎসাহিত করিয়া থাকে।

মধুসূদনের পত্রাবলী সাহিত্যিকের ডাইরি, সমাজ-সচেতন ব্যক্তি বিশেষের নয়। যে চতুর্দশপদী তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের প্রকাশে সোচ্চার, সেখানেও সমসাময়িক গুণীজনসম্বর্ধনার প্রায় সকলগুলিই সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত, প্রভৃতির উদ্দেশে। সমাজসেবী বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে তিনটি সনেট আছে সত্য, কিন্তু সেগুলি বিদ্যাসাগরের সমাজসেবায় অনুপ্রাণিত কিম্বা ব্যক্তিগত সহায়তা-প্রাপ্তিতে অনুপ্রাণিত বলা শক্ত। সুতরাং বৃহৎ সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কবির মতবাদ অচিহ্নিত।

প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা',—কবির বিষয়বস্তু মনোনয়নের রোমান্টিকতা ভিন্ন উত্তরকাল আরও কিছু সন্ধান করে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও দৈত্য এই তিনের মিলনের মধ্যে কবি স্বাধীন সমাজের ইঙ্গিত ও গান্ধর্ব বিবাহের মধ্যে স্বাধীন যৌন-মিলনের চিত্র দেখেন। ব্রাহ্মণতনয়া দেবযানী অপেক্ষা দৈত্যকুমারী শর্মিষ্ঠার গরিমাকীর্তনে কবি এখানে বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব কীর্তন করিয়াছেন। দৈত্যকন্যাসম্ভূত পুরু চন্দ্রবংশের রাজলক্ষ্মীকে পাইলেন, ব্রাহ্মণতনয়াজাত যদু অভিশপ্ত হইলেন, তাহাও মধুসূদনের সামাজিক সাম্যকামী মানসিকতা বলা অন্যায় হয় না। দাসীরূপিণী শর্মিষ্ঠার রাজরাণী হওয়ার মধ্যেও একই দৃষ্টিভঙ্গি। এত বিষয়বস্তু থাকিতে কেন শর্মিষ্ঠার মনোনয়ন প্রথম নাটকপ্রয়াসে, তাহা অনুধাবনযোগ্য।

মধুসূদনের নাটকরচনায় আত্যন্ত প্রীতি ছিল। বাহিরে যখন বিরাট কর্ম-জগৎ নূতন দিগন্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে, তখন সচেতন সাহিত্যসেবীর নাটকীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের মুক্তিবিকাশ স্বাভাবিক।

'একেই কি বলে সভ্যতা' ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্ছৃঙ্খল সমাজের সমালোচনা, এখানে মধুসূদন সমাজ-সংস্কারক।

অলক্ষিত সৌরভ মধুসূদনকে একটুও উন্মনা করে নাই একথা বলা চলে না। গণসাহিত্য তিনি রচনা করেন নাই সত্য, কিন্তু গণচেতনার বীজ তাঁহার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা' প্রহসনখানির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। ধনবণ্টনের অব্যবস্থার ফলে ভূমিহীন চাষী হানিফ ভক্তবাবুর কৃপার ভিখারী।

হানিফ—দশছালা ধানও বাড়ী আনতি পাললাম না···

গদাধর—বৃষ্টি না হলে কি কখন ধান হয় রে? তা দেখ, এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানিফ—তিনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?······

······এবার যদি লাঙ্গলখান আর গরু দুটো যায়, তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপদাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হ'লো?

(প্রথমাঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক)

শোষিত হানিফের স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল ভক্তবাবুর। কিন্তু অবশেষে ভক্তবাবুর পরাজয়ে শ্রমিকের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাই।

সেই নাটকের অন্যত্র—

গদাধর—(তাকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা কি আরামের জিনিষ! এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুধ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে, তাদের মতো সুখী কি আর আছে?

(দ্বিতীয়াঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক)

'—নীলদর্পণে'র অনুবাদকার্যেপ্রবৃত্ত মধুসূদনের মনে শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে তিনি সেই কার্যে সম্মত হইতেন না। কাজটি শুধুই সাহিত্যপ্রীতি বলিতে বা আকস্মিক বলিতে উত্তরকাল সম্মত হয় না।

অতএব মধুসূদনে সমাজচেতনার একটি দিক আছে বলিতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না।

কিন্তু সমসাময়িক ঘটনা বা য়ুরোপের আন্দোলনগুলি (যাহা তাঁহার জীবিতকালে ঘটিয়াছিল) সম্বন্ধে মধুসূদনের সুনির্দিষ্ট ও ব্যক্ত মতামত পাওয়ার উপায় আমাদের নাই। একথা সত্য উত্তরকাল বা অধুনাতম কাল তাঁহার মধ্যে অধুনাতম পথনির্দেশ খুঁজিয়া ফিরিবে ও নিজের মনোমত যুক্তি বা উল্লেখ চিহ্নিত করিবে। কিন্তু প্রকৃত তথ্যের অভাবে সেগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

ফরাসী বিপ্লব শেলীকে উদ্দীপিত করিয়াছিল। পরবর্তীকালের কবি মধুসূদন ফ্রান্স হইতে সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির বাণী বহন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন এমন প্রমাণ আমরা পাই নাই।

জার্মান ভাষা মধুসূদন শিক্ষা করিয়াছিলেন অবশ্যই গ্যেটে, শীলার পড়িবার জন্য, 'দি ক্যাপিটালে'র জন্য নয়। কার্লমার্ক্স তিনি পাঠ করিয়াছিলেন কি না জানা নাই। লক্ষ্মীর আরাধনায় তিনি তখন তন্ময়, যেটুকু অবকাশ পান কাব্যপাঠ করেন। সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের স্থান বড় কম।

রেনেসাঁসের পথযাত্রী মধুসূদনের কবিমানসে হিউম্যানিজমের সুর ছিল। য়ুরোপের সাহিত্যতীর্থযাত্রী, তিনি প্রাদেশিকতার গণ্ডি-উত্তীর্ণ, বৈশ্বিক বৃহত্তর সাধনা তাঁহার। সেখানে কি উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় আত্মার কোন সুর লাগে নাই? অশান্ত য়ুরোপের বিভিন্ন আবর্তন হইতে কবি কি করিয়া দূরে রহিলেন? তাঁহার মনের জানালা তো খোলা ছিল।

আমাদের হাতে কোন সূত্র নাই এই সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে কবিকে গ্রন্থিবদ্ধ করিবার। শুধু হয়তো উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের কেবলমাত্র স্বার্থের সম্পর্কের রূপ কচ্চিৎ তিনি অনুভব করিতে ভুল করেন নাই। তাই তাঁহার রচনাশিল্পের একপ্রান্তে একটু রং লাগিয়াছিল। সেই রংয়ের সন্ধানে অধুনাকাল নিজের যুগের সাম্প্রতিক সমালোচনার ধারায় তাঁহাকে বিশ্লেষণ করিতে চায়। উত্তরকালের এই দাবী হয়তো একদিন এই পথে মধুসূদনকে অন্বেষণ করিবে। তাই সমালোচক উত্তরকালের দৃষ্টিক্ষেপকে পূর্বাহ্নেই অনুমান করিয়া আরও বিচিত্র, আরও নূতন সমালোচনার দৃষ্টিকোণ বর্তমান অনুচ্ছেদে রাখিবার চেষ্টা করিলেন।

বিবিধ

আরিস্টটলীয় বিচারে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের একটি দুইটি জিজ্ঞাসা

মহাকাব্যের রূপ কি 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ?

বাংলা ভাষায় মধুসূদন সর্বপ্রথম এপিক (epic) বা মহাকাব্যের রূপ আনেন বলিয়া স্বীকার করিলে মহাকাব্যের রূপ কি, এবং সেই অর্থে 'মেঘনাদবধ' কতদূর সার্থক কবিকর্ম তাহার সম্যক আলোচনার উপযোগিতা আছে। দীর্ঘ-গাথারূপ কবিতায় সুন্দর চিন্তা, মনোহারী ভাষা, বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য এবং চমৎকারিত্বের সমাবেশ থাকিলে সেই কবিতাকে মহাকাব্য বা এপিক বলিয়া কাব্যরসিক মত প্রকাশ করেন। এপিকের আধ্যাত্মিক, বীরত্বব্যঞ্জক অথবা সাঙ্গরূপক রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত।

পুরাতন কাহিনী, রূপক ইত্যাদি দ্বারা এপিকের ভাবধারা পরিকল্পিত হইলে তাহাকে Epic of Growth আখ্যাত করা হয়, আর কবির কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট এপিক Epic of Art-এর পর্যায়ে পড়ে। ব্যাসের 'মহাভারত', বাল্মিকীর 'রামায়ণ', হোমারের 'ইলিয়াড' এবং 'অডেসি' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।* এগুলি epic of

* হেক্তর-বধের ভূমিকা পাঠান্তে জানা যায় যে মধুসূদন রামায়ণ ও মহাভারতকে রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র বলিয়াছেন। "'কুমারসম্ভব', 'শিশুপালবধ', 'কিরাতার্জুনীয়ম ও নৈষধ' ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলংকারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু 'ইলিয়াসে'র নিকট এ সকল কাব্য কোথায় ?"

বিদগ্ধ মধুর সমালোচনাশক্তির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা রাখিতে পারি।

growth, অর্থাৎ বহুদিনের কাহিনী-সঞ্চয়। মিলটনের অথবা ভার্জিলের মহাকাব্য কিন্তু epic of Art. হোমারের অনুসরণে অথবা বাইবেলে উপজীবি, কল্পনা-প্রভাবান্বিত এই সকল কাব্য পরিকল্পিত প্রয়াস। মধুর কাব্য এই পর্যায় আশ্রিত। এই পর্যায়ের এপিকে যুগপ্রভাব ও সাহিত্যিক অনুশীলন লক্ষণীয়।

কোন শ্রেণীর সমালোচকেরা বলেন মধুর 'মেঘনাদবধ' নানা কারণে মহাকাব্যের লক্ষণচ্যুত। লিরিক অথবা গীতি কাব্যের উচ্ছ্বাসপ্রবণতা মহাকাব্যের নৈর্ব্যক্তিক গাম্ভীর্যকে ব্যাহত করিয়াছে। সুতরাং মাধুর্য এবং কবিতায় অসাধারণ হইলেও, কূট সমালোচকের মতে 'মেঘনাদবধ' যথার্থ মহাকাব্য নয়।

Aristotle তাঁহার 'Poetics'-এ হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'অডেসি'র গুণকীর্তন করিয়াছেন। 'ইলিয়াড' এবং 'অডেসি'র বিস্তৃত সমালোচনা এই প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'ইলিয়াড' যথার্থ বিশুদ্ধ মহাকাব্য। 'মেঘনাদবধ' 'ইলিয়াডে'র ছায়াগামী। অতএব, অনুরূপায়ন কেন মহাকাব্য নয়?

মধুসূদন আলঙ্কারিক পণ্ডিতদের মতে সংস্কৃত মহাকাব্যরূপ সরণিচ্যুত। কিন্তু মধুর আদর্শ ছিল শুদ্ধ সংস্কৃত মহাকাব্য নয়— পাশ্চাত্য মহাকাব্য, এবং প্রধানতঃ 'ইলিয়াড'। মধু মনে করিতেন তাঁহার কাব্যখানি যথার্থ পাশ্চাত্য রীতির মহাকাব্য। ('জীবন চরিত') পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সর্বলক্ষণ সম্বন্ধে বিদগ্ধ কবি তাঁহার সমালোচক-পুঞ্জ অপেক্ষা অধিকতর অবহিত ছিলেন বলিলে মিথ্যা হয় না। সুতরাং, আমরা অনায়াসে 'মেঘনাদবধ'কে মহাকাব্য বলিব, বিশেষতঃ যখন কোন বিশুদ্ধ মহাকাব্যের ছকে এ কাব্য গঠিত। এই বিশুদ্ধ মহাকাব্য 'ইলিয়াড' গ্রন্থ পাশ্চাত্য প্রামাণিক অলঙ্কার শাস্ত্রের, আরিষ্টটলের

অতএব, সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র এবং মধুসূদন মহাকাব্য সম্পর্কে একমত নয়-এটুকু বলিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

'পোয়েটিকসে'র মতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচলিত মহাকাব্য ('Poetics')। অবশ্য আরিষ্টটল্ প্রশংসিত হোমারের অমর কীর্তিরও দোষ সমালোচক দেখিয়া ছিলেন। হোমারের ভাষার দোষ তন্মধ্যে প্রধান। দুর্বোধ্য ভাষা এবং বিচিত্র শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ 'ইলিয়াডে' বিস্তৃত। অসম্ভব, পরস্পরবিরোধী, অভাব্য, দুর্নীতিক এবং নিয়মচ্যুত ঘটনা বা বর্ণনা বা প্রণালীর অভাব নাই 'ইলিয়াডে'। মহাকাব্যে স্থানোপযোগী ভাষা-ভঙ্গির উপর জোর দেওয়া হয়। হোমারের কাব্যটির প্রথম তিনশব্দ-যুক্ত পংক্তিতেই সমালোচক দোষ দেখিয়াছেন—

"Sing, heavenly Muse, the wrath of Peleus' son—" কাব্য-লক্ষ্মীকে কবি অনুনয় করিবেন, সেখানে তাঁহার ভাষা কেন আদেশের—'Sing', (—"Which Protagorus* has criticized as being a command, where a prayer is meant."

"Poetics,"

(Tran. by I. Bywater)

এইরূপ হাস্যকর বিচার করিলে 'মেঘনাদবধ' অবশ্যই মহাকাব্য নয়। অন্যথায়, নিজের যুগের মনোভাবানুসারী মধুর কাব্যকে আমরা স্বচ্ছন্দে বাংলা ভাষার মহাকাব্য বলিতে পারি। ('মহাগীতি'-মহাকাব্য)

নায়ক-নায়িকার উক্তির মধ্যে উচ্ছ্বাসের অভাব হোমারে নাই। আকিলিস্, আণ্ড্রোমাকী, হেলেন—সকলেই হৃদয়ভারাতুর। কিন্তু বিষাদ অথবা মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন নিষ্করুণ মহাকাব্য বেদনা অপেক্ষা ভীষণতায় পূর্ণ। সেইখানেই 'মেঘনাদবধে'র সঙ্গে 'ইলিয়াডে'র পার্থক্য। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি মধুর সৌন্দর্য-বোধ হোমার অপেক্ষা অধিক প্রতিফলিত—অতএব মাধুর্য সৌন্দর্যের অঙ্গরাগে পরিমার্জিত বাংলার কবিপ্রাণ 'মেঘনাদের' ছত্রে ছত্রে প্রকট।

* থ্রেসের বিখ্যাত সোফিষ্ট।

হোমারের মহাকাব্যের আদর্শে লিখিত 'মেঘনাদবধে' আমরা পাই হোমারের ন্যায়—

ঐক্য (unity)। মহাসমরের একটি অংশ লইয়া পরিচ্ছন্ন কাব্য সংহতিবদ্ধভাবে রচিত। মেঘনাদের মৃত্যু এবং আকিলিসের ক্রোধপাত্র হেক্তরের মৃত্যুর সঙ্গে কাব্য সমাপ্ত। অন্যান্য কাহিনী প্রধান কাহিনীর খণ্ডাংশ মাত্র।

কাব্যের আদি, মধ্য এবং অন্ত সুস্পষ্ট।

কাব্যটি সর্বাপেক্ষা গাম্ভীর্যের বাহক 'heroic verse'-এ রচিত। আদ্যন্ত ভাষার বিশুদ্ধতা, ভাবের উচ্চতা রক্ষিত।

সহজ ক্রিয়া এবং যন্ত্রণার (suffering) কাহিনী।

পরম পণ্ডিত, এবং অবশ্যই আরিষ্টটলের* কাব্যনির্দেশ সম্পর্কে জ্ঞানী মধু কিন্তু 'suffering' কথাটির বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল "suffering" অর্থে "scences of suffering" বুঝাইয়াছেন। ট্রাজেডির মত এপিকেও যন্ত্রণার দৃশ্য থাকিবে। মধু যন্ত্রণার নৈর্ব্যক্তিক দৃশ্য অপেক্ষা যন্ত্রণার অন্তরপ্রদাহ অধিক দেখাইয়াছেন। ফলে সমগ্র কাব্যটির সুর বিষাদাচ্ছন্ন। বীররস-ব্যঞ্জক মহাকাব্য মধু রচনা করিতে চাহিলেও তাই কাব্যখানি বীররসপ্রধান হইতে পারে নাই। প্রথম পংক্তিতেই বীরবাহুর অকালমৃত্যু সম্পর্কীয় বেদনাবোধের মধ্যে মহাকবি নিমজ্জমান। শেষ পংক্তির—

"করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে !
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।"

'বিষাদ' কথাটি যেন কাব্যের চাবিকাটি। হোমারে শোকের অভাব নাই, বিভিন্ন মৃত্যু-দৃশ্যের পরে পরিজনের শোক-প্রকাশ 'ইলিয়াডে'র

'হেক্তর-বধ' গদ্য-কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

একটি গুরু অংশ। কিন্তু সেখানে শোক এমন ঘনীভূত বিষাদ নয়। এই কারণে 'মেঘনাদবধ' ভীষণতায় তুচ্ছ হৃদয়-বৃত্তির উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এই কারণ কাব্যকে মহাকাব্যযশবিচ্যুত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয় (কারণ, মূলতঃ সব রসই এক অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে। বহু আলঙ্কারিক আবার করুণ রসকে মূল রস বলেন)।

অতএব হোমারের আদর্শে মধুসূদন বাংলার প্রথম মহাকাব্য রচনা করেন বলিতে আমাদের দ্বিধা নাই। তিনি পণ্ডিত বিশ্বনাথ বিরচিত 'সাহিত্যদর্পণে' মহাকাব্য বৈষয়িক নিয়মাবলীর প্রতি দৃকপাত করেন নাই—তবে সংস্কৃত মহাকাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণবর্জিত 'মেঘনাদ' নয়। সংস্কৃত মহাকাব্যের সংজ্ঞা ঃ ইতিহাসাশ্রিত বৃহৎ ঘটনা উপজীব্য। উচ্চবংশীয়ধীরোদাত্ত নায়ক। বীর, শৃঙ্গার, শান্ত রস প্রধান। অষ্টাধিক সর্গ সংখ্যা। প্রতি সর্গের বিষয়াত্মক নাম। নায়ক বা বর্ণনীয় ব্যাপার অনুযায়ী কাব্যের নামকরণ। ছন্দোবৈচিত্র্য। প্রথম সর্গে বস্তু নির্দেশ, প্রধান বর্ণনীয় নির্দেশ, আশীর্বাদ, প্রণাম ইত্যাদি। প্রকৃতি, যুদ্ধ বা মৃগয়া, স্বর্গ ইত্যাদির বর্ণনা। 'মেঘনাদ' ইতিহাসাশ্রিত বৃহৎ যুদ্ধবর্ণনা। সর্গ অষ্টাধিক এবং বর্ণনীয় বস্তু অনুসারে প্রত্যেক সর্গের নামকরণ (অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তি-নির্ভেদ, প্রেতপুরী ও সংস্ক্রিয়া)। নায়কের নামে কাব্য। প্রথম সর্গে বস্তুনির্দেশ এবং বাণীবন্দনা। নায়ক মেঘনাদ স্বর্ণলঙ্কার পরাক্রান্ত নৃপতিতনয়, গুণসম্পন্ন। কবি বীররস প্রধান করিতে চাহিয়া ছিলেন ("গাইব মা, বীররসে ভাসি মহাগীত")। পাশ্চাত্য এপিকে ছন্দ একটি। আপাত দৃষ্টিতে মধু একমাত্র অমিত্র-ছন্দ আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু, যমক, অনুপ্রাস, যুক্তাক্ষরের সাহায্যে ছন্দের বৈচিত্র্য তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের মত মিশ্রছন্দে কাব্যের গাম্ভীর্য ব্যাহত করেন নাই। কবির মনে সংস্কৃত মহাকাব্যের সংজ্ঞা লুপ্ত হয় নাই। সর্গগুলির সংস্কৃত নামকরণে, (ইতি মেঘনাদবধকাব্যে অভিষেকো

নাম প্রথমঃ সর্গ, ইতি মেঘনাদবধকাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গ ইত্যাদি) সংস্কৃত ছন্দের স্পন্দন গ্রহণে, সংস্কৃত শব্দচয়নে এবং কাব্যের রসনির্দেশ প্রভৃতির বেলায় তাঁহার সহিত সংস্কৃত মহাকাব্যের গভীর পরিচিতি দেখি। তবে, পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি প্রধান আদর্শ রাখিয়াছিলেন পাশ্চাত্য মহাকাব্য 'ইলিয়াড'। কিন্তু, প্রধান রসচ্যুতি (বীররস) যেমন কাব্যটির প্রধান দোষ হইয়াছে, তেমনি সমগ্র কাব্যখানিকে অনুপম কবিত্ব ও হৃদয়াবেগ মণ্ডিত করিয়াছে। পত্রে কবি "heroic poetry"* লিখিবেন বলিয়াও কবি-কল্পনায় নিয়মকানুন বিস্মৃত হইয়াছেন। আর মহাকাব্যের প্রত্যেকটি বাঁধাধরা সংজ্ঞা দ্বারা চির-বিদ্রোহী বন্দী থাকিতে চান নাই! এখানেই কবি মহাকাব্যকারের ঊর্ধ্বে গভীর রসোপলব্ধির দীপ্তিচ্ছটায় প্রাত্যহিক জীবনের ভাবগুলির রূপান্তর সাধন করেন আনন্দলোকে।

'মেঘনাদবধে'র নায়ক কে ?

এই বিষয়ে নানা আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান যুগে অত্যাপি পল্লবগ্রাহী সমালোচকের স্থিরীকৃত মত দেখিয়াছে যে রাবণ 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্যের নায়ক। ইতিপূর্বে আমরা 'ধর্ম' পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। মহাকাব্যের নায়কের বর্ণনা সুনির্দিষ্ট। অনার্যপ্রেমে এবং রাজসিকতার উপাসনায় বিধর্মী কবি মধুসূদন রাবণকে তাঁহার কাব্যে নায়ক করিয়াছেন এমন মত আছে। মধু তাঁহার পত্রে অবশ্য "Rama and his rabble"-এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন এবং রাবণকে "grand fellow"† বলিয়াছেন, কিন্তু পত্রাবলী জীবনীরচনায় যেমন অপরিহার্য, সাহিত্যবিচারে সে

* "I never thought I was such a fellow for the pathetic".

† রাবণ 'grand fellow' বটে কিন্তু মেঘনাদবধ সম্বন্ধে কবির উক্তি—

"It cost me many a tear to kill him"—

(রাজনারায়ণকে পত্র)

রকম নয়। কবির লিখিত দলিল আমাদের হাতে আছে, আমরা পত্র অপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ কবির কাব্যে দেব। কবি যাহা মনে করিয়া লিখিয়াছিলেন, প্রকাশ হয়তো সে রকম হয় নাই। কবি নিজ সৃষ্টির যোগ্য সমালোচক নন। কবি যাহা করিতে চান শেষ পর্যন্ত তাহা করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহার বিচার জন্য কাব্য একমাত্র সাক্ষী।

মধু মিলটনীয় ঐতিহ্যে শয়তানের মত হয়তো দশানন লঙ্কাধীপকে কখনও বা প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পতিত দেবদূত এবং জন্মপাপী রাক্ষস এক নয়। মধুর রচনার নায়ক রাবণ নয় যদিও ঐশ্বর্যমুগ্ধ, প্রচণ্ডতা-ধর্মী কবি রাবণের বীর্য, পুরুষকার ও শক্তিকে নিসঙ্কোচ বন্দনা করিয়া "মানবপূজা" করেন। জাগৃতির প্রধান প্রেরণা Humanism-এর সারতত্ত্ব এই মানুষের জয়জয়াকার। দীপ্ত রাবণ চরিত্র 'মেঘনাদে'র প্রকাণ্ড সম্পদ। কিন্তু, 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক মেঘনাদ ("—the glorious son of Ravana" —রাজনারায়ণকে পত্র)। প্রথম সর্গের আরম্ভ তাঁহার সেনাপতিপদে অভিষেক। মধু স্পষ্ট-নিশ্চিত মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—

> "—কহ হে দেবি অমৃতভাষিনি,
> কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
> পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি
> রাঘবারি! কি কৌশলে রাক্ষস-ভরসা
> ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
> ঊর্মিলা-বিলাসী—নাশি, ইন্দ্রে নিশঙ্কিলা!"

তারপরে সমগ্র কাব্যের গতি সহজ একমুখী—মেঘনাদের মৃত্যু এবং তজ্জন্য আয়োজন; মেঘনাদের মৃত্যুর ফল এবং শেষকৃত্য।

মেঘনাদ রামায়ণের সেই মায়াবী প্রচ্ছন্ন যোদ্ধা নন। তিনি এখানে নিষ্কলুষ, দুর্ধর্ষ বীর। প্রমোদউদ্যানে তাঁহার অবস্থিতি রামকে নিধন করিয়াছেন এই ভ্রমাত্মক নিশ্চিন্ততায়, বিলাসে নয় (১ম সর্গ)।

নায়কের কোনও নীচ ভাব মধু রাখেন নাই। নায়কের প্রেম ও দাম্পত্য জীবন দেখাইবার জন্য প্রমীলার সৃষ্টি। কাব্যে অন্য প্রেমদৃশ্য নাই। মেঘনাদ চরিত্রের কোমলতা এবং পূর্ণ বিকাশ পরিণয়ের পরিমণ্ডলে দেখানো হইয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যুকে আরও করুণ করিয়াছে প্রেমিকা রূপসী প্রমীলার উপস্থিতি। মেঘনাদের সংক্রিয়ার দৃশ্য বিষাদ-বিহ্বল করিবার জন্য প্রমীলার সহমরণ। কাব্যের সমাপ্তি মেঘনাদের চিতার পার্শ্বে। কবি আর কাহারও জন্য অপেক্ষা করেন নাই। রাবণের এক পুত্রশোক দিয়া কাব্য আরম্ভ, অন্য পুত্রশোকে সমাপ্তি। এই খণ্ড জীবনের চিত্র মহাকাব্যের নায়কের চিত্র নয়।

মেঘনাদ নায়ক অতএব কবি তাঁহাকে কতকগুলি সুপরিচিত গুণবাহুল্যে ভূষিত করিয়াছেন, যথা তিনি নির্দোষ বীর ; শচীপতি তাঁহার ভয়ে ভীত। আকাশ, পৃথিবী, পাতাল কোথাও তাঁহার সমকক্ষ বীর নাই। আবার লক্ষ্মণচরিত্রের একমাত্র গ্লানি নিরস্ত্র যোদ্ধাকে (অবশ্য দেবাদেশে) হত্যা। তাহাও ঘটিয়াছে নায়কের প্রতি সহানুভূতির জন্য, মেঘনাদের মৃত্যুতে পাঠককে কাঁদাইবার জন্য। মেঘনাদের বধদৃশ্যের ভীষণতা, করুণতা লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় নায়কের জন্য মধুর কত সহানুভূতি।*

রাবণকে ভাগ্যের ক্রীড়নক অনেকে বলিয়াছেন। গ্রীক নায়কের মত, শেক্সপীয়রের নায়কের মত রাবণ নাকি ভাগ্যের বিরুদ্ধে অসহায়। কিন্তু আরিষ্টটলের Poetics-এ ট্রাজেডির নায়কের বর্ণনা অন্যরূপ। নায়ক ভাগ্যের হাতে কষ্ট পান, কিন্তু নিজের দোষের জন্য নয়, অথবা অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য, যেমন ঈডিপুস। তাই তাঁহার জন্য pity বা করুণা হয়, এবং fear বা ভয় জাগে তাঁহার

* যে পত্রাবলী অবলম্বনে কোন সমালোচক রাবণকে নায়ক ভ্রম করিয়াছেন, সেই পত্রাবলীতে মধু "my favorite Indrajit"-এর মৃত্যু-দৃশ্যে অশ্রু ফেলিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

দুর্দশায়। রাবণের ভাগ্য তাঁহার কর্মফল পাপ। কর্মফল হেতু নায়কের কষ্ট মনে করুণার জন্ম দেয় না। মেঘনাদের মৃত্যু ভাগ্য হেতু; তিনি পাপীর পুত্র সেই হেতু। অন্যথায় কাব্যে তিনি নিরপরাধ। তাই তাঁহার জন্য প্রকৃত pity-এর ক্ষেত্র আছে। 'Poetics'-এর মতে চলিলে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক মেঘনাদ। কাব্যের নামকরণ হইতেই তথ্য প্রতীয়মান হয়। গ্রীক নায়কের সঙ্গে শেক্সপিরীয়ান নায়কের আলোচনায় আমরা দেখি ট্রাজেডির বোধ সম্বন্ধে আমরা গ্রীকদের অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছি। ওথেলো বা ম্যাকবেথ অপরাধ করিয়াছিলেন। ভাগ্যের চক্রান্তে ঘটিলেও তাহা অপরাধ। তবু তাঁহাদের অসহায় অবস্থা যে করুণার জন্ম দেয় তাহা যথার্থই ট্রাজেডির উপজীব্য। শেক্সপিরীয় ট্রাজেডির রস পৃথক। প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদের পথ হইতে সূক্ষ্ম উপলব্ধির পথে বর্তমান ট্রাজেডির অগ্রগতি।

"We bigin to live only when we have conceived life as a tragedy—" (Yeats)

পরিশিষ্ট

প্রেরণা ও উৎসসন্ধান

প্রকৃতপক্ষে আমরা সেইদিনই স্বাধীন হইয়াছি, যেদিন বাংলায় 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচিত হইয়াছিল। অকুণ্ঠচিত্তে উদার দক্ষিণ হস্তে বিদেশের উপহার গ্রহণ করিয়া মধু সগর্বে নিজের ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি কোথাও কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি গোপনতার প্রয়াস করেন নাই। শক্তিপ্রাবল্যে শেক্সপীয়র বিভিন্ন বিস্মৃত কাহিনীর মূলসার গ্রহণ করিয়া অপূর্ব বিরহ-মিলন-কথা গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্যভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপীয়রের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মধুসূদন দত্তের। মানসিক প্রবণতার এত মিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সম্ভবপর নয়। তাই বিস্মিত হইয়া ভাবি, স্বাধীন দেশের বিদেশী লেখক যেমন নির্ভয় স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের দেশের ভাষায় লিখিত বিভিন্ন কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, পরাধীন দেশের সাহিত্যিক ঠিক তেমনি করিয়া অকুতোভয়চিত্তে নিজের ভাষার সহিত পর ভাষার সাহিত্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। বারনার্ড শ বলেন "Value is a matter of comparison." সমালোচনা তুলনাবিচারের উপর অনেকটা নির্ভর করে। বর্তমান রূপ সমালোচনার আপেক্ষিক। তাই বিভিন্ন দেশের কবিদের বিষয়ে সংক্ষেপে যৎসামান্য আলোচনার প্রয়োজন। তাই, সেই কয়েকটি লেখকেরই আলোচনা করি, যাহারা মধুর অতি প্রিয় ছিলেন। পত্রাবলীতে ক্রমান্বয়ে এই সব নামের উল্লেখ দেখা যায়।

এই অংশে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় মধুসূদন দত্তের মনের বহুমুখী আমন্ত্রণেচ্ছা, 'পাশ্চাত্য প্রভাব' বলিয়া বহু সমালোচক যাহা ভুল

করিয়াছেন। মধু শুধু গ্রহণ করেন নাই, গ্রহনীয় বস্তু নিজের সহিত একীভূত করিয়া আত্মসাৎ করেন। এই সময় হইতে বাংলার তথা ভারতবর্ষের এক নবযুগ সূচিত হয়। 'ইন্সুলার' মনের প্রথম দুঃসাহসিক অভিযান অজানা রোমাঞ্চের পথে। স্বাধীন বাংলার প্রথম সাহিত্যে অ্যাসিমিলেশন-এর প্রবৃত্তি। তাই আধুনিক সাহিত্যে মধুসূদনের দান এত গুরুত্বপূর্ণ। যে যুগে তাঁহার জন্ম, সেই যুগলক্ষণ ও কবি-মানসের বিশিষ্ট রসরূপের স্বপ্নসাধনায় বাহির বিশ্বের সহিত মৈত্রী অবশ্যম্ভাবী। অগ্নি যেমন দেশকালপাত্রে অভেদ, সাহিত্যও তেমনি হোমানল। সার্বজনীন হোমানলের বাংলায় প্রথম হোতা শ্রীমধুসূদন। শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীরাও নানা উৎস হইতে উজ্জীবিত হইয়া দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কেবল যদি কথাচ্ছলে শেক্সপীয়রের বিষয় আলোচনা করা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে বিভিন্ন কবি, নাট্যকারের নিকট হইতে ভাব ও চরিত্র গ্রহণ করিয়াও তিনি নিজের মহিমা খর্ব দেখান নাই। বরঞ্চ তাঁহার সাহিত্য বিভিন্ন মনের আলোকপাতে একটি সর্বদেশীয় সামগ্রী হইয়াছে।

ইংরেজমনের সমস্ত কাব্য, রোমান্স, অভিযান, চিন্তাধারা এক শেক্সপীয়রের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শেক্সপীয়র পাঠ না করিলে বোধহয় ইংরেজ জাতিকে বোঝা যায় না—এলিজাবেথের যুগের প্রাণস্পন্দন ধরা যায় না। মধুর কাব্য ও সাহিত্য পাঠ না করিলে উনবিংশ শতাব্দীর বেপরোয়া আত্মাকে পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় হইতে বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় যে আলোড়ন, যে আবর্তন জাগিয়াছে, যাহার অশান্ত বেগ বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদকেও আজ প্রবাহিত, সেই চিন্তাধারার সাহিত্যিক পরিণতি মধুসূদন দত্ত। তাঁহাকে না জানিলে নব্য বাংলাকে জানা যায় না। তিনি প্রেরণার ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের ন্যায় ছিলেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য যে-সকল কবি মধুসূদনের প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদের উৎস-সন্ধান আমরা পরিশিষ্টে করিয়াছি। তাঁহারা দেশের সাহিত্যগৌরব বৃদ্ধি করিয়া

অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। মানসিকসঞ্চয়ের ব্যবহারস্পৃহায় ও আমন্ত্রণেচ্ছায় তাঁহারা মধুর সগোত্র। "Things, which are equal to the same thing are equal to one another."

শেক্সপীয়র (William Shakespeare, 1564-1616) বিদগ্ধজন মাত্রেই জানেন যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সাহিত্যিক শেক্সপীয়রের সাহিত্যের উৎস পূর্বসূরীদের রচনা, গ্রেট ব্রিটেনের পুরাণ ও ইতিহাস। তাঁহার রচিত প্রত্যেকটি পুস্তকের উৎস নির্ণয় করা চলে। বিদেশী ও দেশী পণ্ডিতগণ সারা জীবন ধরিয়া শেক্সপীয়র অধ্যয়ন করিয়া সুচিন্তিত অভিমত রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সুবিধা পরবর্তী যুগ পাইতেছে। শেক্সপীয়রের অগণিত রচনার মধ্যে একটি দুইটি পুস্তকের সম্পর্কে আমরা এখানে মন্তব্য করিব।

দেখা যায়, শেক্সপীয়র ঐতিহাসিক নাটকের জন্য প্রধানতঃ দুইখানি পুস্তক আশ্রয় করিয়াছিলেন। 'Chronicles of Holinshed and Halle' হইতে তিনি ব্রিটেনের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া 'King Richard III', 'King Henry IV,' 'King Lear' প্রভৃতি দেশীয় নৃপতির বিষয়ে নাটক রচনা করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে উল্লিখিত রাজাদের সম্বন্ধে তৎকালীন প্রচলিত নাটক বা কাব্য ইত্যাদি যুক্ত করিয়াছেন। যথা: 'King Henry IV'-এর রাজত্ব বিষয়ে একটি জনপ্রিয় নাটক, 'Famous Victories of Henry the Fifth'-এর সাহায্য তিনি লইয়াছেন।

King Henry IV-এর মৃত্যু, Henry Fifth-এর মুকুটধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে শেক্সপীয়রের নাটক শেষ হইয়াছে। তারপর 'Henry VI' নাটকটির তিন খণ্ডের জন্য নাট্যকার কত বিভিন্ন উৎসের সন্ধান করিয়াছেন দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। থিয়েটারের অখ্যাতনামা নাট্যকারদের লেখা নাটকগুলিও শেক্সপীয়রের উৎস।

'King Lear'-এর সন্ধান লেখা আছে Holinshed-এর

'Historie'-তে 'Lear, the sonne of Baldud'. তিনকন্যা Gonorilla, Regan ও Cordeilla-এর নামও আছে। তৎসহ যুক্ত হইয়াছে, 'King Lear and his Three Daughters' নামে একখানি প্রাচীন অকিঞ্চিৎকর নাটক ও Spenser-এর 'The Faerie Queen'. ইহা ভিন্ন কর্ডেলিয়া এবং লীয়ারের গল্প তখন Mirror for Magistrates', 'Albion's England', ও 'Gesta Romanorum' নামক তিনখানি জনপ্রিয় পুস্তকে উল্লিখিত ছিল। গ্লষ্টারের গল্পের, (Underplot in 'King Lear') সন্ধান পাই Sidney রচিত 'Arcadia, Book II' (cf··· 'Narrative of the Paphlagonian Unkinde King and his Kinde Sonne').

পুরাতন প্রচলিত নাটকগুলিকেও শেক্সপীয়র নূতন করিয়া অভিনয়ের মঞ্চরূপের উদ্দেশে লিখিয়া দিতেন।

শেক্সপীয়রের নাট্যকলার বিশদ আলোচনায় শেক্সপীয়রের 'King Lear'-এর সঙ্গে উপরোক্ত নাটকগুলির তুলনা করিলে শেক্সপীয়রের প্রতিভা সম্যক বোঝা যাইবে। তিনি কতটুকু লইয়াছেন ও কতখানি দিয়াছেন সে বিষয়ে Dr. Furness বলিয়াছেন—

"What false impressions are conveyed in the phrases, which we have to use to express the process whereby Shakespeare converted the stocks and stones of old dramas & Chronicles into living, breathing men and women! We say 'he drew his original' from this source, or he found his material in that source."

(Variorum Edition of 'King Lear')

'Hamlet' আসিয়াছে ফরাসীভাষায় লিখিত Belleforest-এর 'Histories Tragiques'-এর গল্প হইতে। পূর্বস্থরী Thomas

Kyd রচিত 'Hamlet'-এর ট্র্যাজেডি নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রকে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল, (Verity)।

'Merry Wives of Windsor' অনুপ্রাণিত হইয়াছে Straparola-র গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন গল্প হইতে। 'Twelfth Night'-এর কিয়দংশ ইতালীয় কাহিনী হইতে গৃহীত। 'Romeo and Juliet' Arthur Brooke রচিত 'The Tragical History of Romeo and Juliet' নামক ইংরেজি কবিতার অনুসারী। 'The Winter's Tale' পূর্বসূরী প্রসিদ্ধ লেখক Robert Greene-এর লেখা 'Pandosto' উপন্যাস হইতে পাওয়া যায়। Ovid-এর কাব্যপাঠে উদ্বুদ্ধ শেক্সপীয়র কবির সুর হৃদয়ে ধারণ করেন—সেখানে তিনি ঋণী।

শেক্সপীয়রের রোমান নাটকগুলির উৎস হইতেছে নর্থের অনুবাদকৃত, Plutarch রচিত 'Lives'. 'Antony and Cleopatra', 'Julius Caesar' ইত্যাদি নাটক হুবহু Plutarch-এর মালমশলায় গ্রথিত। বিশুষ্ক ইতিহাসের কাহিনী সরস নাটকে রূপ পাইয়াছে।

'Troilus and Cressida' নাটকে শেক্সপীয়র হোমারের সৃষ্ট চরিত্র যথেচ্ছাভাবে আধুনিক করিয়াছেন।

Norton ও Sackville রচিত ইংরেজি নাটক 'Gorboduc' সম্পর্কে মধু বলেন—"This nobleman's play, called 'Gorboduc' first introduced to Englishmen the form of Verse in which William Shakespeare Wrote."

('গ্যারিক'কে পত্র)*

অতি সংক্ষেপ এবং অসমাপ্ত উল্লেখের দ্বারা দেখা গেল, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, সামান্য কিছুদিন পূর্বের নাটক, কাব্য, গল্পরচনা,

* কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে মধু 'গ্যারিক' বলিতেন

প্রাচীন উপকথা প্রভৃতি হইতে শেক্সপীয়র নির্বিচারে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঋণী হন নাই, তাঁহার অপার্থিব কাব্যসুষমা উৎসকেই ঋণী করিয়াছে। শেক্সপীয়রের উৎস বলিয়াই তাহারা অমরত্ব লাভ করিয়াছে, নইলে হয়তো সেই সকল অমার্জিত কথা-কাহিনীর কেউ উল্লেখ করিত না। কবির ভাষায়—

"গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়"—

যদি বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইত তাহা হইলে দেখা যাইত অতি সহজেই যৎকিঞ্চিৎকর আখ্যান-বস্তু অমর প্রতিভার হাতে কেমন রূপান্তর লইয়াছে। রক্তঝরা নৃশংস ইতিহাস প্রেম ও কবিতার স্পর্শে অপূর্ব দার্শনিকতায় নবজন্ম পাইয়াছে। একটি নগণ্য ভাঁড়ের চরিত্রের ইঙ্গিত মাত্র গ্রহণ করিয়া শেক্সপীয়র অমর হাস্যরসিক সৃজন করিয়াছেন।

Prof. Raleigh সত্যই বলিয়াছেন—

"What Shakespeare added to his borrowed material was himself". তিনি কঙ্কালের একখানা অস্থি মাত্র গ্রহণ করিয়া রক্তমাংসের মানুষের উদ্ভব করিতেন। প্রয়োজন মত রদবদল, চরিত্রপরিবর্তন ছাড়া, এমনকি ইতিহাসকে পর্যন্ত তিনি অতিক্রম করিয়া যাইতেন। কোন কোন উৎস হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বা কতটা তাঁহার মৌলিকতা, কতটা তাঁহার ঋণ, এই প্রশ্ন তুচ্ছ হইয়া যায় সাহিত্যিক উৎকর্ষের কাছে। আঙ্গিকের দিক হইতেও অবশ্য শেক্সপীয়র তথাকথিত আখ্যানগুলি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন। মধুর ক্ষেত্রেও মৌলিকতার অভাবের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

এখন যে বিভিন্ন রচনাকার মধুকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন, অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের মৌলিকতা দেখানো যাক।

মিলটন (John Milton, 1608-1674)। মধুকে মিলটনের সহিত তুলনা করা তখনকার দিনে একটি বহু প্রচলিত রীতি ছিল।

বহুপ্রচারিত দীনবন্ধুমিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে মাতাল নিমে দত্তের মুখেও শুনি—"মাইকেল দাদা বাংলার মিলটন" (তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক)। মিলটনের নাটকীয় কাব্যের উৎস মৌলিক নয়। 'Paradise Lost' and 'Paradise Regained' এপিক দুইখানি Bible-এর কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছে। জগৎ সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি, মানুষের স্বর্গরাজ্যচ্যুতি ইত্যাদি ধর্মমূলক কাহিনী কাব্যের উপজীব্য। মিলটনের বিশবৎসরের পঠনসাধনা 'Paradise Lost'-এর পটভূমিকা নির্মাণ করিয়াছিল। খৃষ্টধর্মের সারমর্ম Holy Bible (Old Testament)-এর নিখুঁত অনুসরণে রচিত মিলটনের কাব্যযুগল। Book of Genesis-এর উপরে ইহাদের আশ্রয় এবং Virgil, Dante, Homer, Tasso, Aristo ইত্যাদি লেখকের রচনা এখানে বহুলাংশ অনুসৃত। তবে, হিব্রুভাবের প্রতিচ্ছবি কাব্যযুগলকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। গ্রীকপ্রেমিক মিলটন ধর্মযাজক হইয়া পড়িলেন বাইবেল-সমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া।

শুধু উৎস গ্রহণ নয়, মিলটন শেক্সপীয়রের মত অন্যান্য পুস্তকের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। Thomas Kyd প্রভৃতি পূর্বসূরীর রচনার প্রভাবে ক্লাসিকসের প্রভাব আসিয়াছিল শেক্সপীয়রের রচনায়, যদিও নিজে তিনি গ্রীক বা ল্যাটিন ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন না। Seneca-র (horror) বিভীষিকা, রক্তাপ্লুত মঞ্চ, হত্যা, বিষপান ইত্যাদি শেক্সপীয়রের রচনায় বহুদৃষ্ট। তেমনি ক্লাসিক, বিশেষতঃ গ্রীক ক্লাসিক পূর্বজীবনে মিলটনকে অভিভূত করিয়াছিল। তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন উভয় ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন এবং নানা রচনাকার্যও উক্ত ভাষায় করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার গ্রীকনাটকের অনুকরণে লেখা সম্ভবপর।

L 'Allegro' (The Cheerful man), 'Il Penseroso' (The Melancholy man), 'Arcades', 'Comus', 'Lycidas', সমস্তই ক্লাসিক প্রথায় রচিত। তাঁহার নাটকীয় কাব্য 'Samson

Agonostes' গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের আঙ্গিকে লিখিত। বইখানির উৎস হইতেছে, 'Book of Judges'-এর ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, পরিচ্ছেদ। কোন কোন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় মিলটন Josephus রচিত 'Antiquities of the Jews'-এর অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় রচিত স্যাম্‌সনের বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচারিত ছিল। Chorus-এর Odes এবং অন্যান্য নাটকীয় কৌশল-সংস্থানে অতি সহজেই মিলটনের উপর ক্লাসিকের গভীর প্রভাব ধরা যায়। আবার 'Book of Judges'-এর প্রতিটি ছত্র মিলটন ব্যবহার করিয়াছেন ঘটনাসংস্থানে। 'Comus'-এ Sabrina-এর চিত্র হোমারের নিকট হইতে গৃহীত। দান্তে, পেত্রার্কের আদর্শে সনেট রচনা মিলটনের অন্যতম অবদান।

দান্তে, ভার্জিলের কাছে মিলটনের ঋণ অপরিসীম। "একবার বার লাইব্রেরীতে মধুসূদন বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একটি উকীল আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'মহাশয় মেঘনাদবধের নরক বর্ণনাটা আপনি মিলটন হইতে লইয়াছেন, ঠিক কিনা ?' মধু হাসিয়া কবিগুরু দান্তে হইতে কতকটা নরকবর্ণনা আবৃত্তি করিলেন—পরে মিলটন হইতেও ঠিক তদ্রূপ ভাবের বর্ণনা আবৃত্তি করিয়া উকীল মহাশয়কে বলিলেন, 'এই দেখুন, মিলটন যে স্থান হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন আমিও সেই স্থান হইতে লইয়াছি।"

('মধুস্মৃতি,' নগেন্দ্র সোম, ৯ম অধ্যায়, পৃঃ ১৫৫)

শেলী (Percy Bysshe Shelley, 1792-1822)। শেলীর ক্লাসিকের অনুস্মৃতি বিখ্যাত। তিনি গ্রীকদের সহিত একাত্মা ছিলেন। 'Hymn of Mercury', 'Hymn of Castor', 'Hymn to Minerva', 'To Pollux' ইত্যাদি ছোট কবিতাগুলির অনুবাদের মধ্যে তাঁহার গ্রীসদেশের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। তাঁহার নাটকীয় কাব্য 'Prometheus Unbound' ও 'Hellas'-এ তাঁহার গ্রীক অনুস্মৃতি পাওয়া যায়।

'Hellas'-এর ভূমিকায় শেলী স্বয়ং লিখিয়াছেন—

"The Persae' of Aeschylus afforded me the first model of my conception"—

'The Cenci' নাটকের ভূমিকায় শেলী বলিয়াছেন—

"A manuscript was communicated to me during my travels in Italy, which was copied from the archives of the Cenci palace at Rome and contains a detailed account." সেই ভয়াবহ Cenci-এর গল্পটিই শেলী লিখিয়া গিয়াছেন অমর কাব্যের মাধ্যমে।

'Prometheus Unbound'-এর ভূমিকায় দেখা যায় Aeschylus-এর 'Promothus Bound' এবং বিলুপ্ত 'Prometheus Unbound' নাটকের প্রভাব শেলী স্বীকার করিতেছেন। 'Hellas' ও 'Prometheus Bound' গ্রীক নাটকের আঙ্গিকে লিখিত। 'Revolt of Islam' বিভিন্ন কাহিনী হইতে শেলী গ্রহণ করিয়াছেন।

শেলীর 'Adonais শোককবিতা (Elegy) কীটসের মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস। কীটসকে গ্রীক নাম 'Adonais' দিতে শেলী বিরত হন নাই। কবিতাটির মটো 'প্লেটো'* ও 'মস্‌কাসে'র উদ্ধৃতি। এই রচনায় ভার্জিল, প্লেটো, বিয়ন, মস্‌কাস্‌ ইত্যাদির (Virgil, Plato, Bion, Moschus) সুস্পষ্ট ছাপ। এমনকি, ভার্জিল, বিয়ন ও মস্‌কাস্‌ হইতে ছত্রের পর ছত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। (cf, 'Adonais' edited by W. M. Rossetti) স্পেন্‌সার প্রবর্তিত 'Spenserian Stanza'-তে কাব্যটি লেখা। গ্রহণ বিষয়ে শেলীর উক্তি অতি

* এই প্লেটো এথেন্সের রঙ্গ-কবি প্লেটো ; দার্শনিক নয়। ইনি আরিষ্টোফেনিসের সমসাময়িক (৪২৮-৩৪৯ বি, সি) প্রাচীন হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ কবিকুলের একজন ইনি।

চমৎকার—"As to imitation, poetry is a mimetic art. It creates by combination and representation." (Preface, 'Prometheus Unbound')।

কীটস্ (Jhon Keats, 1795-1821) কবি কীটস্ তাঁহার অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন এলিজাবেথ যুগের ইংলণ্ড ও প্রাচীন গ্রীস হইতে। 'Ode on a Grecian Urn', 'To Pscyche' 'On First Looking into Chapman's Homer' ইত্যাদি কবিতায় কবির গ্রীসদেশের প্রতি অনুরাগ ও ক্লাসিক প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। 'Chapman's Homer' কবিতাটিতে মিলটন ও পেত্রার্কের উল্লেখ আছে একসঙ্গে। যে ক্লাসিক্স মিলটনকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল, তাহাই কীটসের উৎস। ইহা ভিন্ন ইতালীয় দেশেও কীটসের যথেষ্ট ঋণ আছে। প্রাচীন হেলেনিসজম্ (Hellenism) এবং রোমান্টিসিজম-এর মিশ্রন কীটসের বিশেষত্ব। 'Endymion' কাব্যের আখ্যানভাগ গ্রীসের। Preface-এ (Teignmouth, April 10th, 1818) কীটস বলিয়াছেন—"I hope I have not too late a day touched the beautiful mythology of Greece"—অসমাপ্ত 'Hyperion' ও 'Endymion' কাব্য দুইখানি পাঠ করিলে কীটসের সর্বতোভাবে ঋণগ্রহণ বোধগম্য হইবে। বাহুল্যবোধে বিশদ আলোচনায় বিরত হইলাম। কীটসের ছন্দে স্পেন্সারের ছন্দ সর্বতোভাবে গৃহীত। স্পেন্সারের 'Faery Queen' কীটস্ পছন্দ করিতেন। 'হাইপেরিয়ন' কাব্যে মিলটনের সুর বাজে। এপিক কাব্য 'হাইপেরিয়ন' মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্টে'র ও 'প্যারাডাইস রিগেনডে'র পথাবলম্বী।

প্রথম লিখনভঙ্গির জন্য কীটস্ Leigh Hunt-এর কাছে ঋণী। শেক্সপীয়রের চিন্তা দ্বারা কীটস্ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ওয়ার্ড-সোয়ার্থ তাঁহার প্রিয় কবি ছিলেন। বিভিন্ন প্রভাব হইতে কীটস্ আপনার স্বতন্ত্র ও বিচিত্র জগৎ গড়িয়া তোলেন।

বায়রণ (Lord George Gordon Noel Byron, 1788-1824)। বিদ্রোহী ইংরেজ কবি বায়রণ সুপণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার দখল এবং তাঁহার পাঠস্পৃহা সর্বজনবিদিত। তিনিও নানাদেশের ও নানাভাষার কাহিনী, কাব্য হইতে তাঁহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। 'Don Juan' নামক এপিক, দীর্ঘ ষোল সর্গের কাব্যখানি Ottava rima ছন্দে লেখা, বিভিন্ন ভাষার উল্লেখে পূর্ণ এবং দান্তে ভার্জিলের উদ্ধৃতিবিকীর্ণ। কখনও বা জ্ঞানীর উদ্দেশে পরিহাস দেখা যায়—"Oh Plato! Plato! you have paved the way". ইত্যাদি।

('Don Juan', Canto the First, CXVI)

গ্রীসদেশের প্রশংসা দীর্ঘ কবিতায় কাব্যের মধ্যে গ্রথিত—"The Isles of Greece"—Don Juan এবং Haidee সেখানে গান শুনিতেছেন (Canto the Third)। ইতালীয় কবি Ariosto-এর অনুসরণকারী অন্যান্য কবিদের (serio-comic) ব্যঙ্গমিশ্রিত কবিতার ছন্দ বায়রণ গ্রহণ করেন। পুরাতন স্পেনীয় উপকথা হইতে গল্পটি পাওয়া যায়। Moliere ও Mozart এই Don Juan de Tenorio-এর গল্প লইয়াছিলেন। বায়রণের 'Manfred'—নাটকীয় কাব্য গ্যেটের 'Faust-এর সমধর্মী।

'Beppo' নামক দীর্ঘ কবিতাটির মুখবন্ধ হিসাবে বায়রণ পত্র লিখিয়াছেন—"I have written a poem humourous in or after the excellent manner of Mr. Whistlecraft and founded on a Venetian anecdote, which amused me. Whistlecraft is my immediate model but Berni is the father of that kind of writing which I think suits our language very well. We shall see by this experiment."

(Mr. Murray-কে লিখিত পত্র)

'Werner' নামক কাব্য-নাটকের মুখবন্ধে বায়রণ বলিয়াছেন—"The following drama is taken entirely from the 'Germen's Tale, Kruitzner', published many years ago in Lee's Canterbury Tales—I have adopted the characters, plan and even the language of many parts of this story."

'The Deformed Transformed'—নাটকের মূল আখ্যান 'Three Brothers' নামক একখানি পুরাতন উপন্যাসের রূপক হইতে গৃহীত (Croly); বাকী অংশ Goethe-এর 'Faust'-এর উপর গ্রথিত (Rhys)।

ইহা ভিন্ন 'The Giaour'-এ তুর্কী প্রভাব, 'The Bride of Abydos'-এ আরবিক প্রভাব, 'Childe Harold's Pilgrimage'-এ ফরাসি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

'Marino Faliero'-এর গল্প ইতালীয় Chronicle হইতে গৃহীত। 'Cain' গল্পটি 'Mystery & Morality' অভিনয়ের ধারায় সোজাসুজি Scriptures হইতে গৃহীত। 'Sardanapalus'-এর বিয়োগান্ত নাটকে Dodorus Siculus-এর Account কাজে লাগানো হইয়াছে (Preface by Byron)।

মূর (Thomas Moore, 1779-1852)। মধুর পত্র হইতেই মূর কবির বিশেষত্ব পাই—

"Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism ?"

(গৌরকে পত্র)*

মূর-এর 'Life of Byron' চমৎকার জীবনী। 'Lalla Rookh' কাব্য প্রতীচ্যের চারটি কাহিনী দিয়া গ্রথিত। মূরের প্রাচ্যপ্রীতি

* পত্রের অপর পংক্তি—"Byron's Poetry for its Asiatic air ?"

বায়রণ, সাদের কাছে শেখা। 'Odes of Anacreon', 'Odes and Epistles' সমধিক প্রসিদ্ধ। 'The Epicurean' উপন্যাসের নাম রাখার মধ্যেও বিদেশী প্রবণতা দেখি।

পোপ (Alexander Pope, 1688-1744)। পোপের রচনায় নানা প্রভাব লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ গ্রীক প্রভাব। ভার্জিলের অনুকরণে 'Pastoral', চসারের অনুকরণে, 'Temple of Fame' ইত্যাদির সঙ্গে পোপ তাঁহার পরম প্রিয় কবি ড্রাইডেনের অন্ধ অনুস্থৃতি করিয়াছিলেন। পোপের প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্গকাব্য 'The 'Dunciad'-এর উৎস ড্রাইডেনকৃত 'Mac Flecknoe' পুস্তক। পোপের 'Windsor Forest', Sir John Denham-এর 'Cooper's Hill' কাব্যের পদ্ধতিতে লেখা।

'Two Choruses to the Tragedy of Brutus', Odes, Elegy, Prologue, 'Epistle from Eloisa to Abelard' ওভিডের কবিতার অনুকরণে কবিতায় পত্রলিখনপ্রণালী, সব কিছুই পোপের গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে অনুরাগের ফল।* বিদগ্ধ কবি শৈশব হইতে হোমার ও ওভিডের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। গ্রীক কাব্যের নানা অনুবাদকার্যে প্রীতি ছিল তাঁহার। Imitation নামে চিহ্নিত বহু কবিতায় তিনি গ্রীক ও ইংরেজ কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন। ওভিডের বহু কবিতার অনুবাদ তিনি করেন যথা— 'Epistle from Sappho to Phaon.' হোমারের 'ইলিয়াড' তাঁহার শ্রমের অবদান। 'অডেসির'ও অনুবাদ তিনি করিয়াছিলেন।

টেনিসন (Lord Alfred Tennyson, 1809-1892)। তাঁহার প্রখ্যাত 'Idylls of the King' রচনার সময়ে ফরাসী মধ্যযুগীয় রোমান্স গ্রহণ করিয়াছিলেন সর্বাঙ্গীন ভাবে। লাইগেট (John Lygate) ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে 'ইলিয়াডে'র গল্পকে নাইটদের গল্পের আকার

* মধুর 'বীরাঙ্গনা' দ্রষ্টব্য।

দেন। লাইগেট খৃষ্টান সন্ন্যাসী ছিলেন, অতএব পেগান অথবা অখৃষ্টানদের কাহিনী তিনি খৃষ্টানী ধাঁচে ফেলেন। আর্থার এবং নাইটদের কাহিনী লাইগেট প্রভৃতি রচনাকারের হাতে যে রূপ লাভ করিয়াছিল টেনিসন তাহার সাহায্য পান। প্রধানতঃ অবশ্য টেনি-সনের কাব্যটি Sir Thomas Malory-এর 'Morte d' Arthur'-এর উপরে স্থাপিত। Malory রাজা আর্থার সম্পর্কে সমগ্র রূপক কাহিনী একুশ খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন গদ্যে।

"Many modern writers, Tennyson among them are the eternal debtors of Malory." (Hammerton)।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ (William Wordsworth, 1770-1850) প্রকৃতির কবি ও শিক্ষক কবি রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও বিভিন্ন কবিচেতনা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সজাগ করিত, যথা —

ওভিডখ্যাত লাডোমিয়ার কাহিনী তিনি পুনর্বার গ্রহণ করেন। 'Odes' কবিতাগুচ্ছ, 'The Memorials of a tour in Italy' কবির বিদেশী প্রেমের সাক্ষ্য। কবিতার নবসিদ্ধরূপ দিবার জন্য ওয়ার্ডসোয়ার্থ চসার, স্পেন্সার এবং শেক্সপীয়রের বিশ্বাস বা কাল্‌টের কাছে করপ্রসারণ করিয়াছিলেন।

স্কট (Sir Walter Scott, 1771-1832)। ইতিহাস এবং মধ্যযুগীয় রোমান্স হইতে কবি-ঔপন্যাসিক স্কট উপাদান সংগ্রহ করিতেন। নিজের দেশ ও দেশবাসীর পুরাতন কাহিনী তিনি লিখিতেন নিজের রূপায়নে। কবিতায় তিনি প্রাচীন গাথার চারণ ছিলেন। Thomas Percy নামে একজন ধর্মযাজক 'Reliques of Ancient English Poetry' নামে একখানি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। স্কট এই গ্রন্থ হইতে তাঁহার প্রেরণা ও উৎস পাইয়াছিলেন। Maria Edgeworth-এর আইরিশ উপন্যাসগুলি স্কটের গল্পের প্রধান অনুপ্রেরণা। ফিলডিং, বার্ণস, গ্যেটে, বার্জার ইত্যাদি স্কটকে অনুপ্রাণিত করেন।

হ্যুগো (Victor Marie Hugo, 1802-1885)। কবি ও উপন্যাসিক হ্যুগো ফরাসীদেশের গৌরব। তাঁহারও গ্রীকপ্রীতির লক্ষণ যে মাত্র তেরবছর বয়সে হ্যুগো ভার্জিলের কাব্যাংশ মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন। এই তাঁহার কবিকৃতির সূচনা। নির্জনতায় বাস ও শেক্সপীয়রের রচনার অনুধাবন তাঁহার অনুপ্রেরণার উৎস বলিয়া জীবনীকার স্বীকার করেন। তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক স্যর ওয়ালটার স্কটের প্রভাবান্বিত পারি সহরের গল্প, 'Notre Dame de Paris'।

মলেয়ার (Jean-Baptiste Poquelin de Moliere, 1622-1673)। ফরাসী নাট্যকার মলেয়ার শেক্সপীয়রের মতই পুরাতন থিয়েটারের নাটকগুলি নূতন করিয়া লিখিয়া লইতেন। ইতালীর নাটকগুলি অভিনয়ের জন্য ফরাসীতে নূতনভাবে লিখিত হইত, যথা, 'Valant', 'Le Medecin' ও 'La Jalousie du Barboille' ইত্যাদি। 'ডন ইউয়ানে'র গল্প বায়রণের সহিত এক উৎস হইতে গৃহীত। মলেয়ারের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নাটক 'The Miser' রোমান নাট্যকার Plautus-এর 'Aulularia' নাটকের ভাবধারা লইয়া লিখিত। কিন্তু, কৃপণের চরিত্রচিত্রণের সময়ে মলেয়ার নিজের মানবচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দেখাইয়াছেন।

ড্রাইডেন (John Dryden, 1631-1700)। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার ড্রাইডেন বিভিন্ন লেখকের অনুকরণে নাটক লিখিতেন। তিনি দুইভাবে অনুকরণ করিতেন: সোজাসুজি বস্তু-গ্রহণ অথবা তৎভাবে ভাবিত হইয়া লিখন, যথা, ড্রাইডেনের প্রসিদ্ধ নাটক 'All for Love' খানি শেক্সপীয়রের 'Antony and Cleopatra' নাটকের সহিত তুলনা করিলে ড্রাইডেনের শেক্সপীয়রের কাছে কতটা ঋণ তাহা বোঝা যায়। নাটকটির বস্তু এবং চরিত্রসংগ্রহ Plutarch, Appian, Dion, Cassius প্রভৃতি লেখকের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া ড্রাইডেন ভূমিকায় স্বীকারোক্তি করিয়াছেন।

এছাড়া Daniel-এর 'Cleopatra'-এর পংক্তির ছায়া নাটকের শেষাংশে পাওয়া যায়।

ড্রাইডেনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অনুসৃতির মধ্যে 'The State of Innocence' খানি 'প্যারাডাইস লস্টে'র অনুকৃতি। তাঁহার Heroic Tragedy গুলি বিভিন্ন উৎসের বস্তুর একত্রীভূত উৎপত্তি। ড্রাইডেন 'ঈনীড' অনুবাদ করেন, 'ওভিড' অনুবাদ করেন এবং অন্যান্য কাহিনীর সঙ্কলন 'The Fables' নামে প্রকাশিত করেন। 'Heroic Stanza' ড্রাইডেনের বাহন। ড্রাইডেন সহজ সত্য বলিয়াছেন—"In my style, I have professed to imitate the divine Shakespeare."

দান্তে, ভার্জিল, ওভিড, পেত্রার্ক, টাসো, হোমার প্রভৃতি কবিবৃন্দ বিভিন্ন রত্নমঞ্জুষা হইতে ভাব আহরণ করিয়া নিজেদের কাব্যসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দেশের পুরাতন অথবা দেশের লুপ্ত বিস্মৃত পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া তাঁহারা একটি সঞ্চিত মানসিক সম্পদ সাহিত্য-জগতে উপস্থাপিত করিতেন।

ভার্জিল (Publius Virgilius Maro, 70 B. C.—19 B. C.) রোমান কবি ভার্জিলের বারখণ্ডের কাব্য 'Aeneid'-এর উৎপত্তি হোমারের 'ইলিয়াড' (Iliad) এবং 'অডেসি'র (Odyssey) উৎস হইতে। প্রথম ছয়খণ্ড 'ঈনীড' হোমারের 'অডেসি'র অনুকরণে লিখিত। বাকী খণ্ডগুলি 'ইলিয়াডে'র অনুকরণে রচিত। হোমার 'অডেসি'র শেষভাগে রাজ্ঞী পেনেলোপের (Penelope) বিবাহার্থী-দের নরকে পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে ট্রয়যুদ্ধে নিহত বীর আত্মাদের তাহারা দেখিয়াছিল। ভার্জিলের নরকবর্ণনা প্রায় তদনুরূপ। ভার্জিলের 'Eclogues' নামে মনোহারী গ্রাম্য আখ্যান-কবিতাগুলি Theocritus-এর গ্রীক কবিতার আদর্শে লেখা।

ভার্জিলের সময়ে প্রাচীন রোম পুরাতন রমিউলাস, রেমাস্ ও নেকড়ের আখ্যানে আর তৃপ্ত ছিল না। গ্রীস দেশের গরিমাগাথা

তাহাদের অনুরূপ আখ্যানরচনায় লুব্ধ করিল। রোম একজন বীর নায়কের সন্ধান পাইল ঈনীয়াসের (Aeneas) কাহিনীর মধ্যে। ঈনীয়াস রাজপরিবারের কনিষ্ঠশাখার পুত্র। নৃপতি প্রায়ামের প্রতি তাঁহার মিত্রভাব ছিল না। ঈনীয়াস ট্রয়যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য বীরত্ব দেখান আকিলিসের সহিত যুদ্ধে। পসিডন (Posidon) অবশ্য তাঁহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করেন। পসিডন ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, ঈনীয়াস রোমের প্রভু হইবেন, কারণ প্রায়াম পরিবারের ধ্বংস অনিবার্য। ভার্জিল ঈনীয়াসের কাহিনী, রূপকথা এবং ইতিহাসে পর্যাপ্ত রূপে প্রস্তুত পান। 'ঈনীডে'র কাঠামো এবং মালমশলা সবই সংগৃহীত। কথিত আছে জুলিয়ান-রাজবংশের রাজা আগাষ্টাসের গৌরবকীর্তনের উদ্দেশে ঈনীডের উৎপত্তি। আগাষ্টাসের বংশ ঈনীয়াসের পুত্র আস্‌কানিয়াস্‌ দ্বারা স্থাপিত (Julian, Augustus, Ascanius)।

দান্তে (Dante Alighiere, 1265-1321)। 'La Divina Commedia' ভার্জিলের নরকবর্ণনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনখণ্ডে সমাপ্ত এই কাব্য দান্তে ভার্জিলকে পথপ্রদর্শক করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। 'Inferno' অথবা নরক ভার্জিল দান্তেকে দেখাইতেছেন। 'Purgatorio' ও 'Paradiso' ভার্জিল তাঁহাকে দেখান। প্রেমিকা বিয়াত্রিচে (Beatrice Portinari) স্বর্গে আছেন। নরকের বর্ণনায় পাপীদের বর্ণনাও দান্তে Aristotle-এর তিনটি পাপের তালিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বিক্ষুব্ধ ফ্লোরেন্সের কবি দান্তে মধ্যযুগীয় অন্ধকার হইতে নবজাগৃতির আলোর দিকে হাত বাড়ান। ত্রয়োদশ শতাব্দীয় পশ্চিমের আত্মা।

ওভিড (Publius Ovidius Naso, 43 B C, 18 A. D.)। 'The Metamorphoses' ওভিড-এর প্রাচীন রোমান এবং গ্রীক উপকথা হইতে গৃহীত। ওভিডের 'Epistles' এইভাবে রচিত। 'ইলিয়াডে'র দ্বিতীয় কাণ্টোর Protesilaus-এর মৃত্যুর দৃশ্য হইতে

লাডোমিয়ার (Laodomia) পত্রের উপাদান গৃহীত। ওভিড মনের ভাবকে কবিতা-পত্রে লিপিবদ্ধ করা এবং পুরাতন যুগের নায়িকাদের মুখ্যপাত্রী করা প্রাচীন সাহিত্যচরিত্র হইতে গ্রহণ করিয়া এক নূতন আঙ্গিক দিয়াছিলেন।

পেত্রার্ক (Francesco Petrarca, 1304-1374)। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক রেঁনেসাসে নিজের আত্মার মুক্তি খোজেন। বিদ্যার উজ্জীবন তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকট ছিল। তিনি ক্লাসিক সাহিত্যের রসে ও ক্লাসিক পাঠক্রমে তন্ময় থাকিতেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমের প্রত্ন-তত্ত্বের প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ দেখা যায়। ভার্জিল এবং কিকেরোর রচনা তাঁহার আদর্শ ছিল, হোমারের তিনি ভক্ত। রেনেসাঁসের প্রভাত তিনি প্রাচীন গ্রন্থপঠন ও আদর্শ গ্রহণের মধ্য দিয়া ইটালির আকাশে আহ্বান করেন। তাঁহার মানসী লরাকে উদ্দেশ করিয়া 'Canzo-niere' নামক সনেটগুচ্ছে ক্লাসিকের প্রভাব দেখা যায়।

হোমারকে আদি কবি বলা হয়। হোমারের নাম পূর্বে হোমার ছিল কিনা, এবং তাঁহার যথার্থ সন-সাল লইয়া গোলমাল আছে। (আনুমানিক 850 B. C. বলা চলে হোমারের সাল)। কবিতার ভিত্তি (Foundation of Poetry) তাঁহার অবদান। ট্রয় যুদ্ধের কাব্যিক বর্ণনা তিনি সঙ্গীতে গাঁথিয়া আবৃত্তি করেন। তিনি চারণ কবি। এশিয়া মাইনরের শহরের মধ্য দিয়া হোমার তাঁহার গাথা গাহিয়া গাহিয়া ভ্রমণ করিতেন। এই অলিখিত গাথার সম্ভার আবৃত্তির দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন হোমারের ভক্ত শিষ্যগণ— তাঁহাদের 'Homeridae' বলা হইত। পাঁচটি শহর নিজেদের হোমারের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করে।

'ইলিয়াড' এবং 'অডেসি' দুইখানি মহাকাব্য একই ব্যক্তির জীবনে রচনা সম্ভব কি না তাহা লইয়া মতদ্বৈত আছে। প্রক্ষিপ্ত অংশের ইতস্তত বহুল (interpolations) প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আধুনিক গবেষণার দ্বারা সন্দেহ আসিয়াছে যে—

"Homer is quite as likely to have been really Homer as a mere name, under whose shadow the poems of various unknown writers have been grouped." (W. Lucas Collins)—"for though Homer's version of the Great Trojan War is the earliest account which has come down to us, he drew his material from still earlier lays and legends with which he assumes all his readers (or hearers) to be tolerably familiar." (W. Lucas Collins)

ট্রয় যুদ্ধের ইতিহাসে হোমারের অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন এবং সঠিক উৎস আছে বলিয়া একটি মত পাই।

Benoit de Stainte More হোমার ভিন্ন অপর দুইজন পূর্ব-স্থরীর কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'Roman de Troie' লেখেন। এই পূর্বস্থরীদের নাম 'Dares Phrygian' ও 'Dictys the Cretan' ?

ইঁহারা ট্রয়ের যুদ্ধ চোখে দেখিয়াছেন বলিয়া খ্যাত। তাই মধ্যযুগের লেখকেরা হোমার অপেক্ষা ইঁহাদের বড় মনে করেন। হোমারের 'ইলিয়াডে' ট্রোজানদের মধ্যে একজন ডেয়ার্স ফ্রিজিয়াস নামে পুরোহিতের উল্লেখ দেখা যায়। ডিক্‌টিসও ট্রয় যুদ্ধের একখানি ডাইরী লেখেন। স্থতরাং আদি কবিরও পূর্বে ট্রয় যুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মত অবশ্য অভ্রান্ত নয়।

টাসো (Torquato Tasso, 1544-1595)। 'Jerusalem Delivered' বহুলাংশে হোমারের রচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত। টাসো আমাজোনদের ঘটনা হইতে কাহিনী (Clorinda) গ্রহণ করিয়াছেন। 'ইলিয়াডে' Achilles-র হাতে Penthesilea-এর মৃত্যুর দৃশ্যের সহিত Clorinda-এর মৃত্যুর দৃশ্য তুলনা করিলে একই উপাদান দেখা যায়। 'La Gerusalemme Liberta" ইতালীয়ান ভাষায় ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা হয়।

ইতালীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবি টাসোর সুবৃহৎ কাব্যের উপাদান বিভিন্ন পরিখার সঞ্চয়। টাসোর এপিক বার সর্গের 'Rinaldo' ভার্জিলের এপিকের আদর্শে গঠিত। কিন্তু ক্লাসিকাল গঠনের সঙ্গে কবি ব্যক্তিগত অনুভূতির গভীরতর প্রকাশ এই কাব্যে দেখাইয়াছেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে আঠারো বৎসর বয়সে টাসো 'Rinaldo' লেখেন। এপিক কাব্যটির প্রত্যক্ষ উৎস আরিষ্টোর (Aristo) একজন নায়ক 'Rinaldo' টাসোর কাব্যের নায়ক। 'Jerusalem Delivered'-কে টাসো Allegory বা সাঙ্গরূপক এপিক বলিয়াছেন এবং কাব্যটি প্রকাশিত হইবার পরে এক পরিচিতি-পত্র লিখিয়াছিলেন। এই লেখাটিতে টাসোর দ্বারা হোমার, ভার্জিলদের উল্লেখ এবং তাঁহাদের রচনা সম্পর্কে আলোচনা আছে। নিঃসন্দেহে টাসো সেই পথের পথিক। টাসোর সুদীর্ঘ কুড়ি সর্গের কাব্যে ট্রয় যুদ্ধের পুনঃপুন উল্লেখ, গ্রীক রূপকথা এবং হোমারের দেবদেবীর বর্ণনা আছে। টাসো উপমা অন্বেষণ করিয়াছেন হোমারে।

অতি সংক্ষেপে উপরোক্ত কবিগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া দেখাইলাম যে মৌলিকতাই প্রতিভার একমাত্র পরিচয় নয়। শুধু কয়েকটি নাম সাহিত্য-অর্ণব হইতে উদ্ধৃত করিলাম, যাঁহাদের প্রতি মধুসূদনের অত্যধিক প্রীতি ছিল। এই কবিদের গ্রীকপ্রীতির সঙ্গে ইতালীয়প্রীতি ছিল, অন্য দেশ-প্রীতি ছিল। তাঁহারা অনুবাদ কার্য দ্বারা প্রীতি জ্ঞাপন করিতেন। ৩৭নং পত্রে ('জীবন চরিত') মধু সনেটের উৎপত্তি জানাইয়া কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt···I like Wordsworth better······ I am just reading Tasso in the original." "You cannot imagine what beautiful poetry there is in Italian. Tasso is really the Kalidasa of Europe. I wrote a long

letter in Italian to Satyendra...” (বিদ্যাসাগরকে ভের্সাই হইতে লিখিত পত্রাংশ, ১৮ই জুলাই, ১৪৬৪)।

“I am going on with German—”

(বিদ্যাসাগরকে পত্র, ৩রা নভেম্বর)

“As for my German studies I have been successful”—

(মনমোহন ঘোষকে পত্র, ১৮৬৪)

কিন্তু, জার্মানভাষার শ্রেষ্ঠ কবি গ্যেটের দৃশ্যমান প্রভাব মধুতে নাই।

বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিত মধুসূদনের স্মৃতিকথা ও নগেন্দ্র সোমের 'মধুস্মৃতি' পুস্তকে একটি সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কবির জীবনের শেষ দিনের কথা, সুতরাং অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া কবির প্রকৃত মতামত সম্পূর্ণভাবে পরিগঠিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা হইতে জানিতে পারি উত্তরপাড়ার লাইব্রেরী গৃহে বাসকালীন রাসবিহারীবাবুর সহিত বিভিন্ন দেশের কবিকুল সম্বন্ধে যে আলোচনা হইত তাহাতে “গ্যেটে* অথবা অপর কোন জার্মান কবির সম্বন্ধে তিনি কখনও কোন কথা বলেন নাই। তিনি হোমার, দান্তে, শেক্সপীয়র, মিলটন, মোলেয়ার, ভিক্টর, হ্যুগো, বায়রণ, শেলী, কীটস্, টেনিসন্ এই সকল কবির স্তুতিবাদক ছিলেন।”

('মধুস্মৃতি', পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪৭৭)

রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' হইতে জানা যায় যে মধু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে বন্ধুবর্গের সম্মুখে ওয়ার্ডসোয়ার্থ বিরচিত 'Sonnet on Sonnet' অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিয়া সকলকে মোহিত করেন।

* “I am going to read Goethe, Schiller and Webber”

(মনোমোহন ঘোষকে পত্র, ৩১শে অক্টোবর ১৮৬৪)

গ্যেটে পাঠের পরের মতামত আমরা জানি না।

তমলুক হইতে (১৮৪২) গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্রে মধু তাঁহার কতকগুলি কবিতা 'Blackwood Magazine' নামক তৎকালপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় পত্রিকায় প্রেরণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন—

…"My dedication runs thus"—

"These poems are most respectfully dedicated to William Wondsworth Esquire, the Poet by a foreign admirer of his genius—the author"—

"I like Wordsworth better."

(রাজনারায়ণকে পত্র)

য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র হইতে কবির ড্রাইডেন পাঠ জানা যায়।

"Do you know the song by Dryden ?"

(মনোমোহন ঘোষকে পত্র, ৪ঠা জানুয়ারি ১৮৬৩)

টেনিসনের সম্বন্ধে তিনি একটি সনেট লেখেন।

মৃত্যুশয্যায়ও মধু দান্তে, মিলটন আবৃত্তি করিতেন ('জীবনচরিত', পৃঃ ৬১২)।

মধু মিলটনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'জীবনচরিতে' পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে এই অনুরাগ প্রকট। ৩৮নং পত্রে মিলটনের উচ্চ প্রশংসা—"Milton is divine." পুত্রের নাম তিনি 'মিলটন' রাখিয়াছিলেন মিলটনের কাব্য, বিশেষতঃ 'Paradise Lost'-এর তিনি এত অনুরাগী ছিলেন যে তাঁহার সহধর্মিণী আঁরিয়েৎ তাঁহাকে 'Chateaubriand's French Translation with Steele Engravings of Milton's Paradise Lost.' পারি হইতে কিনিয়া স্বামীকে উপহার দেন। ('মধুস্মৃতি')

(এখানে উল্লেখ্য যে মধুর দ্বিতীয়া সঙ্গিনীর নামের ইংরেজি উচ্চারণ হ্যারিয়েট, ফরাসী উচ্চারণ—আঁরিয়েৎ। শেলীর প্রথমা পত্নীর নাম হ্যারিয়েট। মেরী গডউইনের (Mary W. Godwin) সহিত শেলীর

প্রেমাখ্যান মধুর জীবনে প্রেম, বিবাহ প্রভৃতির সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে মধুর জীবন বিদেশী কবিদের জীবনের মতই।)

মিলটনের অনুস্মৃতি তিনি স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়াছেন বহুবার। যথা ৪৪নং পত্রে মধু স্বয়ং 'তিলোত্তমা'র অংশবিশেষের সহিত শেক্সপীয়র ও মিলটনের তুলনা করিয়াছেন।

'জীবন চরিতে'র পৃঃ ৬১২-তে দেখা যায় মধু "ম্যাকবেথ" আবৃত্তি করিতেছেন। ৪২নং পত্রে মিলটনের উল্লেখ, ৩৯নং পত্রে Aeneas-এর উল্লেখ পাই।

'তিলোত্তমা' কাব্যের ১ম সংস্করণে মিলটনের একটি লাইন ভবভূতির একটি শ্লোক ও Horace-এর একটি বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছিল।

মিলটনের কাব্যের ন্যায় 'তিলোত্তমা' দেবতা ও দৈত্যের উপাখ্যান। মধুর পত্রে আছে—

"The want of human interest strikes you.—It is The story of Gods and Titans, I could by no means shove in men and women."

(১৯নং পত্র—রাজনারায়ণকে ১লা জুলাই, ১৮৬০)

এই পত্রেই আছে :—

..."If your friends know English, let them read the 'Paradise Lost' and they will find how the verse in which the Bengali poetstar writes is constructed. ...As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyas, Virgil, Kalidasa, Dante (in translation) Tasso (Do) and Milton. These কবিকুলগুরু-s ought to make a fellow a first rate poet"—

এই পত্রখানি প্রয়োজনীয়, কারণ, এই পত্রে তিনি তাঁর পূর্ব প্রিয়

কবি Byron, Moore & Scott-কে বড় কবি বলিয়া আর স্বীকার করিতেছেন না। তখন 'শর্মিষ্ঠা', 'তিলোত্তমা সম্ভব' এবং 'পদ্মাবতী' রচিত হইয়াছে।

অথচ বায়রণের আদর্শে যৌবনে তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তিনি গৌরদাস বসাককে লেখেন—

"I am reading Tom Moore's life of my favourite Byron"

বিদেশযাত্রার সময়ে তাঁহার লিখিত কবিতায় বায়রণের মটো দেখা যায়। এই সময়ে (১৮৪১, ২৭শে নভেম্বর) গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্রে কবি টমাস মূর লিখিত বায়রণের জীবনীর উল্লেখের সময়ে মধু মন্তব্য করিয়াছেন—

"Excellent Fellow", (Moore).

২৭শে নভেম্বর, ১৮৪৩-৪২ খৃষ্টাব্দে গৌরকে পত্র—

"Pray send me my Tom Moore"

তারপর মধু, (২৫নং পত্রে কেশবকে) Tempest-এর boatswain-এর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন।

কেশবকে লেখা ২৭নং পত্রে পাই—"Look at the splendid Shakespearean Drama.—"

এই পত্রখানি অবহিত চিত্তে পাঠ করিলে বোঝা যায় মধু সম্পূর্ণ ভাবে পাশ্চাত্য প্রথায় নাটক রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। শেক্সপীয়রের নাটকে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় এবং শেক্সপীয়রের নাটকাদর্শই তাঁহার আদর্শ ছিল।

"As for the drama I shall follow Dr. Johnson's advice and he commends Shakespeare."

৩১নং পত্রে তিনি শেক্সপীয়রের প্ল্যান বা পরিকল্পনা আলোচনা করিতেছেন এবং সেইমত নাটকরচনার সঙ্কল্প করিতেছেন। পূর্বেই

দেখিয়াছি 'King John'-এর Bastard-এর ন্যায় তিনি 'কৃষ্ণকুমারী'র বলেন্দ্র চরিত্র করিতে চান।

মনমোহন ঘোষকে লিখিত ফরাসী পত্রের অনুবাদ।

(৮ই জানুয়ারি, ১৮৬৩)

"If you will allow me I shall try to help you in your Shakespearean studies by sending you occasional papers of questions on his most famous plays."

মধুসূদন উল্লিখিত রচনাকারদের রচনা কত মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিতে পাই পত্রাবলীর মধ্যে পুনঃপুনঃ উল্লেখ।

যাঁহারা মধুসূদনের মনে অনুপ্রেরণা আনিয়া দিয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগকে মধু উৎস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের আলোচনা করিলাম, (সমালোচনা ও গদ্য গ্রন্থ বাদ দিয়াছি)। মধু ইঁহাদের রচনায় পৃথিবী ভুলিয়া মগ্ন থাকিতেন। ইঁহারা উৎস গ্রহণ করিতেন অন্যত্র হইতে। তাই বোধহয় মধু 'a la mode' বলিয়া ঈষৎ অনুস্মৃতির ক্ষীণ-ছায়া বাছিয়া লইয়াছিলেন। যদি তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা থাকিত, তাহা হইলে তিনি পত্রাবলী অন্যভাবে রচনা করিতেন ও নিজের রচনার ভাষ্যকার নিজে হইতেন না।

মধু স্বচ্ছন্দে যে-টুকু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছিলেন। হয়তো তিনি ধরাইয়া না দিলে তাঁহার উৎস পাঠকের পক্ষে ধরা সহজ ছিল না।

মধুসূদনের বিষয়ে সঠিক জানিবার প্রধান উপায় তাঁহার পত্রাবলী পাঠ করা। সুখের বিষয় তিনি প্রচুর পত্র লিখিতেন এবং পত্রের ভঙ্গি কথাবার্তার ভঙ্গি ছিল। সেইসকল পত্র যাঁহারা পাইতেন, তাঁহারা অনেকেই পত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই জীবিত মধুসূদনের সহিত কথা বলিলে যে ফল হইতে পারিত, আমরা অনেক সময়ে সেই ফল পাইতে পারিয়াছি।

যে কয়েকটি নামের উল্লেখ আমরা মধুর জীবনের কোথাও না কোথাও পাই, কেবলমাত্র তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর নিবৃত্ত হইলাম। বিদেশী সাহিত্যেই শুধু তাঁহার নজির ছিল না, দেশীয় সাহিত্যেও এই দূরাগত প্রতিধ্বনি আমরা বহুল পাই। মধুর প্রিয় সঙ্গী বাংলার কৃত্তিবাস, কাশীদাস, সংস্কৃতের আদিকবি বাল্মীকি ও ব্যাস। দেবাদেশে তাঁহারা রচনা করিতেন।

কালিদাসের রচনায় অনুরাগ এবং কালিদাসের প্রভাবও মধুসূদনে পরিলক্ষিত হয়।

কালিদাস—তাঁহার রচনার আখ্যানভাগ রামায়ণ মহাভারত এবং নানা ভারতীয় পুরাণ হইতে লইতেন। চরিত্র, কাহিনী, বর্ণনা বহুলাংশে অন্যস্থান হইতে গৃহীত হইত। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর গল্প মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে। কালিদাসের লেখনীতে আখ্যায়িকার নবজন্ম দেখি। শকুন্তলার অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় হারাইবার ফলেই দুষ্মন্তের স্মৃতিলোপ, এইটুকু মূলে যোগ করিয়া কবি কালিদাস প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্যাসের নিদারুণ যতি জীবন এবং তপশ্চর্যার আবহাওয়া কালিদাসের নাটকে সুমধুর আশ্রমিক ধর্মে রূপায়িত। 'পদ্মপুরাণ' শকুন্তলার কাহিনীচিত্রণে কালিদাসের আশ্রমকে অনুসরণ করিয়াছে। কালিদাস নানা ঐতিহাসিক উপাদান আশ্রয় করিয়া তাঁহার 'রঘুবংশ' ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন।

মধু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন —লালবিহারী বসাক লিখিয়াছেন – ('রত্নাবলী'র অভিনয়ের সময়ে ও পরে) "সেই সময় আমার পিতৃদেবের সহিত যখনই তাঁহার নিকট যাইতাম, তখনই নিজ সংস্কৃত অধ্যয়নের কথা কহিতেন।··· আমি রঘুবংশ শেষ করিয়াছি ও ভট্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি।··· সংস্কৃত কাব্য পাঠ করিয়া আমার মন মোহিত হইয়াছে।"

('মধুস্মৃতি', পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪৬৮)

কৃত্তিবাস ওঝা—বাল্মীকিকৃত রামায়ণের বাংলায় রূপ দিয়াছিলেন।

কাশীরাম দাস—ব্যাসকৃত মহাভারতের বাংলায় রূপ দিয়াছিলেন।

নিজের প্রতিভাবলে তাঁহারা এই দুই সংস্কৃত পৌরাণিক মহাকাব্যকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। সংস্কৃত পুরাণ বাংলার প্রাণের ভালবাসায় নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল।

পুরাতন কাব্যপ্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ববর্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া অগ্রসর হন নাই···একই কাব্যের রচনায় যুগব্যাপী চেষ্টার বিকাশ দেখা যায়।···এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সূত্র—কেবল বড় বড় কাব্যগুলিতে নহে, কাব্যের অংশগুলিতে ও সেই অনুকরণবৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়।" ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃঃ ৬৮-৭০)

অতএব পূর্বে আমরা যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহার জন্য মধুসূদনের প্রতিভার তিলমাত্র গ্লানি নাই। দেশীয়, বিদেশীয় মহাকবি মধুসূদনের পূর্বে এইরকম শতাব্দীর সঞ্চয় প্রসারিত হস্তে উত্তরাধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও বিংশ শতাব্দীর লেখক তাই করিতেছেন। ভবিষ্যতে একবিংশ শতাব্দীর কবিও তাই করিয়া যাইবেন—

> "আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
> ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে,
> হৃদয় স্পন্দনে তব ভ্রমর গুঞ্জনে নব
> পল্লব মর্মরে,
> আজি হতে শতবর্ষ পরে।"

এই বিষয়বস্তুর সূত্রে আবদ্ধ পুস্তকাবলী—

১। মধুসূদনের সমগ্র গ্রন্থাবলী (বিভিন্ন সংস্করণ)

২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু
(জীবনচরিত নামে প্রবন্ধে উল্লেখিত)

৩। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম
(ভারতবর্ষ মাসিকপত্রে ১৩২১ সালের মাঘ সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক প্রকাশিত 'মধুস্মৃতি' ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আদ্যন্ত মুদ্রিত হয়। কখনও বা ভারতবর্ষ হইতে 'মধুস্মৃতি' উদ্ধার করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে গ্রন্থের স্বতন্ত্র মুদ্রণের সময় কিছু কিছু অংশ বাদ যায়)

৪। সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১৩—মধুসূদন দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা) শশাঙ্কমোহন সেন

৬। বাণীমন্দির—শশাঙ্কমোহন সেন

৭। মধুসূদনের কাব্য পরিচয়—দীননাথ সান্ন্যাল

৮। সীতা ও সরমা—দীননাথ সান্ন্যাল

৯। কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন— কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী

১১। বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন

১২। শ্রীমধুসূদন—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

১৩। আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু

১৪। সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু

১৫। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—যোগেশ বাগল

১৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

১৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন

১৮। আধুনিক বাংলাসাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার

১৯। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার সেন

২০। বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার

২১। বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ

২২। বিপ্লবী বাংলা—রাজেন্দ্রলাল আচার্য

২৩। কর্মক্ষেত্র—শশিভূষণ সেন

২৪। বিবিধার্থ সংগ্রহ—১৭৮০

২৫। কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৬। ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭। নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী

২৯। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র—নবীনচন্দ্র সেন

৩০। বৃত্রসংহার, দশমহাবিদ্যা ও রচনাবলী
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১। পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত

৩২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী

৩৩। ভারতচন্দ্রের রচনাবলী

৩৪। প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলী

~~৩৫। এপারে ওপারে—শশিভূষণ দাসগুপ্ত~~

৩৬। সত্যেন্দ্র দত্তের রচনাবলী

৩৭। মোহিতলাল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র দত্ত, দিলীপকুমার রায়
প্রমুখ আধুনিক কবিদের কবিতাবলী

৩৮। কামিনী রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মানকুমারী, গিরিন্দ্রমোহিনী
প্রভৃতির রচনাবলী।

৩৯। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ—বিভিন্ন সংস্করণ

৪০। মেঘদূতম্—কালিদাস
৪১। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—কালিদাস
৪২। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা
৪৩। তন্ত্রসারঃ
৪৪। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী
৪৫। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, শনিবারের চিঠি, গল্পভারতী, পুরাতন খণ্ড সমূহ এবং অসংখ্যক পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা, হোমশিখা, কথাশিল্প, দেশ, এশিয়া, জয়শ্রী, পূর্বরঙ্গ, জনসেবক, দীপায়ন, মন্দিরা, সচিত্র শিশির, দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর, গাঙ্গেয়, আশুতোষ কলেজ পত্রিকা ইত্যাদি। পত্রপত্রিকা ভাবধারার বাহক, সুতরাং ছোট-বড় নির্বিশেষে পত্রপত্রিকা হইতে খ্যাত, অখ্যাত লেখক নির্বিশেষে উদ্ধৃতি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে, কিছু প্রমাণের জন্য নয়, নানা দৃষ্টিপাতের ভঙ্গি লক্ষ্য করিবার জন্য।
৪৬। মধুসূদনের বঙ্গভাষা—দীননাথ সান্ন্যাল
৪৭। বিদ্যাসাগর—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
৪৮। চার্বাক মতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী
৪৯। তারাপীঠ ভৈরব—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫০। সাহিত্য-দর্পণ—বিশ্বনাথ
৫১। অনেক সমসাময়িক লেখক, যাঁহাদের চিহ্নিত করা সম্ভবপর নয়। সমষ্টিগতভাবে তাঁহারা গৃহীত হইয়াছেন।
৫২। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ—শশিভূষণ দাসগুপ্ত
৫৩। Iliad—Homer (Translation by Alexander Pope, George Chapman, Lord Derby, Mr Worsley)
৫৪। Homer—Iliad—Edited by W. Lucas Collins (Ancient Classics for English Readers)
৫৫। Gerusalemme Liberta—Torquato Tasso (Tran. by Edward Fairfax)

৫৬। Divina Commedia - Dante Alighieri (Trans. by Henry Francis Cary).

৫৭। Aeneid—Publius Virgilus Maro (The Temple Greek and Latin Classics' edition and translations by Prof. J. W. Duff)

৫৮। Poetical Works of Milton

৫৯। Poetical Works of Byron

৬০। Poetical Works of Shelley

৬১। Adonais—Shelley—(Edited by W. M. Rossetti)

৬২। Poetical Works of Keats

৬৩। Poetical Works of Wordsworth

৬৪। Poetical Works of Tennyson

৬৫। Poetical Works of Pope

৬৬। Poetical Works of Moore

৬৭। Works of Scott

৬৮। Works of Victor Hugo

৬৯। All for love—Dryden (Edited by Arthur Sale)

৭০। Milton's Sonnets--Edited by Profs. Watson, Ray and Chatterjee.

৭১। Hamlet—Shakespeare (Edited by Verity)

৭২। King Lear—Shakespeare (Edited by Verity)

৭৩। The Winter's tale—Shakespeare (Edited by Deighton)

৭৪। Works of Shakespeare (Different editions)

৭৫। A History of English literature—Emile Legeouis and Louis Cazamian

৭৬। An Outline of English Literature—J. A. Hammerton

৭৭। A History of English Literature—A. H. Thompson

৭৮। A Primer of English Literature—W. T. Young

৭৯। Encyclopaedia

৮০। Western Influence in Bengali Literature Priyaranjan Sen.

৮১। Stories of World History F. W. Tickner

৮২। Golden Treasury—F. T. Palgrave

৮৩। Metamorphoses—Publius Ovidus Nasc—(T. Wight Duff's Translations)

৮৪। Selected Comedies by T. B. P. Moliere
৮৫। On the Art of Poetry—Aristotle (Trans by I. Bywater)
৮৬। Cassell's Encyclopaedia of Literature
৮৭। Othello—Shakespeare—(T. L. Banerjee's Edition)
৮৮। Canzoniere—Francesco Petrarch (Trans. Oxford University Press)